ড্যানিয়েল হাকিকাতযু

সংশয়বাদী

অনুবাদ। আসিফ আদনান

ইসলাম কেন বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না?
ইসলাম কেন মুক্তচিন্তার স্বীকৃতি দেয় না?
ইসলাম কেন ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না?
ইসলাম কেন গণতন্ত্রের স্বীকৃতি দেয় না?
ইসলাম কেন যৌন স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না?
ইসলাম কেন নারীকেই হিজাব পরতে বলে?...

এই প্রশ্নগুলো শুন্য থেকে আসেনি। এগুলোর পেছনে আছে পরস্পর-সম্পর্কিত বিভিন্ন পূর্বধারণা। প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে 'কঠিন' মনে হয় কারণ প্রশ্নের পেছনের ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রমাণিত সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ধ্যানধারণাগুলো যে সঠিক, এগুলোর যে নৈতিক বৈধতা আছে তার প্রমাণ কী?

লিবারেলিসম, জাতি-রাষ্ট্রের প্যারাডাইম, বিজ্ঞানবাদ, মানবতাবাদ, নারীবাদ, প্রগতিবাদের মতো মডার্নিস্ট বিশ্বাস আর মতবাদগুলোকে আজ বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু একজন মুসলিম কি এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না ? এগুলোর ব্যাপারে সংশয়বাদী হতে পারে না?

একজন মুসলিম সংশয়বাদীর কাজ হল মাটি খুঁড়ে এসব মতবাদের পেছনে থাকা ধারণাগুলোকে বের করে আনা। সেগুলোকে প্রশ্ন করা, সেগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা। এই প্রশ্নগুলো করতে শেখা এবং এসব ধারণার ব্যাপারে সংশয়বাদীতার অবস্থান গ্রহণ করা হল সন্দেহ এবং সংশয় সমাধানের প্রথম ধাপ।

সংশয়বাদী

সংশয়বাদী

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু

অনুবাদ
আসিফ আদনান

সংশয়বাদী

প্রথম সংস্করণ
রমাদান ১৪৪২ হিজরি, এপ্রিল ২০২১

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
ইলমহাউস পাবলিকেশন
www.facebook.com/IlmhouseBD
প্রচ্ছদ: মুবিনা ইক্বাত
নির্ধারিত মূল্য: ২৬০ টাকা

Shongshoybadi (Muslim Skeptic) Translation of a collection of essays & articles by Daniel Haqiqatzou. Published by Ilmhouse Publication. First Edition, April 2021.

‘তুমি কি দেখো না কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্যে নানা দৃষ্টান্ত প্রদান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর মন্দ বাক্য মন্দ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।’

সূচীপত্র

নারীবাদ

হিজাব

বিজ্ঞানবাদ

লিবারেলিসম

নৈতিকতা ও প্রগতিবাদ

মডার্নিটি

সংস্কারপন্থী ও মডার্নিস্ট মুসলিম

যৌনতা ও যিনা

অন্যান্য

সংশয়বাদী

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

মুসলিম হিসেবে আধুনিক সময়ে আমাদের একটা সংঘাতের মোকাবিলা করতে হয়। আমরা প্রায় সবাই নিজের মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধিতা অনুভব করি। একদিকে আমরা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিই। অন্যদিকে বাস্তবতা, নৈতিকতা ও শাসনের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প, মিডিয়া থেকে শেখা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামের অনেক অবস্থান মেলে না। সাম্য, স্বাধীনতা, অধিকারের মতো আধুনিকতার মৌলিক অনেক ধারণার সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের তীব্র সাংঘর্ষিকতা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। পর্দা, বহুবিবাহ, ইসলামী দণ্ডবিধি, শরীয়াহ শাসন, জিহাদ, পরিবার ও সমাজে নারী অবস্থানসহ ইসলামের এমন অনেক বিষয় আছে আধুনিকতার মানদণ্ডে বিচার করলে যেগুলোকে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক', 'মানবিক' কিংবা 'উপযুক্ত' বলে মনে হয় না। ইসলাম ও আধুনিকতার এই সংঘাত আধুনিক মুসলিমের সামনে আসে বিভিন্ন প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের আকারে। হয়তো বিশেষ কোনো বিধানের ব্যাপারে প্রশ্নের উদয় হয়। হয়তো কোনো আয়াত কিংবা হাদীস নিয়ে অন্তরে সংশয় কাজ করে। কিন্তু সমস্যা আসলে দু-একটা বিধান কিংবা কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস নিয়ে না। সমস্যার শেকড় আরও অনেক গভীরে। এই শেকড়কে চিনতে না পারলে এই প্রশ্ন আর সংশয়গুলোর সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব না।

আমাদের এই সংঘাতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কারণ, আধুনিকতা এবং ইসলামের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। ইসলাম আমাদের যে ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দেয় আর আধুনিক দুনিয়ার যে ওয়ার্ল্ডভিউ, তা আলাদা। এ দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি হিসেবে যে ধারণাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী। এটাই হলো সমস্যার শেকড়।

ওয়ার্ল্ডভিউ কী? ওয়ার্ল্ডভিউ হলো চিন্তার কাঠামো। ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার

মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করি। আমাদের ওয়ার্ল্ডভিউ-ই ঠিক করে দেয় বাস্তবতাকে আমরা কীভাবে দেখি, বুঝি, ব্যাখ্যা করি। ওয়ার্ল্ডভিউকে চিন্তার ভাষা মনে করতে পারেন। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি।

কী আছে, কী নেই? কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব? জ্ঞান কী, জ্ঞানের উৎসগুলো কী? জ্ঞানের মানদণ্ড কী? মানুষ কী? মানুষ কে? আমরা কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাচ্ছি? জীবনের উদ্দেশ্য কী? ভালোমন্দের মাপকাঠি কী? এই মাপকাঠি অনুযায়ী কীভাবে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত? কোন নীতির ভিত্তিতে সমাজ চলবে? আইনের উৎস কী হবে? শাসনের ভিত্তি কী হবে?– প্রত্যেক সমাজ আর সভ্যতা এ প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করেছে। হয়তো শব্দ ভিন্ন হয়েছে, উপস্থাপনায় পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু মৌলিকভাবে প্রত্যেক সভ্যতা এই জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব খুঁজেছে। এগুলো মানবঅস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে প্রত্যেক সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের কিছু নির্দিষ্ট উত্তর এবং মাপকাঠি থাকে। এগুলো নিয়েই গঠিত হয় তার ওয়ার্ল্ডভিউ।

ইসলামের স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ আছে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ সত্য, সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয়। যে আধুনিক সভ্যতার অধীনে আমরা বসবাস করি সেটারও নিজস্ব ওয়ার্ল্ডভিউ আছে। আধুনিকতাও মনে করে তার ওয়ার্ল্ডভিউ সত্য ও সর্বজনীন। এ দুটো ওয়ার্ল্ডভিউ মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক।

ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (কুফর বিত ত্বাগুত, ঈমান বিল্লাহ), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাত এবং ওয়াহি (কুরআন, সুন্নাহ)। কিন্তু এই তিনটি ভিত্তিকেই আধুনিকতা অস্বীকার করে। বাস্তবতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আইন–কোনো কিছুর ব্যাপারেই জ্ঞানের উৎস হিসেবে ওয়াহিকে আধুনিকতা স্বীকার করে না; বরং সবকিছুর ভিত্তি দাবি করা হয় মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি এবং ধ্যানধারণাকে। ইসলাম মানবীয় যুক্তি, চিন্তা এবং বিজ্ঞানকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ইসলামের অবস্থান হলো চূড়ান্ত এবং সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস একটিই–ওয়াহি। অন্যদিকে বস্তুবাদী সভ্যতা ওয়াহিকে অস্বীকার করে। যদি অস্বীকার নাও করে, তাহলে কমসেকম অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এই সাংঘর্ষিকতার ফলে আধুনিক সময়ের মুসলিম হিসেবে অনেক সংশয় এবং টানাপড়েন আমাদের সামনে উঠে আসে।

আধুনিক মুসলিম একই সাথে এই দুই সাংঘর্ষিক ওয়ার্ল্ডভিউকে ধারণ করার চেষ্টা করে। আমরা একদিকে মুসলিম, অন্যদিকে আমরা এই সভ্যতারই সন্তান। আধুনিকতার মাঝেই আমাদের বেড়ে ওঠা। নিজের অজান্তেই এই সভ্যতার অন্তর্নিহিত চিন্তাগুলো আমাদের প্রভাবিত করেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে, যাপিত জীবনের সাথে আধুনিক সভ্যতার বস্তুবাদী ধ্যানধারণাগুলো আমরা শুষে নিয়েছি। নিজের অজান্তেই বাস্তবতা, মানবজীবন, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক অবস্থান আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, যা গভীরভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আধুনিকতার এই ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিমরা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ অস্ত্রের জোরে আমাদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছে। ধাপে ধাপে শাসনব্যবস্থা, সমাজ ও শিক্ষা থেকে ইসলামকে তারা মুছে দিয়েছে। তারপর সেখানে বসিয়েছে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান ও মতবাদ। দখলদারিত্বের অধীনে থাকতে থাকতে একসময় আমরাও এগুলোকে অমোঘ বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। এগুলোকে আমরা এখন আর ইউরোপের ইতিহাসের নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে বের হয়ে আসা দার্শনিক চিন্তার ফসল মনে করি না; বরং এই ব্যবস্থা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা মনে করি সহজাত, সর্বজনীন ও চিরন্তন।

আধুনিকতার ঠিক করে দেয়া চিন্তার ছক আর কাঠামো থেকে আমরা সহসা বের হতে পারি না। এর ভেতরেই আমাদের চিন্তা। আধুনিকতার মতবাদগুলোর প্রস্তাবনা আর অনুসিদ্ধান্তগুলোকে আমাদের কাছে 'কমনসেন্স', স্বতঃসিদ্ধ অথবা স্বপ্রমাণিত বলে মনে হয়। আমাদের চিন্তা আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে গেছে যে ইসলামের সত্য এবং সৌন্দর্যকেও আধুনিক মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারে না। ইসলামের সত্যকে তার বুঝতে হয় 'মানবতা', 'অধিকার', 'স্বাধীনতা', 'সাম্যের' মতো ধারণার পশ্চিমা সমীকরণের ভেতরে ফেলে। আর ইসলামের কোনো কিছু যখন এই কাঠামোর সাথে মেলে না তখন তার মধ্যে সংকট তৈরি হয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কিন্তু এভাবে ইসলামকে বোঝেননি। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ইসলামকে সৃষ্টিজগতের মালিকের কাছ থেকে আসা দিকনির্দেশনা এবং চিরন্তন সত্য হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। সেই ইসলাম আজও আছে কিন্তু আমরা মুসলিমরা বদলে গেছি।

আমরা জানি মহান আল্লাহ সত্য, আমরা জানি তাঁর দ্বীন সত্য। কিন্তু সামনে ইসলামের স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মুসলিম বিনা প্রশ্নে সেটাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না। সত্য সামনে থাকা সত্ত্বেও যেন তার কাছে অদৃশ্য।

ইসলাম ও আধুনিকতার এ সংঘাত আধুনিক মুসলিমের সামনে হাজির হয় কিছু প্রশ্ন আর সংশয়ের আকারে–

- ইসলাম কি ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি বাকস্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি মুক্তচিন্তা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি গণতন্ত্র সমর্থন করে?
- ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমর্থন করে?
- কুরআন-সুন্নাহর সব অবস্থান কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
- ইসলাম নারীবাদকে সমর্থন করে?
- ইসলাম কি সর্বজনীন মানবাধিকারকে সমর্থন করে?
- ইসলাম কি সর্বাবস্থায় শান্তি এবং অহিংস পথকে সমর্থন করে?

এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবার পর আধুনিক মুসলিমদের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

একদল বলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নেতিবাচক। ইসলাম এগুলো সমর্থন করে না। কাজেই ইসলাম সত্য ধর্ম হতে পারে না। এরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

আরেকদল বলে, হ্যাঁ ইসলামে এগুলো সবই আছে। কারণ, যা কিছু ভালো তার সবই ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এটুকু বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে। এই আরোপিত সামঞ্জস্য প্রমাণের জন্য দ্বিতীয়দল তখন ইসলাম বিকৃত করে। ইসলামী শরীয়াহর যা কিছু আধুনিক মতবাদগুলোর সাথে খাপ খায় না, সেগুলোকে তারা বাদ দেয়ার চেষ্টা করে। কিংবা নতুন কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার কসরত করে।

এ দুটো অবস্থানই ভুল। আর দুটো ভুলের শেকড় একই জায়গাতে। দুটো অবস্থানই স্বাধীনতা, নারীবাদ, মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা–ইত্যাদি ধারণাকে ধ্রুব এবং সঠিক ধরে নিচ্ছে। আধুনিক ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মাপকাঠিকে সঠিক ধরে নিয়ে সেই মাপকাঠিতে তারা ইসলামকে মাপছে কিংবা সত্য প্রমাণ করতে চাচ্ছে। একদল আধুনিকতার মানদণ্ডে 'উত্তীর্ণ' না হবার কারণে ইসলাম ত্যাগ করছে। আরেক দল আধুনিকতার ছাঁচে ইসলামকে বসানোর চেষ্টা করছে। দুটো অবস্থানই পশ্চিমা বিভিন্ন মতবাদকে সত্য এবং ধ্রুব বলে মেনে নিচ্ছে।

কিন্তু এ দুই ভুল পথের বাইরে তৃতীয় একটি পথ আছে–ইসলামের অবস্থানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাপারে সংশয়বাদের অবস্থান গ্রহণ

করা। অর্থাৎ আধুনিকতার মাপকাঠিতে ইসলামকে বিচার করার বদলে আধুনিকতাকে ইসলামের চিরন্তন মাপকাঠিতে যাচাই করা। ইসলামকে পশ্চিমা সভ্যতার অনুগামী করার বদলে পশ্চিমা ওয়ার্ল্ডভিউকে প্রশ্ন করতে শেখা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, নারীবাদ, লিবারেলিসমসহ বিভিন্ন আধুনিক মতবাদের পেছনে থাকা ধারণা এবং পূর্বানুমানগুলোকে চিহ্নিত করা। সেগুলোকে প্রশ্ন করা। এর শেকড়গুলো মাটি খুঁড়ে বের করে আনা। সেগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা।

লেখক ও বক্তা ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু ঠিক এ কাজটাই করার চেষ্টা করছেন। দীর্ঘদিন ধরে বক্তব্য এবং লেখালেখির মাধ্যমে লিবারেলিসম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নারীবাদসহ পশ্চিমা বিভিন্ন মতবাদগুলোর পেছনের ধারণা ও প্রস্তাবনাগুলোর ব্যবচ্ছেদ তিনি করে আসছেন। 'সংশয়বাদী' বইটি তার এ ধরনের প্রবন্ধগুলোর একটি সংকলন। বইটিকে কিছুদিন আগে ইংরেজিতে প্রকাশিত তার 'The Modernist Menace To Islam' বইয়ের বঙ্গানুবাদও ধরা যেতে পারে। দুটো বইয়ের অধিকাংশ লেখা এবং অধ্যায়ের বিন্যাস একই। তবে মূল বইয়ের কিছু লেখা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক মনে না হওয়ায় বঙ্গানুবাদে বাদ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে লেখকের মূল বক্তব্য যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখার। যেসব ইংরেজি শব্দ বহুল-প্রচলিত এবং যেসব ইংরেজি পরিভাষার জুতসই কিংবা পরিচিত বাংলা প্রতিশব্দ নেই, সেগুলোর বাংলা করা হয়নি। বইয়ে বেশ কিছু দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলোর ব্যাখ্যা লেখকের আলোচনায় আসেনি, সেগুলোর টীকা যুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা স্বতন্ত্র তাই অনেক ক্ষেত্রে টীকার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

ইসলাম ও আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের একটি। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে আমাদের মধ্যে আজও অনেক বিভ্রান্তি কাজ করে। এখানে যে আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব আছে, সেটাই অনেকে বোঝেন না বা বুঝতে চান না। পশ্চিমা লিবারেল ক্রুসেইডের মোকাবিলার জন্য এই দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং এই লড়াইয়ের উপযুক্ত কৌশল বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি 'সংশয়বাদী' এ ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, বিইযনিল্লাহ।

মহান আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল আমাদের দ্বীন ইসলামকে ওইভাবে বোঝার এবং পালন করার তাউফিক দিন, যেভাবে পালন করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেগুলোকে শরীয়তের অনুগামী করেছিলেন। অন্য সবকিছুকে বিচার করেছিলেন ইসলামের মাপকাঠিতে।

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদ্বু আনহু।

মহান আল্লাহ আমাদের সেই বিশুদ্ধ সরল পথ এবং চূড়ান্ত কষ্টিপাথরের কাছে ফিরে যাবার তাউফিক দিন।

নিশ্চয় সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

আসিফ আদনান
রমাদ্বান ১৪৪২ হিজরি, এপ্রিল ২০২১

লেখক পরিচিতি

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর জন্ম হিউস্টন, টেক্সাসে। পড়াশুনা করেছেন হার্ভার্ডে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ফিযিক্স আর গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে পড়েছেন দর্শন নিয়ে। এছাড়া টাফটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন দর্শনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় তার সুযোগ হয়েছে নোবেল বিজয়ী বিভিন্ন পদার্থবিদ ও দার্শনিকদের অধীনে পড়ার। এছাড়া আলিমগণের তত্ত্বাবধানে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে শিখছেন।

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু আলাসনা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। এ ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ইসলাম নিয়ে আধুনিক সময়ের বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের মোকাবেলা করতে মুসলিমদের শেখানো। পশ্চিমা দার্শনিক চিন্তা, ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য এবং মুসলিম ও মডার্নিটির সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লেখালেখি করে থাকেন। ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাসজিদ এবং মাদ্রাসায় বক্তব্য রেখেছেন।

লেখকের সাইট:

মুসলিম স্কেপটিক – https://muslimskeptic.com/

আলাসনা ইন্সটিটিউট –https://www.alasna.org/

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও বাদশাহ। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াময় এবং সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

মডার্নিটি[১] মানবজাতির জন্য এবং ইসলামের জন্য হুমকি। কিন্তু মডার্নিটির এ বিপদকে বুঝতে হলে আমাদের কিছুটা পেছনে যেতে হবে। ঐতিহাসিকদের মতে মডার্নিটির শুরু ষোড়শ শতাব্দীতে। এই শতাব্দী ছিল ইউরোপের ইতিহাসের তীব্র উত্থান-পতনের সময়। রিফর্মেশানের মাধ্যমে এ শতাব্দীতে শুরু হয় খ্রিষ্টানদের নিজেদের মধ্যেকার তিক্ত সংঘাত, যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় সেক্যুলারিসম। যুদ্ধ, রক্তপাত ও তীব্র বিভাজন ধর্ম ও বাইবেলের প্রতি ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মনকে বিষিয়ে তোলে। ধর্ম আর বাইবেলকে মানুষ দেখতে শুরু করে অজ্ঞতা এবং দুর্দশার উৎস হিসেবে।

কিন্তু ঈশ্বর আর বাইবেলকে বাদ দিলে শূন্যস্থানে বসবে কে? নৈতিকতার উৎস কী হবে? অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাব মিলবে কোথা থেকে?

---

[১] মডার্নিটি (Modernity)–লেখক বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় মডার্নিটি ও মডার্নিসম শব্দ দুটো সমার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। অনুবাদে কখনো 'আধুনিকতা' ও 'আধুনিকতাবাদ' ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল 'মডার্নিটি' রেখে দেয়া হয়েছে। শাব্দিকভাবে 'আধুনিক' বলতে আমরা 'অধুনা', 'সম্প্রতি' বা 'বর্তমানসম্বন্ধীয়' অর্থ গ্রহণ করে থাকি। ধারণা হিসেবে 'আধুনিকতা'কে আমরা কিছু লক্ষণের সাথে যুক্ত করি, যেমন শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রযুক্তিনির্ভরতা, জাতিরাষ্ট্র, গণতন্ত্র, প্রগতিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারেলিসম ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিকতার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ও অর্থ আছে। এই 'আধুনিকতা' ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, শাসন, ইতিহাস, মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী, মহাবিশ্ব–ইত্যাদির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। আধুনিকতা এই অর্থে একটি দর্শন এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিও। আধুনিকতাকে অনেক ক্ষেত্রে এনলাইটেনমেন্টের সমার্থকও ধরা হয়। এ বইয়ের আলোচনায় 'মডার্নিটি' এবং 'মডার্নিসম' অর্থাৎ 'আধুনিকতা' এবং 'আধুনিকতাবাদ'-এর মতো শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই ব্যাপক অর্থে। বিস্তারিত জানার জন্য, 'মডার্নিটি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ~অনুবাদক

প্রথমদিকের মডার্নিস্টরা মেটাফিযিকাল ও দুনিয়াবি কর্তৃত্বের আসনে বসায় নিজেদের মনকে। তারা মনে করত মানব-মন এবং মানবীয় যুক্তিই পারে মানবজাতিকে পথ দেখাতে। এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয় গাণিতিক বিজ্ঞান এবং আইযাক নিউটনের পরীক্ষালব্ধ পদার্থবিজ্ঞানের সফলতা দেখার পর। তারা ধরে নেয়, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতাজাত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানব-মন পরিণত হতে পারে ঈশ্বরে। কারণ মানব-মনের আছে আবিষ্কার এবং যুক্তি ব্যবহারের অসীম ক্ষমতা। মহাবিশ্ব আর মানবপ্রকৃতি নিয়ে সব প্রশ্ন একদিন অঙ্কের মতো সমাধান হয়ে যাবে, এ কেবল সময়ের ব্যাপারমাত্র!

তবে জ্ঞান হলো গল্পের অর্ধেক। মাটির মানুষ শুধু জ্ঞানের বদৌলতে দেবতায় পরিণত হতে পারে না। সমীকরণের বাকি অর্ধেকটা হলো ক্ষমতা। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে পারা। মনের মতো করে পৃথিবীকে বদলে নেয়া। আর এই ক্ষমতা অর্জিত হয় প্রযুক্তির মাধ্যমে। প্রযুক্তির অগ্রগতি এক ক্রমাগত চলমান প্রক্রিয়া। মডার্নিস্টদের কাছে এর অর্থ হলো, প্রযুক্তি মানুষকে অসীম শক্তি এবং দেবত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। জ্ঞান আর প্রযুক্তির মিশেলে অসীম ক্ষমতা অর্জন কেবল সময়ের ব্যাপার।

মডার্নিসমের সমীকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সময়। মডার্নিসমের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রগতিবাদ। প্রগতিবাদ বলে, যত সময় যাচ্ছে তত মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার অগ্রগতি হচ্ছে। বুদ্ধি ও নৈতিকতার দিক থেকে সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে। আজকের মানুষ অতীতের মানুষের চেয়ে উত্তম। সময়ের সাথে সাথে মানবজাতি ছুটে চলেছে এক নিখুঁত কল্পরাজ্যের দিকে, যার সাথে তুলনা চলে কেবল ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত জান্নাতের। প্রগতির ওপর এই অন্ধ বিশ্বাস আধুনিকতাবাদের ভিত্তি। বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সবাই প্রগতিবাদের এই অবস্থানকে মেনে নেয় স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে। আর এখান থেকেই মডার্নিটির বিপজ্জনক প্রকৃতির বিষয়টা স্পষ্ট হতে শুরু করে। প্রগতিবাদের অর্থ হলো পরিবর্তন মাত্রই ইতিবাচক। পরিবর্তনই স্বতন্ত্র লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ। অন্যদিকে স্থিরতা হলো অনৈতিক। পরিবর্তনের বিরোধিতাকে তাই দেখা হয় আক্ষরিক অর্থেই মানবজাতির ওপর আক্রমণ হিসেবে।

মডার্নিটির প্রধান শত্রু তাই ট্র্যাডিশান। কারণ ট্র্যাডিশানের প্রতি অঙ্গীকারের অর্থ পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করা। কিছু নীতিকে অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন, ধ্রুব হিসেবে গ্রহণ করা। এগুলোর সংস্কার করা সম্ভব না, এগুলো আপডেট করা সম্ভব না। ট্র্যাডিশানের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার অর্থ অতীতের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখা, কোনো-না-কোনোভাবে অতীতের ওপর নির্ভর করা। আর এই বৈশিষ্ট্যই মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে

দেয় ট্র্যাডিশান আর মডার্নিটিকে। সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং বিশেষ করে ধর্মীয় ট্র্যাডিশান মডার্নিটির প্রবর্তন আর সংস্কারের বুলডোজারের নিচে পিষ্ট হবার নিরন্তর হুমকির মধ্যে থাকে। আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মীয় ট্র্যাডিশানের কোনো স্থান নেই।

আধুনিক কিংবা আধুনিকায়িত ধর্ম খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখা ফুলদানির মতো। এই ফুলদানি মূল্যহীন। তার কাজ এক কোনায় পড়ে থাকা। যতক্ষণ সে অন্য কিছুকে প্রভাবিত করছে না, ততক্ষণ তাকে সহ্য করা হবে। মূল আয়োজন মডার্নিটির মতবাদগুলো। খাবার সময় কেউ বিক্ষিপ্তভাবে ফুলদানির দিকে তাকালে সেটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি মডার্নিটির মতবাদগুলোকে বাদ দিয়ে ধর্মকেই আঁকড়ে ধরতে চায়, তাহলে সেটা মেনে নেয়া হবে না। যে ধর্ম ফুলদানি হয়ে থাকতে রাজি, মডার্নিটি তাকে টেবিলে জায়গা দেবে। কিন্তু যে ধর্ম এর চেয়ে বেশি কিছু হতে চায়, তাকে মেনে নেয়া হবে না।

আধুনিক চিন্তার পেছনে সব সময় একটা ধারণা কাজ করে–

জীবনের সব মৌলিক প্রশ্নের যদি উত্তর মডার্নিটি এবং আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বগুলো দিতে পারে, তাহলে ধর্মের প্রয়োজন কী?

মানুষ কোথা থেকে এল?

মডার্নিটির জবাব : ডারউইনিসম এই প্রশ্নের উত্তর দেয়

মহাবিশ্ব কীভাবে কাজ করে?

মডার্নিটির জবাব : বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দেয়

ভালো কিংবা নৈতিক হবার অর্থ কী?

মডার্নিটির জবাব : লিবারেলিসম এ প্রশ্নের উত্তর দেয়–অন্যের সাথে এমন আচরণ করো, যেমন আচরণ তুমি নিজের জন্য চাও। সমতা আর স্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ।

সবকিছুর অর্থ আসলে কী?

মডার্নিটির জবাব : কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। আমরা নিজেই নিজেদের মতো করে অর্থ বানিয়ে নিই। আমরা মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতায় ইতস্তত ভেসে বেড়ানো পরমাণুর সমষ্টিমাত্র।

আধুনিক মানসিকতা অনুযায়ী তাই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। সব প্রশ্নের উত্তর আধুনিক মানুষ আগেই বের করে রেখেছে। মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু ধর্ম দিতে পারে না। আধুনিকতা মনে করে মানুষ ধর্ম পালন করে কালচারাল বায়াসের কারণে অথবা অভ্যস্ততা আর অভ্যাসের বশে। ধর্ম পালনের আর কোনো কারণ, আর

কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। আধুনিকতার চোখে তাই প্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সংকীর্ণমনা অন্ধ বিশ্বাসী–যে হাজার বছরের পুরোনো কিতাব আঁকড়ে থাকে। ধর্ম হলো প্রগতির অন্তরায়। আর তাই মিডিয়া, শিক্ষা, আইন, বৈশ্বিক রাজনীতিসহ বিভিন্ন দিক থেকে বহুমাত্রিক আক্রমণ চালিয়ে ধর্মকে ধ্বংস করতে চায় আধুনিকতা। এই আক্রমণ তীব্র এবং ব্যাপক।

ইসলামকে মডার্নিটির প্রতিতত্ত্ব (antithesis) বললে ভুল হবে না। মডার্নিটির দার্শনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাবিদদের হাতে। তাদের চোখে ইসলাম ছিল খ্রিষ্টবাদের আরও বর্বর এবং পশ্চাৎপদ এক সংস্করণ। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক এবং নাস্তিক ভলতেয়ার তার লিখিত 'ম্যাহোমেট' শিরোনামের নাটকে নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উপস্থাপন করেছিল উন্মাদ স্বৈরাচার হিসেবে আর কুরাইশ মুশরিকদের চিত্রিত করেছিল মুক্তচিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে।

ইসলামের ব্যাপারে অধিকাংশ ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তা ছিল তিক্ত ওরিয়েন্টালিসমের (প্রাচ্যবাদ) রঙে রাঙানো। তাদের চোখে ইসলাম স্বৈরাচারী আর আধুনিকতা হলো স্বাধীনতা। ইসলাম অযৌক্তিক আর আধুনিকতা প্রধান স্তম্ভই হলো মানবীয় যুক্তি। ইসলামের অর্থ স্থবিরতা ও ক্ষয়, অন্যদিকে আধুনিকতার অর্থ নিরন্তর পরিবর্তন আর নবায়ন।

বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বের এ ইতিহাস ছাড়াও, প্রকৃতিগতভাবেই মডার্নিটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, সব ধর্মের মধ্যে ইসলামই আজও অপরিবর্তিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর সংরক্ষণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ। প্রথম প্রজন্মের মতো করে দ্বীন পালন করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের পুরো জ্ঞানতত্ত্ব তৈরি হয়েছে অতীতে আসা ইলমের সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের ওপর। ইসলামে শুধু ওয়াহি নাযিল হবার সময়কার জ্ঞানের কথা আসেনি; বরং পৃথিবীতে মানব-অস্তিত্বের আগের জ্ঞানের কথাও এসেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। [তরজমা, সূরা আল-আ'রাফ, ১৭২]

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর উপাস্য হবার একক অধিকার–এই জ্ঞান

মানুষের সহজাত প্রকৃতি তথা ফিতরাহর মধ্যে সংরক্ষিত। এই সহজাত প্রকৃতিই মানুষকে ধাবিত করে কল্যাণ এবং বিশুদ্ধতার দিকে। দুনিয়ার টানাপড়েন, শিরক, নাফস, কাম, লালসা, খেয়ালখুশি কিংবা শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফলে এই ফিতরাহ কলুষিত হয়। ইসলামের আমল ও বিধি-বিধানগুলো মানুষের ফিতরাহকে সংরক্ষণ করে এক আল্লাহর ইবাদতে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। মনের নিয়ন্ত্রণও একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মুমিনকে তার খেয়ালখুশি এবং ইচ্ছেকে শরীয়াহর অনুগামী করতে হয়, চেষ্টা করতে হয় সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের। এই মূল্যবোধগুলো এবং চিন্তার এই পুরো কাঠামোই আধুনিকতাবাদ এবং এর সহগামী মতবাদগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক।

তবে ইসলাম ও মডার্নিটির মধ্যে বৈরিতা কেবল তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুসলিমদের সাথে মডার্নিটির অনুসারীদের সংঘাত শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, মুসলিম-বিশ্বে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সুবাদে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রথম লক্ষ্য ছিল মুসলিম-বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, 'সপ্তম শতাব্দীতে আটকে থাকা বর্বর মুসলিমদের' মডার্নিটি ও প্রগতির আলোতে নিয়ে আসা। এই দুই লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম। মুসলিম মানসের ওপর ইসলামের প্রভাবকে দুর্বল করার জন্য ইউরোপীয়রা তখন এখন সূক্ষ্ম কৌশল গ্রহণ করে। উপনিশবাদী প্রকল্প উত্তর আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং আলিমদের নিশানা বানায়। ধীরে ধীরে তাদের অর্থের উৎসগুলো বন্ধ করে দেয়, সেখানে গড়ে তোলে ইউরোপিয়ান, সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী জ্ঞানের ভাষা (আরবী) থেকে শুরু করে ইসলামী পোশাক, এমনকি ইসলামী পারিবারিক কাঠামোও শিকার হয় ঔপনিবেশিক আক্রমণের। ধাপে ধাপে ইসলামী পরিচয় ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হয় মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন অংশে। আধুনিকতার আগ্রাসনের মুখে মুমূর্ষু অবস্থায় কিছুদিন টিকে থাকার পর ১৯২৪ সালে পুরোপুরিভাবে অবসান ঘটে খিলাফাত-ব্যবস্থার। ইসলামী সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া এই আগাগোড়া পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ধ্বংস ও হত্যা। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি জেনোসাইড। 'প্রগতির পথে বাধা' হবার কারণে ইউরোপীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মুসলিমদের হত্যা করা হয় পাইকারিভাবে। শেষ হিসেবে দেখা গেল, প্রগতি ও এনলাইটেনমেন্টের পশ্চিমা দেবতার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে কয়েক কোটি মুসলিমকে। যেসব মুসলিম প্রাণে বেঁচে গেল তারা এবং তাদের সন্তানেরা মগজধোলাইয়ের শিকার হয়ে একসময় মডার্নিটি এবং এর মতবাদগুলো গ্রহণ করতে শুরু করল। পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থা, মিডিয়া, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে

মুসলিমদের মনে গেঁথে দেয়া হলো, 'আধুনিক = ভালো'।

আধুনিকায়িত মুসলিমরা গ্রহণ করল এক প্যারাডক্সিকাল চিন্তা–মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরে পাবার চাবিকাঠি হলো আধুনিকতাবাদ। কর্তৃত্বের অবস্থানে ফিরে যেতে হলে অনুসরণ করতে হবে পশ্চিমের। আধুনিক পশ্চিমের মতবাদ, দর্শন, রাজনীতি, লাইফস্টাইল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি–অনুকরণ করতে হবে সবকিছু। এই ধারণা আজও অতটাই শক্তিশালী যতটা ছিল ২০০ বছর আগে। আর গতকালের মতো আজও এ ধারণা মিথ্যা।

আধুনিকতাবাদ গ্রহণের অর্থ ইসলামকে ত্যাগ করা। আধুনিকতাবাদের অনুসরণ করে মুসলিমরা যদি কোনোদিন পশ্চিমের ওপর বিজয়ী হয়-ও, তাহলে ততদিনে তারা আর মুসলিম থাকবে না। যদি এমন 'বিজয়' কখনো আসে, তাহলে সেটা হবে ফাঁপা, অর্থহীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনোভাবে সত্যিকারের বিজয় আসতে পারে না। মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন–

> *...আর সাহায্য ও বিজয় কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। [তরজমা, সূরা আলে ইমরান, ১২৬]*

আমরা একে অলঙ্ঘনীয় এবং অনতিক্রম্য সত্য বলে বিশ্বাস করি।

আধুনিকতাবাদের বিষাক্ত প্রকৃতিকে চিনতে পারলে, মুসলিম মানসে এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। একই মনে মডার্নিটির প্রগতিবাদ আর ইসলামের ট্র্যাডিশানালিসম কীভাবে সহাবস্থান করতে পারে? যে মানুষ প্রগতিবাদে বিশ্বাসী–যে মনে করে মানুষ ক্রমেই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছে, আজকের মানুষ অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক নৈতিক–সে কীভাবে বিশ্বাস করবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রজন্ম এবং পরবর্তী দুই প্রজন্ম? এ দুই অবস্থান একইসাথে ধারণ করা সম্ভব না। কিন্তু কলোনাইযড মুসলিমের মন এই দুই সাংঘর্ষিক অবস্থানের মধ্যে সমন্বয়ের জন্যে নানান কসরত করতে থাকে।

> 'হয়তো সমাধান ইসলামের সংস্কার করার মধ্যে। হয়তো সমাধান ইসলামকে আধুনিকতার মাপকাঠিতে আপডেট করায়। হয়তো ইসলামের যা কিছু লিবারেলিসম, সেক্যুলারিসম, নারীবাদ, বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো মুছে ফেললেই সমাধান হবে!'

মুসলিমরা আজ ব্যাপকভাবে যেসব সংশয়ে আক্রান্ত হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তাগুলোই তার উৎস। এই সংকট ও সংশয়গুলোর মুখোমুখি হলে আধুনিকাতাবাদ দ্বারা কলুষিত মুসলিম মন চিন্তা করে আধুনিকতার ছাঁচে ফেলে ইসলামকে কাটছাঁট করার, অর্থাৎ ইসলামকে বিকৃত করার। কিন্তু দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করার বদলে তাদের আসলে

আধুনিকতাবাদের ছাঁচকে ভাঙার চিন্তা করা উচিত। আর আধুনিকতার ছাঁচকে ভাঙতে হলে ওইসব মতবাদ আর তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ করতে হবে, যেগুলো আজ মুসলিমদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

মুসলিম মন যখন এই বিষাক্ত মতবাদগুলোর আবর্জনা থেকে মুক্ত হবে, সে যখন চিন্তার দাসত্বের শেকলকে ছিঁড়বে, আধুনিকতার মগজধোলাই থেকে বের হয়ে আসবে, যখন তার চিন্তার বি-উপনিবেশিকরণ হবে–তখনই ইসলামের বিশুদ্ধ আলোতে সে স্পষ্টভাবে বাস্তবতাকে বুঝতে শিখতে।

আধুনিকতাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতবাদের ক্রিটিক করে আমি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছি। এ বই হলো সেগুলোর সংকলন, আশা করি আগামীতে এ সিরিযের আরও বই প্রকাশিত হবে। বইয়ের লেখাগুলো প্রধানত মুসলিমদের জন্য হলেও যেসব অমুসলিম পাঠক মডার্নিটির কলুষতাকে চিনতে সক্ষম, কিছু ইসলামী পরিভাষা ছাড়া বইয়ের অধিকাংশ বক্তব্য তারাও বুঝতে পারবেন। বইয়ের অধ্যায়গুলো কোনো নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়নি, প্রতিটি অধ্যায়ে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক যেকোনো ক্রমধারায় বইটি পড়তে পারেন। এই বইয়ে আসা ক্রিটিক সর্বাঙ্গীন না, তবে আজকের সর্বাধিক প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকরী কিছু হাতিয়ার পাঠক এ বইতে পাবেন ইন শা আল্লাহ। আমি আশা করি বইয়ের আলোচনা পাঠককে চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং আল্লাহ চাইলে চিন্তার জগতে প্যারাডাইম শিফট নিয়ে আসবে। মানুষ বুঝতে পারবে মডার্নিটিস্ট সম্রাটের গায়ে আসলে কোনো পোশাক নেই।

আর মহান আল্লাহই হলেন প্রকৃত বাদশাহ, রাজাধিরাজ।

আল্লাহ আমাদের কাজগুলো কবুল করুন এবং আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। তিনি আমাদের অন্তরকে ইখলাস ও হিদায়াহর আলোতে আলোকিত করে দিন। আমাদের ও আমাদের সন্তানদের মুসলিম না হয়ে, তাঁর একান্ত অনুগত, আত্মসমর্পণকারী দাস না হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

আমীন।

নাস্তিকতা

স্টিফেন হকিংয়ের আত্ম-উপাসনা

স্টিফেন হকিং-এর ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) বইটা পড়েছিলাম ক্লাস সেভেন কিংবা এইটের দিকে। অসাধারণ লেগেছিল। কয়েক বছর পর তার সাথে সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ হয়। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে হকিং এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফিযিক্স নিয়ে পড়াশোনায় আমার আগ্রহ তৈরি হবার একটি কারণও ছিলেন তিনি। সেই আগ্রহ একসময় আমাকে নিয়ে যায় হার্ভার্ডে, যেখান থেকে আমি ফিযিক্সে একটি ডিগ্রি অর্জন করি।

হকিং-এর ব্যাপারে একটা বিষয় সব সময় পরিষ্কার ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী। তবে তার বিশ্বাস স্রষ্টার ওপর ছিল না; হকিং শক্ত নাস্তিক ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল 'গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি অফ এভরিথিং'-এ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবীয় যুক্তি আর বুদ্ধি একসময় এমন এক তত্ত্ব খুঁজে পাবে, যা সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে এক সূত্রে গাঁথবে। এ বিশ্বাসের ওপর ঈমান এনেছিলেন হকিং। কিন্তু এমন কোনো থিওরি কি আসলে আছে? হকিং বিশ্বাস করতেন আছে, এবং আইনস্টাইনসহ অন্যান্য আরও অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর মতোই এ থিওরি খুঁজে বের করার পেছনে তিনি নিজের জীবন ব্যয় করেছেন।

কিন্তু এমন কোনো থিওরি যে আছে, তার প্রমাণ কী? এমন কোনো থিওরি যে আবিষ্কার করা সম্ভব, সেটাও-বা আমরা কীভাবে জানছি? পদার্থবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে এই প্রশ্নগুলো আমাকে ভোগাত। আমার প্রফেসরদের কারও কাছেই এসব প্রশ্নের শক্ত কোনো জবাব ছিল না। তারা বেশি থেকে বেশি যা বলতেন তার সারমর্ম হলো, মহাবিশ্ব এতই সূক্ষ্ম, এমনই জটিল ও অসাধারণ শৃঙ্খলা এতে বিদ্যমান যে এসব কিছুর গোঁড়ায় 'কিছু একটা' থাকতে বাধ্য। নিশ্চয় এর পেছনে গভীর কোনো সত্য আছে।

অবিশ্বাস্য জটিল নিয়মতান্ত্রিকতা, এ 'মহাপরিকল্পনা'-এর পেছনে নিশ্চয় কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য আছে, কারণ আছে।

হকিং এর বিশ্বাস ছিল—এ সবকিছুকে ঘিরে আছে একটি থিওরি; এমন কোনো সমীকরণ, যা দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। অনেক পদার্থবিজ্ঞানী একে 'ঈশ্বর সমীকরণ' (God Equation) বলেন।

এ ধরনের বিশ্বাসে; বিশেষ করে হকিং এর মতো লোকদের ক্ষেত্রে, শিরকের ব্যাপারটা স্পষ্ট। মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের উৎসের ব্যাপারে এ ধরনের মেটাফিযিকাল[২] কল্পনাবাজির পাশাপাশি তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করত কট্টর; প্রায় যুদ্ধংদেহীভাবে। প্রচণ্ড সূক্ষ্ম ও জটিল হওয়া সত্ত্বেও এ মহাবিশ্ব নিয়মতান্ত্রিক, এবং মানব-মনের কাছে বোধগম্য—কারণ, মানব-মন ও মহাবিশ্ব, উভয়ের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন—এ সুস্পষ্ট সত্যকে মেনে নেয়ার বদলে, হকিং বেছে নেন গোঁয়ারের মতো মুখ ঘুরিয়ে নিজ কল্পনাপ্রসূত এক অলীক ধারণা—'ঈশ্বর সমীকরণ'—এর পেছনে জীবন ব্যয় করাকে।

হকিং এবং তার মতো নিজের খেয়াল-খুশির উপাসনা করা অন্যান্য মানুষদের মৃত্যুর ব্যাপারে সূরা মুলকের প্রথম দিকের বেশ কিছু আয়াত আমার কাছে বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়ে। নিজেদের আলোকিত মনে করলেও, আসলে তারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে।

> *'মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যাঁর হাতে; তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ, স্তরে স্তরে। আর-রাহমানের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না; আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তোমরা বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো; ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে সেই দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরে আসবে। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি; কতই-না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল!' [তরজমা, সূরা মূলক, আয়াত ১-৬]*

---

[২] মেটাফিযিক্স—বাংলায় অধিবিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জানা, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, সময়, স্থান, সম্ভাবনা এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। ~ অনুবাদক

নাস্তিক = লিবারেল-সেক্যুলারিস্ট

সাধারণত নাস্তিকরা মনে করে তাদের কোনো মতাদর্শ বা বিশ্বাস নেই। দেখবেন নাস্তিকরা প্রায়ই বলছে, নাস্তিকতা হলো বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। কথাটা একদিক থেকে সঠিক। তাদের কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই। কিন্তু তার মানে এই না যে নাস্তিকদের কোনো ধরনেরই বিশ্বাসই নেই। এমন অনেক মতাদর্শ আর বিশ্বাস তারা লালন করে, যেগুলোর সমালোচনা করা সম্ভব। যেগুলো অসংগতি এবং পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতায় পূর্ণ।

অধিকাংশ নাস্তিক অহংকারী ধরনের হয়। এটা নাস্তিকদের একটা কমন বৈশিষ্ট্য। তাদের মধ্যে একধরনের মিথ্যে আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তার অনুভূতি কাজ করে। তারা মনে করে, যেহেতু তাদের কোনো বিশ্বাস নেই তাই নিজ বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দেয়া কিংবা সাফাই গাওয়ার কোনো প্রয়োজনও তাদের নেই। নিশ্চিন্ত মনে তারা শুধু আস্তিকদের আক্রমণ করে যাবে, অন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের সমালোচনা করবে, আর প্রতিপক্ষ সব সময় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকবে।

কেউ যখন মনে করে তার ডিফেন্ড করার কিছু নেই, তখন সে অসতর্ক আর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এটাই বেশির ভাগ নাস্তিকদের ক্ষেত্রে ঘটে। তাই নাস্তিকদের সাথে বিতর্কের সময় আক্রমণাত্মক হতে হবে, কেবল রক্ষণাত্মক হলে চলবে না।

নাস্তিকরা আসলে লিবারেল সেক্যুলারিস্ট। এটাই তাদের মতাদর্শ, ওয়ার্ল্ডভিউ, বিশ্বাস। নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রাজনীতি, শাসন, ইতিহাস ও ইতিহাসের গতিপথ বোঝা—সবকিছুর ব্যাপারে তাদের চিন্তা লিবারেল-সেক্যুলার দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। আর লিবারেল-সেক্যুলার দর্শনকে আক্রমণ ও সমালোচনার অনেক দিক আছে। এই মতাদর্শের ইতিহাস রক্তাক্ত এবং জঘন্য। নাস্তিকদের সাথে আলোচনার সময় তাই লিবারেল-সেক্যুলারিসমের কথা নিয়ে আসতে হবে। এ দর্শনকে আক্রমণ করতে হবে।

তবে এখানে একটা জটিলতা আছে। লিবারেল-সেকুলারিসম বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী মতাদর্শ। এ দর্শন এতই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে লিবারেল সেক্যুলারিসমের অবস্থানগুলোকে আজ 'কমনসেন্স' হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়।

অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষও আজ লিবারেল সেক্যুলারিসমের মাপকাঠিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমন অনেক মুসলিম, খ্রিষ্টান বা ইহুদী আছে, যারা চিন্তাভাবনায় আগাগোড়া সেক্যুলার এবং লিবারেল। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বকে দেখতে এবং ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত।

ইসলাম শুরু থেকেই সম্প্রসারণবাদী আদর্শ। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট। সহজ ভাষায় সম্প্রসারণবাদী হবার অর্থ হলো বিভিন্ন ভূমি জয় করা এবং সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে শুরু করে ইসলামের পুরো ইতিহাসজুড়ে এটা চলে আসছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে নাস্তিকরা ইসলামকে আক্রমণ করে। অনেক মুসলিমরা তখন আবার রক্ষণাত্মক হয়ে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চায়, অথবা জোড়াতালির ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। অথচ কোনো কৈফিয়ত না দিয়েও এ অবস্থানকে সহজেই ডিফেন্ড করা সম্ভব।

বাস্তবতা হলো মানবজাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সব মতাদর্শই সম্প্রসারণবাদী। আর এমন হওয়াই যৌক্তিক। আমার কাছে যদি ভালোমন্দের চূড়ান্ত মাপকাঠি থাকে, তাহলে আমি চাইব অন্যরাও এই মাপকাঠি মেনে চলুক। এই চিন্তা সর্বজনীন। পৃথিবীর সব প্রধান প্রধান নৈতিক কাঠামো এ ধরনের সম্প্রসারণবাদী মূল্যবোধ লালন করে। তার মানে এই না যে আমার নৈতিকতার প্রতিটা বিষয় সবার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে; বরং সম্প্রসারণবাদের অর্থ হলো, আমি মনে করি কিছু মৌলিক নৈতিক সত্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সবার এগুলো মেনে চলতে হবে।

ভালোর সংজ্ঞা কী? মন্দের সংজ্ঞা কী? বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন নানাভাবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সব ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন এই বিষয়ে একমত যে, এমন কিছু খারাপ কাজ আছে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে হলেও যেগুলো থামাতে হয়। এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এ উপলব্ধি সর্বজনীন। এটা লিবারেল সেক্যুলারিসমের ক্ষেত্রেও সত্য। এই মতাদর্শও সম্প্রসারণবাদী।

লিবারেলিসমে বিশ্বাসীরা কেন যেন মনে করে তাদেরটাই একমাত্র মতাদর্শ, যা অন্যের ওপর নিজেকে চাপিয়ে দেয় না। এটা আসলে হয়তো লিবারেলিসমের আত্মপ্রতারণার অংশ। লিবারেলদের এই বিশ্বাস হাস্যকর। লিবারেলিসম একটা হিংস্র, কর্তৃত্ববাদী এবং সম্প্রসারণবাদী আদর্শ। ইতিহাসে আর কোনো আদর্শ মানুষের ওপর এত বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়নি।

লকডাউনের কথা চিন্তা করুন। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের শুরুর দিকে দু-মাসের মতো একটা সময় গেছে, যখন সারা বিশ্বের প্রায় সবাই লকডাউনে ছিল। মানুষ যেন বাড়ি থেকে বের না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক জায়গায় পুলিশ, মিলিটারি

নামানো হয়েছিল। এটা কি চাপিয়ে দেয়া না? এটা কি একধরনের জোর করা না? লকডাউন যৌক্তিক কি না, সেটা আলাদা আলাদা বিষয়। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই চাপিয়ে দেয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের কর্তৃত্ববাদী আচরণ। কিন্তু পুরো বিশ্ব এই চাপিয়ে দেয়াকে মেনে নিয়েছে। আসলে বলা ভালো, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ কাউকে দেয়া হয়নি।

নাস্তিকদের সাথে তর্কের সময় আমরা তাই বলতে পারি :

মুসলিম হিসেবে আমরা মনে করি ইসলামী শাসন চাপিয়ে দেয়া বৈধ, সঠিক এবং যৌক্তিক। কারণ, আমাদের ভালোমন্দের মাপকাঠি ইসলাম। ইসলাম আমাদের শেখায় শিরক, কুফর, যিনা, রিবা, মদ, ড্রাগসসহ বিভিন্ন জিনিস মন্দ। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। একইভাবে কোনো মূল্যবোধ এবং আচরণগুলো ভালো সেটাও আমরা শিখি ইসলাম থেকে। আমাদের সাথে তুমি একমত না হতে পারো। হয়তো তোমার চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক, হয়তো তুমি একগুঁয়ে। যা-ই হোক না কেন, সেটা প্রাসঙ্গিক না। তুমি যা-ই মনে করো না কেন, ইসলামের দেয়া নৈতিক কাঠামো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ, এটা শাশ্বত সত্য।

তা ছাড়া ইতিহাসজুড়ে ইসলামী শাসনের অধীনে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষ সহাবস্থান করেছে। এখানে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই। ঠিক একই জিনিস বর্তমান পৃথিবীতে ঘটছে এবং তুমি মেনে নিচ্ছ। আজ যা হচ্ছে, নৈতিক, যৌক্তিক এবং কাঠামোগত দিক থেকে তা কিন্তু ঠিক একই ধরনের চাপিয়ে দেয়া; বরং আজ আরও ব্যাপক মাত্রায় এটা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ আসলে কতটা বিপজ্জনক, এর ভ্যাকসিন কতটা নিরাপদ, কিংবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ব্যাপারে তুমি কী বিশ্বাস করো– তাতে কিছু যায়-আসে না। ইন ফ্যাক্ট, কোনো বিষয়েই তোমার মনে করা বা না করায় তেমন কিছু যায়-আসে না। যা আইন, যা গ্লোবাল পলিসি সেটা তোমাকে মানতে হবে। স্বেচ্ছায় না মানলে, মানতে বাধ্য করা হবে। এই আইন তোমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

মূল পয়েন্ট হলো, আপনি যখন দেখাবেন লিবারেল-সেক্যুলার ব্যবস্থা আসলে জোরজবরদস্তি করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন লিবারেল ফ্যান্টাসি ভেঙে যাবে। কোনো নাস্তিক যখন তাত্ত্বিকভাবেও মেনে নেবে যে তার নিজস্ব মতাদর্শ সম্প্রসারণবাদী, তখন বাকি তর্ক সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহ ছাড়া সব মানতে রাজি!

আল্লাহকে অস্বীকার করার জন্য নাস্তিকরা বিচিত্র ধরনের সব তত্ত্ব হাজির করে।

মহাবিশ্ব কি ভিনগ্রহের প্রাণীদের তৈরি কম্পিউটার সিমুলেশান?

'সম্ভাবনা আছে'!

আমাদের মহাবিশ্ব কি অসীম-সংখ্যক মহাবিশ্বের মধ্যে একটা? আমাদের মহাবিশ্বের মতো অনেক মহাবিশ্ব মিলে একটা মাল্টিভার্স আছে–যা ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, প্রমাণ করা যায় না–এমন কি হতে পারে?

'হতে পারে। বেশ যৌক্তিক মনে হচ্ছে।'

মহাবিশ্ব কি এক বিশাল সমন্বিত, সচেতন সত্তা; যে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে?

'কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না'

মহাবিশ্ব কি অত্যন্ত উন্নত মহাজাগতিক কোনো প্রাণীর অশরীরী বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ?

'চমৎকার বলেছ তো, ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো!'

কিন্তু এই একই মানুষকে যদি আল্লাহর কথা বলা হয়?

মহাবিশ্ব কি এক সর্বশক্তিমান স্রষ্টার তৈরি?

'আরে কী-সব অযৌক্তিক কথাবার্তা শুরু করলে। তুমি দেখছি এখনো মধ্য যুগে পড়ে আছ। এখনো এসব গালগল্প বিশ্বাস করো নাকি?'

বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা এমন বিচিত্র-সব থিওরি দিয়ে যাচ্ছে কেন বলুন তো?[৩]

কারণ, তারা জানে মহাবিশ্বের ব্যাপারে নিরেট জড়বাদী, বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যথেষ্ট না। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তারা জানে, পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট হবার সব বৈশিষ্ট্য মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া যায়।

---

[৩] ওপরের হাইপোথিসিসগুলোর পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অনেকের বক্তব্য আছে। আগ্রহী পাঠক দেখুন, যথাক্রমে—Simulation Hypothesis, multiverse hypothesis, Many worlds interpretation, Panpsychism/ Conscious Universe hypothesis ইত্যাদি। ~ অনুবাদক

সবকিছু থেকে প্রতীয়মান হয় এসব কিছুর পেছনে কোনো ইচ্ছা, কোনো উদ্দেশ্য আছে।

আর এসব কিছু একটা নির্দিষ্ট উত্তরের দিকে আমাদের নিয়ে যায়–আল্লাহ। কিন্তু সেই উত্তর তারা মানতে নারাজ। তারা আল্লাহকে স্বীকার করে চায় না, তাই কম্পিউটার সিমুলেশান থেকে শুরু করে ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো নানান আষাঢ়ে গল্পের আসর বসায়। অথচ যে বস্তুবাদী দর্শনে তারা বিশ্বাস করে সেই দর্শন অনুযায়ীই এসব ব্যাখ্যা হাস্যকর। হয়তো একদিন সেই সত্যকে তারা মাটি খুঁড়ে বের করবে যে সত্যকে আজ তারা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

'আমি বিজ্ঞান ভালোবাসি!', এবং অন্যান্য

২০১৮ সালে প্লুটো নামক বামনগ্রহের কিছু ছবি প্রকাশ করে নাসা।[৪] নভোযান 'নিউ হরাইযন্স'[৫] থেকে তোলা ছবিগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত মানুষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অনলাইনে।

'আমি বিজ্ঞানকে ভালোবাসি'!–বিস্ময়ভরে ঘোষণা করে অনেকে।

অন্যদের দেখা যায় বিজ্ঞান কত অসাধারণ, আর প্রশংসনীয় তা নিয়ে আবেগঘন মন্তব্য করতে।

বিজ্ঞানের তারিফ করা কিংবা বিজ্ঞানকে ভালোবাসায় কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্লুটো তো বিজ্ঞানের তৈরি না। প্লুটোর অস্তিত্ব এবং সৌন্দর্যের পেছনে বিজ্ঞানের কোনো হাত নেই। উচ্ছ্বসিত মানুষগুলো কি এ বিষয়টা বোঝে? যদি বোঝে, তাহলে কি তারা এটা নিয়ে চিন্তা করে?

অনেকে বলতে পারেন বিজ্ঞানকে ভালোবাসা একটা নির্দোষ ব্যাপার, এর সাথে শিরকের কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কথার সাথে আমি একমত। কিন্তু আমরা আজ এমন এক সময় ও সংস্কৃতিতে বসবাস করছি যখন অসংখ্য মানুষ ধর্মত্যাগ করছে, স্রষ্টার ক্ষমতা আর প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করছে, নাস্তিক হচ্ছে। এমন একটা অবস্থায় প্লুটোর ছবি দেখে যখন বিজ্ঞানকে ভালোবাসার কথা বলা হয়, তখন সেগুলো আর নিছক উচ্ছ্বসিত মন্তব্য হিসেবে আর দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও, এ কথাগুলোর গভীর তাৎপর্য আছে।

প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য দেখার পর মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ময় কাজ করে। সুন্দরের এই সমারোহ দেখে মানুষ অভিভূত হয়। এই প্রতিক্রিয়া

---

[৪] ১৯৩০-এ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আমাদের সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসেবে পরিচিত ছিল প্লুটো। ~ অনুবাদক

[৫] নিউ হরাইযন্স (New Horizons) একটি আন্তঃগ্রহ মহাকাশ প্রোব, যা জানুয়ারি ১৯, ২০০৬ সালে নাসার নিউ ফ্রন্টিয়ার্স কর্মসূচির অংশ হিসেবে উৎক্ষেপণ করা হয়। ~ অনুবাদক

সর্বজনীন। এই সৃষ্টি আর এই সৌন্দর্য যে শূন্য থেকে আসেনি, নিজে নিজে তৈরি হয়নি—এসবের পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন—এই উপলব্ধি এবং সেই স্রষ্টার প্রশংসা করার ইচ্ছাও সর্বজনীন।

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, এই সহজাত অনুভূতি আর আবেগ তাদের অন্য কোনো দিকে চালিত করতে হয়। তাই মানুষ ভক্তিভরে 'প্রকৃতি' কিংবা বিজ্ঞানের বন্দনা করে। 'প্রকৃতি' বা 'মাদার নেইচার' নামে কোনো সচেতন সত্তা কিংবা দেবতা আছে, এটা আজ তেমন কেউ বিশ্বাস করে না। একইভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং এর সংরক্ষণের কৃতিত্ব যে বিজ্ঞানের না, এটাও সবাই বোঝে। বিজ্ঞান কোনো স্বাধীন ইচ্ছা আর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সত্তা না। বিজ্ঞান মানুষের তৈরি এক শাস্ত্র, জ্ঞানের একটি শাখা। তাহলে প্লুটোর ছবি দেখে বিজ্ঞান নিয়ে এই উচ্ছ্বাস, ভক্তি, বন্দনা, আনন্দ আর ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি হবার কারণ কী?

কথাটা অন্যভাবে বলা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষমতা হলো সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ আর বিশ্বজগতের কাঠামোর খুঁটিনাটি তথ্য অনুসন্ধান করার। এ ক্ষমতা যদি এতটা প্রশংসা আর ভালোবাসার জন্ম দেয়, তাহলে যে মহান সত্তা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত?

ধরুন, একজন মানুষ প্রকৃতি, সৌন্দর্য, এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাঠখোট্টা লোক। সমুদ্র তীরের চোখধাঁধানো সূর্যাস্তের দৃশ্য আর দুপুর বেলার ঘুম তার কাছে একই মাপের জিনিস। প্লুটোর ছবি দেখে সে হাই তোলে, নিরস মুখে বলে—'এত আহা উহু করার কী আছে? তেমন কোনো বিশেষত্ব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বিজ্ঞানকে ভালোবাসার ঘোষণা দেয়া মানুষদের চেয়ে এই ধরনের মানুষের প্রতিক্রিয়া বেশি সংগতিপূর্ণ। প্রকৃতি, সৌন্দর্য, এসবের বিশেষ কোনো গুরুত্ব যেহেতু তার কাছে নেই, তাই সে এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। তেমন কোনো অনুভূতি তার মধ্যে দেখা যায় না। । আবার যে লোক প্লুটোর ছবি দেখে অভিভূত হয়ে প্লুটোরই প্রশংসা শুরু করে, প্লুটোকে ভালোবাসতে শুরু করে, তার প্রতিক্রিয়াও বিজ্ঞানকে ভালোবাসার ঘোষণা দেয়া লোকদের চেয়ে বেশি যৌক্তিক। যুগে যুগে এভাবেই তো মানুষ প্রকৃতির পূজা করেছে। সৌরজগতের গ্রহগুলোর নাম দেয়া হয়েছে রোমান দেবতাদের নামে। ব্যাপারটা তো কাকতালীয় না। কিন্তু আধুনিক বস্তুবাদ অনুযায়ী মহাকাশে ছুটে বেড়ানো প্রাণহীন, চেতনাহীন একটা পাথরের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা কিংবা ভক্তি প্রদর্শনের কোনো মানে হয় না। সেই রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই মানুষ এখন বিজ্ঞানের প্রশংসা করে। বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশ করে। যদিও এর কোনো অর্থ হয় না।

স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, বিজ্ঞানের প্রশংসা করা–এ কেমন নির্বোধের মতো আচরণ?

বিজ্ঞান একটা লেন্স। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা মহাবিশ্বকে দেখি। এই লেন্সের আরাধনা কেন করা হবে? লোভনীয় খাবারের ছবি দেখলে আমরা কি ফটোগ্রাফারের প্রশংসা করি নাকি রাধুনীর? চমৎকার স্থাপত্যকর্মের ছবি চোখে পড়লে স্থপতির কথা ভুলে আমরা কি ফটোগ্রাফারের প্রশংসা করি? না, আমরা এমন করি না, কারণ এটা অযৌক্তিক। যদি আপনি বিশ্বাস করেন কোনো রাধুনী নেই, কোনো স্থপতি নেই–ওই খাবার, ওই স্থাপত্যকর্ম আপনাআপনি তৈরি হয়ে গেছে–সে ক্ষেত্রে কারও প্রশংসা করারই-বা কী দরকার? ফটোগ্রাফার আর ফটোগ্রাফির তো এখানে কোনো কৃতিত্ব নেই। তাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হবার কারণ কী? উচ্ছ্বাসের মূল কারণ কী? ক্যামেরায় তোলা ছবি নাকি ছবির বিষয়বস্তু?

সৃষ্টিজগতের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বিজ্ঞানের প্রশংসা করে মানুষ আসলে মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার তারিফ করছে। অথচ সৃষ্টিজগতের মহান নির্মাতার ব্যাপারে অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়েও সে চিন্তা করছে না। কী চরম নির্বুদ্ধিতা আর অজ্ঞানতা।

আত্মঘাতী নাস্তিকতা

স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে মনে করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে কি?

ইতিহাসজুড়ে অধিকাংশ মানুষ কোনো-না-কোনো ধরনের স্রষ্টা কিংবা অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এসেছে। এই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কী, তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতপার্থক্য আছে, তবে এমন কোনো সত্তার যে অস্তিত্ব আছে, এ নিয়ে মতপার্থক্য নেই। মতপার্থক্য খুঁটিনাটিতে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ের মানুষ স্বতন্ত্রভাবে এই অবস্থান গ্রহণ করেছে।

যুগে যুগে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানবজাতি কেন এই বিশ্বাস গ্রহণ করল, তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব বস্তুবাদী নাস্তিকদের।

যদি এই বিশ্বাসগুলো অবান্তর হয়, তাহলে এগুলো বড় ধরনের কোনো বিভ্রম বা ডিলিউশানের (ভ্রান্তবিশ্বাস) ফল। অর্থাৎ যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এমন এক শক্তিশালী বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, যার কোনো বাস্তবতা নেই। আর এ ধরনের বিশ্বাস যেহেতু বৈশ্বিক, তাই এই বিভ্রমও বৈশ্বিক। এই বিভ্রম এতটাই শক্তিশালী যে, যুগে যুগে তা মানুষকে ভক্তি আর উপাসনার দিকে চালিত করেছে। তার মানে এটা সাময়িক কোনো বিভ্রম না। এই 'গড ডিলিউশান' এতই গভীর এবং ব্যাপক, যে যারা এ বিভ্রমে আক্রান্ত তারা নিজেদের এই মানসিক রোগের ব্যাপারে কিছুই জানে না। আরেকটা সম্ভাবনা হলো বাস্তবতা নিয়ে–কী আছে আর কী নেই–তা নিয়ে বড় ধরনের ভুল করার প্রবণতা মানুষের আছে।

যদি দাবি করা হয়, স্রষ্টায় বিশ্বাস আসলে ডিলিউশান বা বিভ্রম, তাহলে সত্য চেনার ব্যাপারে মানুষের সক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। যে প্রজাতির অধিকাংশ সদস্যের এমন গভীর এবং স্থায়ী ডিলিউশানে ভোগার প্রবণতা আছে, তাদের বিচারবুদ্ধির ওপর তো ভরসা করা যায় না।

কিন্তু এটা মেনে নেয়া হলে নাস্তিকদের বুদ্ধিমত্তা এবং তাদের উপসংহারগুলো নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ, মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর উত্তর জানার জন্যে, মহাবিশ্বে মানুষের অস্তিত্বের তাৎপর্য বোঝার জন্যে বস্তুবাদী নাস্তিকরা ওই মানবীয় বুদ্ধিমত্তার

ওপরই নির্ভর করে।

অর্থাৎ স্রষ্টায় বিশ্বাস এতটাই বৈশ্বিক, এতই সহজাত, মানব-মন এবং মানবীয় চিন্তার সাথে এত মৌলিকভাবে জড়িত যে, একে নাকচ করতে গেলে মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সত্য নির্ধারণ এবং বাস্তবতা অনুধাবনে মানব-মনের সক্ষমতাকে নাকচ করতে হয়। বস্তুবাদী নাস্তিকতা ঠিক এ অবস্থানটাই গ্রহণ করেছে এবং নিজের অজান্তেই নিজেদের পুরো প্রকল্পকে ভুল প্রমাণ করে বসেছে।

নাস্তিকতার অনভিপ্রেত উপসংহার

জড়বাদী, বস্তুবাদী, এবং নাস্তিকরা বাস্তবতা আর অস্তিত্বের ব্যাপারে খুব সংকীর্ণ এবং সীমিত একটা ধারণা গ্রহণ করে। যা কিছু এই ধারণার সাথে খাপ খায় না, সেটার অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করে। এমন অস্বীকারের ইতিহাস লম্বা। এ লিস্টে একদম প্রথমে আছে স্রষ্টা।

কিন্তু যে বিষয়টা সাধারণ মানুষ বোঝে না এবং বস্তুবাদী, জড়বাদী দর্শন সাধারণের সামনে স্বীকার করে না তা হলো–এই দর্শন শুধু স্রষ্টাকে অস্বীকার করায় সীমাবদ্ধ থাকে না, তাদের অস্বীকারের ব্যাপ্তি আরও অনেক বড়। তবে সাধারণ মানুষ এসব জানুক, সেটা নাস্তিকরা চায় না। তাহলে যে তাদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে।

স্যাম হ্যারিস আর রিচার্ড ডকিন্সের মতো নাস্তিকরা কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক এম্পিরিসম (scientific empiricism)[৬] অনুসরণের কথা বলে। এই অবস্থান অনুযায়ী, কেবল ওইসব জিনিসের অস্তিত্ব আছে যেগুলো বিজ্ঞান দ্বারা পর্যবেক্ষণ অথবা সনাক্ত করা যায়। যা কিছু বিজ্ঞান সনাক্ত করতে পারে না, যা কিছু পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করতে গেলে 'মন'-এর অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হয়। বিশেষ করে অন্যের মন। মনের অস্তিত্ব বিজ্ঞান সনাক্ত করতে পারেনি। ল্যাবরেটরিতে কেউ কোনোদিন কারও 'মন' দেখেনি। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে ইলেক্ট্রিক সিগন্যালের অস্তিত্ব সনাক্ত করা গেছে। কিন্তু সেটা তো মন না।

ভেবে দেখুন তো, আপনি কি কখনো কারও মন দেখেছেন? কারও আবেগ নিজে অনুভব করেছেন?

না। আমরা দেখি মানুষের বাহ্যিক আচরণ। চেহারা, অভিব্যক্তি আর মুখের কথা। অন্য

[৬] Empiricism–বাংলায় অভিজ্ঞতাবাদ। একটি জ্ঞানতত্ত্ব বা Epistemology, যা দাবি করে জ্ঞানের একমাত্র অথবা প্রধান উৎস হল ইন্দ্রিয়জাত (অথবা পরীক্ষালব্ধ) অভিজ্ঞতা। ~ অনুবাদক

মানুষের চিন্তা; তার মন, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন আমরা কি অন্য মানুষের চৈতন্যকে (consciousness) অস্বীকার করব? অন্য মানুষদেরও যে আমার মতো মন আছে, চৈতন্য আছে—এটা কি আমরা প্রত্যাখ্যান করব?

স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ক্ষেত্রে নাস্তিকদের বহুল-ব্যবহৃত সায়েন্টিফিক এম্পিরিসিসমের মাপকাঠি প্রয়োগ করলে এ উপসংহার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু আমরা সবাই জানি, এ উপসংহার হাস্যকর। এ কারণেই এ উপসংহারের মতোই সায়েন্টিফিক এম্পিরিসিসমের মাপকাঠি এবং শিশুতোষ নাস্তিকতাকে আমরা অস্বীকার করি।

স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়?

স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? ইসলামের সত্যতার প্রমাণ কী?

প্রমাণ আছে। অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু কোনটাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, সেটা বেশ কিছু ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। প্রমাণের আলাপে যাবার আগে এই ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার। কোন জিনিসকে প্রমাণ ধরা হবে, কোনটাকে ধরা হবে না—কোনটাকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হবে, কোনটাকে করা হবে না—সেই মাপকাঠি নিয়ে আলাপ করা জরুরি। বৈজ্ঞানিক কিংবা গাণিতিক দাবির ক্ষেত্রে এটা যেমন সত্য, ধর্মীয় দাবির ক্ষেত্রেও সত্য।

ধরুন, আপনি একজন বিজ্ঞানী। আপনার জন্ম কট্টর বিজ্ঞানবিদ্বেষী এক পৃথিবীতে। এখানে ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞানকে অবিশ্বাস করতে আর বিজ্ঞানীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শেখানো হয়। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে বিজ্ঞান হলো একটা উগ্র, সহিংস ডেথ-কাল্ট। যারা তুলনামূলক ভালো তারা মনে করে বিজ্ঞান একধরনের ভণ্ডামি।

স্বাভাবিকভাবেই এ রকম পৃথিবীতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। বিজ্ঞান নিয়ে বলার মতো তেমন কিছু স্কুল-কলেজ থেকে মানুষ শিখতে পারবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যাপারে তীব্র ধরনের অজ্ঞতা কাজ করবে। এখানেই শেষ না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও গভীরভাবে বিজ্ঞানবিরোধী। প্রফেসর, বুদ্ধিজীবী আর বোদ্ধাদের বেশির ভাগ বিজ্ঞানকে চাপা ঘৃণা আর অবজ্ঞা নিয়ে দেখে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার একমাত্র উপায় হলো দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট কিছু প্রতিষ্ঠানে যাওয়া। টাকা আর লোকবল সংকটে ভোগা এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হবার অর্থ নিজের ক্যারিয়ার, সামাজিক মর্যাদা আর লাইফস্টাইল বিসর্জন দেয়া। তাই খুব অল্প মানুষই এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে সত্যিকারের বিজ্ঞানী হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

কোনো এক বিচিত্র কারণে, এ পৃথিবীর লোকেরা মনে করে বনজঙ্গল পুড়িয়ে দেয়া পরিবেশের জন্য ভালো। বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি জানেন এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। আপনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বনজঙ্গল পুড়িয়ে দিলে পরিবেশগত

বিপর্যয় তৈরি হবে।

কিন্তু মানুষ আপনার কথা শুনল না। কথাগুলো স্রেফ উড়িয়ে দিয়ে উল্টো আপনাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা শুরু করল। আরে এটা ওই হাবাগোবা বিজ্ঞানীটা না? ও আর কী জানে!

কেউ কেউ একটু ভদ্রতা করে বলল, দেখো, যা ইচ্ছে বিশ্বাস করার অধিকার তোমার আছে। তুমি তোমার মতো বিশ্বাস করো। কিন্তু তোমার বিশ্বাসই সঠিক, এমন জেদ ধরলে হবে না। অন্যের ওপর তুমি নিজের বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে পারো না।

আরেক দল বিজ্ঞান নিয়ে সংশয়বাদী। আলোচনার নামে ওরা আপনাকে নিয়ে একটু তামাশা করতে চাইল। প্রথমে প্রমাণ চাইল।

আচ্ছা, তুমি যে বলছ বনজঙ্গল পুড়িয়ে দিলে পরিবেশের ক্ষতি হবে—এটার প্রমাণ কী?

আপনি তাদের গ্রীনহাউস গ্যাসের কথা বলতে পারেন। কিন্তু কেমিস্ট্রি, ফিযিক্স, বায়োলজি—কোনো কিছু নিয়েই এরা কিছু জানে না। কার্বনডাইঅক্সাইড কীভাবে তাপ আটকে রাখে, আপনি সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু রাসায়নিক মৌলগুলো নিয়ে প্রাথমিক ধারণাও তো এদের নেই। কার্বন ডাইঅক্সাইড কী, সেটা বোঝার তো প্রশ্নই আসে না। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ কার্বনডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে আর অক্সিজেন আমাদের প্রয়োজন—এটা ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু তখন তারা ওই কথার প্রমাণ চাইবে। সেই প্রমাণ বোঝানোর জন্য তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কেমিস্ট্রি শেখাতে হবে। কিন্তু এতেও কাজ হবে না, কারণ কেমিস্ট্রি বুঝতে হলে আবার মলিকিউলার ফিযিক্স বুঝতে হবে। তার আগে ওদের বোঝাতে হবে যে মলিকিউলার ফিযিক্স জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ মলিকিউলার ফিযিক্সের উপসংহারগুলো গ্রহণযোগ্য, এগুলো কোনো কিচ্ছাকাহিনি না। কিন্তু মলিকিউলার ফিযিক্স বুঝতে গেলে আবার নিউক্লিয়ার ফিযিক্স এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে চলনসই মাপের জ্ঞান থাকতে হবে...।

স্বাভাবিকভাবেই এই সংশয়বাদীরা আপনার কথার তেমন কিছু বুঝতে পারবে না। আপনার দেয়া প্রমাণ মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাদের সন্দেহ তো কমবেই না, উল্টো আরও বাড়তে পারে।

এমন অবস্থায় আপনি বলতে পারেন: দেখো, বনজঙ্গল পোড়ানো কেন খারাপ, সেটা বুঝতে হলে তোমাদের ভালোভাবে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। তারপর আরও অ্যাডভান্সড পড়াশোনায় যেতে হবে। তারপর তোমরা প্রমাণ পাবে।

কিন্তু এ কথা শুনে নিশ্চিতভাবেই সংশয়বাদীরা হাসতে শুরু করবে। মনে করবে প্রমাণ নেই, তাই অজুহাত দিচ্ছেন।

এত কথা বলার মূল পয়েন্ট হলো, বিশ্বাসের বৈধতার প্রশ্নে প্রমাণ হিসেবে কোন জিনিসটা গৃহীত হবে, সেটা নির্ভর করে ওই প্রমাণের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের বিশাল এক ভান্ডারের ওপর। আজ সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্রেফ ধরে নেয় যে এই প্রাসঙ্গিক জ্ঞান আছে এবং তা সঠিক। মানুষ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করে। তারা মনে করে বিজ্ঞানের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যা বলে তা সঠিক। তাই প্রতিটা বিষয়ের ব্যাখ্যা তারা চায় না, খুব বেশি প্রশ্ন করে না।

কিন্তু যখন স্রষ্টাকে নিয়ে প্রশ্ন আসে, তখন সংশয় অন্য একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কারণ, আমরা একটা সেক্যুলার পৃথিবীতে বসবাস করি। আর এই সেক্যুলার পৃথিবীতে ধর্মের কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব নেই।

স্রষ্টার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ আছে যেগুলো গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ, সংগতিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক। তবু দুটো জিনিস মানুষকে এই সত্য উপলব্ধি করা থেকে বিরত রাখে।

প্রথমত, প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক জ্ঞান মানুষের হাতের নাগালে নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গাতে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ নেই, থাকলেও সীমিত। এটা মুসলিম-বিশ্বের ক্ষেত্রেও সত্য। মুসলিম-বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ পড়াশোনা করে সেক্যুলার সিস্টেমে। আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছানোর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাকে এই সেক্যুলার শিক্ষা প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয়ত, আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বসবাস করি, যেখানে সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং অ্যাকাডেমিয়া তীব্রভাবে ধর্মবিরোধী এবং ইসলামবিরোধী।

এ দুটো ফ্যাক্টরের কারণে মুসলিমদের ঈমান এবং আত্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামের সত্যতা এবং মহান আল্লাহর ব্যাপারে প্রমাণগুলো এমন বিভিন্ন দিক থেকে আসে, যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে। বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যেকোনো ধারা এভাবেই কাজ করে। যেমনটা ওপরে উদাহরণের দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একজন সংশয়বাদী যেকোনো তথ্য বা প্রমাণকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতে পারে, কারণ সে ওই তথ্যের সাথে যুক্ত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, প্যারাডাইম বা জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাপারে অজ্ঞ।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

সেক্যুলারিসম নিরপেক্ষতা না; বরং ভিন্নমতের দমন

বলা হয় সেক্যুলারিসম নিরপেক্ষ। সেক্যুলার রাষ্ট্র নাকি সবার জন্য এক নিরপেক্ষ স্থান তৈরি করে। এ দাবি ভুল। সেক্যুলারিসমের কোনো সংস্করণই নিরপেক্ষ না। এ বিষয়ে অন্য কোনো আলোচনাতে যাবার আগে এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া জরুরি।

সেক্যুলারিসমের ইতিহাস নিয়ে ২০১৫-তে লেখা এক প্রবন্ধে অ্যাংলিকান পাদরি জাইলস ফ্রেইযার লেখেন–

> অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধ তুঙ্গে পৌঁছে। মুক্তচিন্তার নামে শুরু হওয়া বিপ্লব ১৭৯৪ এর ইস্টার আসতে আসতে ফ্রান্সের ৪০,০০০ এর বেশি গির্জার বেশির ভাগ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়। শুরু হলো গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ক্রুশ আর পানপাত্র ভেঙে। শেষ হয় জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ আর গিলোটিনে পাদরি ও নানদের ঢালাও হত্যার মাধ্যমে। ইতিহাসে এ সময়টা পরিচিতি পায় 'ত্রাসের রাজত্ব' (Reign of Terror) নামে। 'টেরোরিসম' (সন্ত্রাসবাদ) বলে যে শব্দটা আজ আমরা ব্যবহার করি, সেক্যুলার ফরাসী বিপ্লবের সময়টাতেই ফ্রেঞ্চ 'terrorisme' শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। ফরাসী বিপ্লবের রথীমহারথীদের অন্যতম ম্যাক্সেমিলিয়ান রবসপিয়ের এ সময় ঘোষণা করে,
>
> *সন্ত্রাস হলো তাৎক্ষণিক, তীব্র এবং অনমনীয় বিচার। সন্ত্রাস হলো শুদ্ধির বিচ্ছুরণ*
>
> আজ যাদের জঙ্গী কিংবা সন্ত্রাসী বলা হয় তাদের কাছ থেকেও এ ধরনের কথা শোনা যায় না। যেসব খ্রিষ্টান তাদের শতাব্দীপুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে রেখেছিল, তাদের ম্যাসাকার করা হয় 'ভেন্ডি'তে (Vendée)। ঐতিহাসিক মার্ক লেভিনের মতে এ ছিল, 'আধুনিক গণহত্যার পূর্বসূরি'।

ফ্রান্সের এ নিয়মতান্ত্রিক বি-খ্রিষ্টকরণ কোনো অর্থেই এক 'কট্টর ধর্মের স্বাভাবিক পতন' ছিল না। এটা এনলাইটেনমেন্ট র‍্যাশনালিটির স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক উত্থানও ছিল না; বরং এ ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুনে দমনপীড়নের ফলাফল।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মধ্যযুগের ধর্মরাষ্ট্র বা থিওক্রেসির সমালোচনা করে মুখে ফেনা তোলে। এমন রাষ্ট্রকে ওরা খারাপ বলে, কারণ এখানে নৈতিকতার নির্দিষ্ট কোনো ধ্যানধারণা জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো। অথচ সেক্যুলার রাষ্ট্র ঠিক একই কাজটা করে।

২০১৭ সালে বেলজিয়ামের ওয়ালুন প্রদেশে রীতিমতো ভোট দিয়ে হালাল এবং কোশার[৭] মাংস নিষিদ্ধ করা হয়। এখন থেকে আর জবাই করা পশুর মাংস বিক্রি করা যাবে না। বিক্রি করতে হলে পশুকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করতে হবে। এখন পর্যন্ত ইউরোপের সাতটি দেশে একইভাবে হালাল এবং কোশার পদ্ধতিতে পশু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে—নরওয়ে, ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া, আইসল্যান্ড, এবং বেলজিয়াম।[৮]

এর যৌক্তিকতা কী? সেক্যুলার রাষ্ট্র এই অবস্থানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে?

তারা বলে, পশুকে ইলেকট্রিক শক না দিয়ে হত্যা করা অমানবিক। ইলেকট্রিক শকের বদলে অন্য কোনোভাবে হত্যা করলে পশু কষ্ট পেয়ে মারা যায়। তাই ইলেকট্রিক শকের বদলে জবাই করা নিষিদ্ধ।

এই হলো সেক্যুলার ইউরোপের যুক্তি।

এই দাবির ভিত্তি কী? কোনো প্রাণী কি এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে? কোনো গরু বা ছাগল কি কোর্টে এসে বলেছে–প্লিজ, আমাদের ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে মারুন, অন্যভাবে মারলে ব্যথা বেশি লাগে!

পুরো ব্যাপারটাই ধারণাপ্রসূত। বোল্ট ব্ল্যাস্ট[৯] দিয়ে খুলি ফুটো করা কিংবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করা হলে ব্যথা কম লাগে–এই তথ্য তারা কোথা থেকে পেল? কিসের ভিত্তিতে এ উপসংহার টানা হলো তা আদৌ স্পষ্ট না; বরং সাধারণ বিবেকবুদ্ধি বলে বোল্টব্ল্যাস্ট কিংবা ইলেকট্রিক শকে মৃত্যুর চেয়ে জবাই করে মৃত্যু কম কষ্টকর হবার কথা। যদিও বিষয়টা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় আমাদের নেই।

---

[৭] কোশার (Kosher)-ইহুদীদের জন্য যা খাওয়া অনুমোদিত, তাকে বলা হয় কোশার ও যা খাওয়া নিষিদ্ধ, তাকে বলা হয় ত্রেফা। গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পশুর মাংস মুসলিমদের ক্ষেত্রে 'হালাল' এবং ইহুদীদের ক্ষেত্রে 'কোশার' হবার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে জবাই অপরিহার্য। ~ অনুবাদক

[৮] All the European Countries Where Kosher and Halal Meat Production Are Now Forbidden, January 7, 2019. Forward.com

[৯] বোল্টব্ল্যাস্ট (বোল্ট পিস্তল, বোল্ট গান)–জবাইয়ের আগে পশুকে অচেতন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। বোল্ট ব্ল্যাস্টে স্টেইনলেস স্টিল বা লোহার তৈরি ভারী রড (বোল্ট) থাকে। ট্রিগার চাপলে এই রড সজোরে প্রাণীর মাথায় আঘাত করে। এতে প্রাণী অচেতন হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বোল্টের আঘাতে প্রাণীর খুলি এবং মস্তিষ্কের কিছু অংশ ফুটো হয়ে যায়। ~ অনুবাদক

তবু এই ঠুনকো যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই দেশগুলো জবাই নিষিদ্ধ করেছে। তাদের কাছে যেটা নৈতিক আর মানবিক মনে হয়েছে, সেটাকে তারা আইন বানিয়ে নিয়েছে। তারপর রাষ্ট্রের শক্তিবলে অন্যদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছে। আইন আসলে এভাবেই তৈরি হয়। সেক্যুলার কিংবা ধর্মভিত্তিক—দুই ধরনের রাষ্ট্রেই এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আইন পাশ করলে পশ্চিমা বিশ্ব সেটার সমালোচনায় উঠেপড়ে লেগে যায়। তখন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। চিৎকার করে বলে—ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হলো বর্বর, এটা মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু লিবারেল বস্তুবাদী বিশ্বাস অনুযায়ী আইন তৈরি করা ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ!

কী নির্লজ্জ প্রতারণা!

বেলজিয়ামসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর এ ধরনের আইনগুলোকে বর্ণবাদী, ইসলামবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, ইত্যাদি বলা আসলে কার্যকরী না। যদিও এসব আইনের পেছনে তাদের ইসলামবিদ্বেষের ভূমিকা আছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু এগুলোকে বর্ণবাদী বা ইসলামবিদ্বেষী বলা কার্যকরী না, কারণ সেক্যুলার আইনপ্রণেতারা তখন বলবে 'আমরা তো যথাসম্ভব ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে আইন বানাচ্ছি, বৈষম্যে কিংবা বিদ্বেষের কারণে না।'

এ ধরনের আইনের বিরুদ্ধে কার্যকরী আরগুমেন্ট হবে অনেকটা এ রকম:

বেলজিয়ানরা আইন বানিয়েছে ভালোমন্দের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী। এ দিক থেকে তাদের দোষ দেয়া যায় না। তবে নৈতিকতার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসগুলোর সমালোচনা করা যায়। আমরা তাদের বলি—এ ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান ভুল, আমাদের অবস্থান সঠিক। কারণ, আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হলো গরু, ছাগল, মানুষসহ সব পশুপাখির সৃষ্টিকর্তা, মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওয়াহি। আর তোমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হলো কিছু ফাঁপা বুলি।

এই ধরনের যুক্তির মাধ্যমে যথাযথভাবে তাদের অবস্থানের মোকাবিলা করা যায় এবং কার্যকরী ডায়ালেকটিক তৈরি করা যায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ ধরনের আলোচনা তেমন একটা দেখা যায় না।

শূন্যগর্ভ সেক্যুলারিসম

সেক্যুলারিসম সব সময় মাধ্যমের কথা বলে, কিন্তু গন্তব্যের কথা বলে না। সেক্যুলারিসম মানুষকে গন্তব্যের কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, গন্তব্যের আলোচনা করতে হলে ধর্মকে লাগবে। সেক্যুলারিসম আপনাকে কোনো কাজের গুরুত্বের কথা বলবে, কিন্তু কাজের ফলাফলের ব্যাপারে বলবে না। অস্পষ্ট কিছু দাবি ছাড়া আর কিছু তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ফলাফলের আলোচনা করতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

সেক্যুলারিসম আপনাকে ভোট দিতে বলবে। কিন্তু কোনো নৈতিকতা আর মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভোট দিতে হবে, সেটা বলবে না। কারণ, সেটা ধর্মের জায়গা। সেক্যুলারিসম বলবে সবাইকে সমানভাবে সম্মান করতে। কিন্তু সম্মানযোগ্য হবার অর্থ কী, সেটা বলবে না। কারণ, সম্মান ও মর্যাদার কেন্দ্রকে বুঝতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

অনেকে ভাবতে পারেন এর অর্থ হলো মানুষ যত সেক্যুলার হবে তত নিরপেক্ষ হবে। এটা ভুল ধারণা। মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখনো খালি থাকে না। লিবারেল সেক্যুলারিসম যে শূন্যতা তৈরি করে কিছু না কিছু দিয়ে সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে আজ এই শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে বহুজাগতিক কর্পোরেশান আর অশ্লীলতা ও বিকৃতির প্রচারে সদাপ্রস্তুত মুনাফালোভী মিডিয়ার বানানো চটুল সাংস্কৃতিক আবর্জনা দিয়ে। একসময় এটাই হয়ে দাড়াচ্ছে জনগণের ধর্ম। মানুষের পরিচয় আর চরিত্রের কাঠামো। এটাই সেক্যুলারিসমের অবধারিত ফল এবং উদ্দেশ্য। এভাবে সেক্যুলারিসম মানুষকে পরিণত করে ক্ষমতার অনুগত গোলামে। এই বিষের প্রতিষেধক কী?

ইন্নামাল আমালু বিননিয়্যাতি

প্রতিষেধক হলো প্রতিনিয়ত নিজের কাজগুলোকে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা। নিজের গন্তব্য এবং পরিণতির প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা। আর এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল তিনিই দিতে পারেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজের হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ভোগবাদী লিবারেল-সেক্যুলার সংস্কৃতির আবর্জনাগুলো দূর করুন। আর নিজেকে যুক্ত করুন চিরন্তন সত্য পথের সাথে।

জার্মানি ও হিজাব

হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে জার্মানির পরিস্থিতি সেক্যুলারিসমের অন্তর্নিহিত সাংঘর্ষিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ২০১৬ এর এক রিপোর্টে এসেছে :

জার্মানীর প্রভাবশালী দুটি সংস্থা জার্মান বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে হেডস্কার্ফ/ হিজাবের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের মতে আদালতের 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জরুরি।

অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্মান অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ জাজেস এর চেয়ারম্যান রবার্ট সিগমুলারের মতে–বিচারের ফলাফল কেবল আইনের ওপর নির্ভরশীল, কোনো ব্যক্তির ওপর না–তা দেখানোর জন্য বিচারক ও আইনজীবীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরা উচিত। সেই নির্ধারিত ইউনিফর্ম হলো কালো আলখেল্লা, সাদা শার্ট, সাদা বো-টাই এবং গলবন্ধ কিংবা নেকারচিফ।[১০]"

এই কালো আলখেল্লার উৎস কী জানেন?

নিউইয়র্ক টাইমসের গবেষকদের মতে,

> 'বিচারিক পোশাকের (judicial robe) আদি উৎস যদিও সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন এটি এসেছে গির্জার পাদরিদের কালো আলখেল্লা থেকে। অতীতে গির্জা আর বিচারবিভাগ আজকের মতো আলাদা ছিল না। ব্রিটেনের বিচার বিভাগে কালো আলখেল্লার ব্যবহার শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে'।[১১]

এমন কি হতে পারে যে ইউরোপের ধর্মগুরুরা আলখেল্লা পরার এই রীতি গ্রহণ করেছিল মুসলিমদের জুব্বার অনুকরণে? আরব ও মুসলিম সমাজে জুব্বাকে দেখা হতো সম্মান, ধর্মীয় মর্যাদা এবং পাণ্ডিত্যের চিহ্নবাহী পোশাক হিসেবে। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যাই হোক, যে কালো আলখেল্লা নিয়ে জার্মান

---

[১০] German judges call for headscarf ban in court to show 'neutrality', August 09, 2016. Independent, UK.

[১১] Behind the Gavel, a Sense of Style, September 5, 2008, The New York Times.

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 'নিরপেক্ষতা' প্রমাণ করতে চাচ্ছে, তার উৎস ধর্মীয়—এটুকু পরিষ্কার।

পোশাক হিসেবে লম্বা আলখেল্লা মুসলিমদের কাছে আজও ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। মুসলিম নারী ও পুরুষ–উভয়ই এটা পরে। মুসলিম-বিশ্বের অনেক নারী কালো আলখেল্লা পরেন, যেটাকে জিলবাব বলা হয়। ইহুদী এবং খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরাও কালো আলখেল্লা পরে থাকে। কালো আলখেল্লার একটা ধর্মীয় গুরুত্ব সব সময়ই ছিল।

যেসব সেক্যুলারিস্ট হিজাব নিষিদ্ধ করার কথা বলে, অন্যান্য আরও ধর্মীয় চিহ্ন জনজীবন থেকে মুছে ফেলার কথা বলে, তাদের একটা প্রিয় যুক্তি হলো নিরপেক্ষতা। তারা বলে, জনপরিসরের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে ধর্মীয় পোশাক আর ধর্মীয় চিহ্ন বাদ দিতে হবে। এ যুক্তির বিরুদ্ধে সহজ-সরল এবং যৌক্তিক আপত্তি হলো :

কোন পোশাক নিরপেক্ষ, সেটা কে ঠিক করবে?

আসলে এটা সেক্যুলারিসমের মৌলিক প্রতারণাগুলোর একটা। যা কিছু ধর্মীয় তাঁর সবটুকুই যদি সমাজ, রাষ্ট্র থেকে বাদ দেয়া হয়ে তাহলে বাকি কী থাকে? সেক্যুলারিসমের বক্তব্য হলো, যা কিছু ধর্মীয় তা বাদ দেয়ার পর সমাজ ও রাষ্ট্র সত্যিকারভাবে নিরপেক্ষ হবে। আর এ অবস্থা থেকেই সেক্যুলারিসমের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন কোনো নিরপেক্ষ কেন্দ্র নেই, যা মেটাফিযিকালিটি[১২] কিংবা নরম্যাটিভিটি[১৩] থেকে মুক্ত। ধর্মের যে মেটাফিযিকালিটি এবং নরম্যাটিভিটি নিয়ে সেক্যুলারিসমের এত আপত্তি তা থেকে মুক্ত কোনো অবস্থান নেই।[১৪]

একমাত্র সমাধান হলো নিজে থেকে একটা নিরপেক্ষ, সেক্যুলার কেন্দ্র বানিয়ে নেয়া। সেটা কীভাবে হবে? আপনি স্রেফ বলে দেবেন কোনো একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, চেতনা,

[১২] মেটাফিযিক্স–বাংলায় অধিবিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জানা, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, সময়, স্থান, সম্ভাবনা এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে কাজ করে। ~ অনুবাদক

[১৩] নরম্যাটিভ- মানবসমাজগুলোতে কিছু কাজ ও ফলাফল ভালো, আকাঙ্ক্ষিত কিংবা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়। আবার কিছু কাজ ও ফলাফলকে মন্দ, অনাকাঙ্ক্ষিত কিংবা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়। একে নরম্যাটিভিটি বলা হয়। নরম্যাটিভিটি দ্বারা কোনো-না-কোনো ধরনের উচিত-অনুচিতের ধারণা প্রকাশ পায়। নরম্যাটিভিটির মূল আলোচনা নৈতিকতা নিয়ে। প্রায় প্রত্যেক নৈতিকতার কাঠামো কোনো-না-কোনো ধরনের নরম্যাটিভিটির ওপর নির্ভরশীল।

[১৪] ওপরে কথা দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য হলো সেক্যুলারিসম যেটাকে নিরপেক্ষ কেন্দ্র বলছে, সেই কেন্দ্রও দাঁড়িয়ে আছে কোনো একটি নির্দিষ্ট মেটাফিযিকাল এবং নরম্যাটিভ অবস্থানের ওপর। কাজেই সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ কোনো কেন্দ্র সেক্যুলারিসম দিতে পারে না। এমন কোনো ক্যানভাস নেই, যা রংহীন। ~ অনুবাদক

নৈতিকতা আর নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক সেক্যুলার। আর বাকি সবকিছু ধর্মপ্রভাবিত, সাম্প্রদায়িক।

কোনো কিছুকে সেক্যুলার সাব্যস্ত করার এই প্রক্রিয়া বৈধতা পায় মানুষের সামষ্টিক সাংস্কৃতিক প্রথাপ্রচলনের কারণে। মুসলিমদের আচার আচরণ এবং পোশাক যেহেতু ইউরোপের কাছে 'বিজাতীয়' তাই খুব সহজেই ইউরোপীয়ানদের চোখে এগুলো 'ধর্মীয়' হিসেবে ধরা পড়ে। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মীয় উৎস থেকে আসা পশ্চিমা নানান পোশাক, প্রথা এবং নৈতিকতা যেহেতু ইউরোপের 'পরিচিত' তাই সেগুলোকে সংস্কৃতি বলা যায়, সেক্যুলার আর নিরপেক্ষ ধরা যায়। এ হলো নিছক কথার খেলা।

একদিকে কালো আলখেল্লাকে সেক্যুলার সাব্যস্ত করা আর অন্যদিকে হেডস্কার্ফকে ধর্মীয় আখ্যা দেয়ার পুরো ব্যাপারটাই সেক্যুলারিসমের কথিত নিরপেক্ষতার অন্তঃসারহীনতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবেই সেক্যুলারিসম এক বানোয়াট 'নিরপেক্ষতা' তৈরি করে কৃত্রিমভাবে নিজের 'পক্ষপাতশূন্যতা' বজায় রাখার জন্য।

এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়েও কিছু কথা বলা দরকার। সেক্যুলারদের আক্রমণের মোকাবিলায় ধর্মীয় স্বাধীনতার যুক্তি ব্যবহার করা উচিত না; বরং আমাদের উচিত সেক্যুলারিসমের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য আর সাংঘর্ষিকতাগুলো তুলে ধরা। মুসলিমদের হিজাব নিয়ে তাদের আপত্তি যে কালচারাল বায়াস ছাড়া আর কিছু না এটা তাদের স্বীকার করতে বাধ্য করা। তারা এটা মেনে নিলে ভালো। কিন্তু নিজেদের বায়াসকে তারা নিরপেক্ষতা, যৌক্তিকতা আর ন্যায়পরায়ণতা বলে চালাবে—এটা হবে না।

যদি তারা স্বীকার করে নেয় কালচারাল বায়াসের কারণে তারা হিজাবের বিরোধিতা করে, তাহলে আমরা সেটা মেনে নিতে রাজি আছি। কারণ, আমরা মুসলিমরাও আমাদের নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী পোশাকের নিয়ম ঠিক করতে চাই। তবে আমাদের মাপকাঠি পপ কালচার বা সাংস্কৃতিক খেয়ালখুশি দ্বারা প্রভাবিত না; বরং আমাদের মাপকাঠির ভিত্তি ইসলামী মূল্যবোধ এবং শালীনতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা।

ধর্মীয় স্বাধীনতার সেক্যুলার যুক্তির বদলে আমাদের উচিত আলোচনা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাপকাঠির তর্কে নিয়ে আসা।

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ধাপ্পাবাজি

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ধারণাটা কি আসলে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সভ্য আর অসভ্য সমাজের মধ্যে পার্থক্য ধরা হয় আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে আমরা কী দেখি? যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তখন ট্রাম্প থেকে শুরু করে উগ্র বামপন্থী, সবাই আইনের শাসনের কথা বলে। কিন্তু কোনো কিছু যখন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তখন তারা আইন বদলানোর কথা বলা শুরু করে।

এ ক্ষেত্রে তারা একটা পূর্ব-ধারণার ওপর ভিত্তি করে কথা বলে। সেই ধারণাটা হলো, কোনো কিছু বৈধ হওয়া আর নৈতিকভাবে ভালো হওয়া এক না। অনেক কিছু বৈধ হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে সেটা ভালো। আবার অনেক কিছু আইন অনুযায়ী অবৈধ হতে পারে। তার মানে এই না যে সেটা খারাপ।

অর্থাৎ ভালোমন্দের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয় নৈতিকতা, আইনের শাসন না।

প্রশ্ন হলো, এই নৈতিকতার ভিত্তি কী হবে?

নৈতিকতা এত গুরুত্বপূর্ণ হলে, নৈতিকতা আর এর ভিত্তি নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া দরকার না? ভালোমন্দ, মানবজীবনের লক্ষ, পবিত্রতা, শুদ্ধাচার আর ভ্রষ্টাচার–এগুলো নিয়ে আরও কথা হওয়া দরকার না?

কিন্তু আমরা এ ধরনের আলোচনা দেখি না। কারণ, নৈতিকতা হলো ধর্মের আলোচনার জায়গা। নৈতিকতার আলোচনা আনতে গেলে ধর্মকে আনতে হবে। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রে যেহেতু আইনকে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হতে দেয়া যাবে না, তাই ধর্মকে দূরে রাখার জন্য এই আলোচনাকেও দূরে রাখতে হয়।

কিন্তু তাহলে আবার সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে যেতে হয়। আইনের ভিত্তি অন্তর্নিহিত নৈতিকতা। কিন্তু সেই নৈতিকতার ভিত্তি কী?

কোনো-না-কোনো নৈতিকতা, কোনো-না-কোনো মাপকাঠি তো লাগবেই। কিন্তু এ প্রশ্নগুলো শুধু 'অন্যায্য আইন' নিয়ে প্রতিবাদ করার সময় আলোচিত হয়। আর

তখনো আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকে যায় 'ন্যায়বিচার কী', এ প্রশ্নে। কিন্তু ন্যায়বিচার কী—তার জবাব দিতে হলেও আগে ভালো-মন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, শুদ্ধাচার-ভ্রষ্টাচারের কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে। এমন কোনো কাঠামো কি আছে?

অবশ্যই আছে। অনেকগুলো আছে। সেগুলোকে আমরা ধর্ম বলি। অবশ্য এমন কিছু কাঠামোও আছে, যেগুলো তৈরি হয়েছে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে। তবে স্রষ্টার দোহাই না দিলেও মানুষ কী করবে আর কী করবে না, কীভাবে তার জীবনযাপন করা উচিত—ধর্মের মতোই এই কাঠামোগুলোও সেটা নির্ধারণ করে দিতে চায়। এগুলোকেও ধর্মগুলোর মতোই সত্য বলে ধরে নেয়া হয়, অনুসরণ করা হয়।

ধর্মীয় কাঠামো আর স্রষ্টাকে অস্বীকার করা কাঠামো; অর্থাৎ নৈতিকতার সেক্যুলার কাঠামো—আইন প্রণয়নের প্রশ্নে এ দুই ধরনের কাঠামোর মধ্যে কি কার্যত কোনো পার্থক্য আছে?

আমি মনে করি আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ। আমি জানি অনেকে আইনের ভিত্তি হিসেবে সেক্যুলার মূল্যবোধকে পছন্দ করে। আমি যখন সেক্যুলার রাষ্ট্রে বসবাস করি, এই সেক্যুলার-নাস্তিক নৈতিকতাকে তখন আমার মেনে নিতে হয়। আসলে মেনে নিতে হয়, বলাটা ভুল হবে। আমাকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। নৈতিকতার এ কাঠামো নিয়ে যদিও আমার অনেক আপত্তি, অনেক বিরোধিতা আছে, তবুও সেক্যুলার রাষ্ট্র জোর করে তার পছন্দের নৈতিকতা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো এই অভিযোগ তুলেই সেক্যুলার রাষ্ট্র ক্রমাগত ধর্মরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে, অথচ ঠিক একই কাজ সেক্যুলার রাষ্ট্রও করে।

এ কথা স্বীকার করার মতো সততা কি সেক্যুলারদের আছে?

এই বাস্তবতাকে যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে ধর্মীয় স্বাধীনতা নামক অন্তঃসারশূন্য বুলি নিয়ে আদিখ্যেতা বাদ দেয়া যায়। মুসলিমরা যখন শরীয়াহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জানায় তখন ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি দিয়ে হাতুড়ির মতো বারবার মুসলিমদের ওপর ঘা দেয়া হয়। কিন্তু এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অস্তিত্ব সেক্যুলার রাষ্ট্রেই নেই।

ধর্ম আর রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

সুইযারল্যান্ডে হাতাহাতি!

সুইযারল্যান্ড মুসলিম ছাত্রদের জরিমানা করা শুরু করে ২০১৬-তে। তাদের অপরাধ? শিক্ষিকার সাথে হাত মেলাতে অস্বীকার করা। এই ‘গুরুতর’ অপরাধের কারণে মুসলিম ছাত্রদের ৫০০০ ডলার পর্যন্ত ফাইন করার আইন হয়।[১৫]

আচ্ছা, মানুষকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আরেকজনের শারীরিক সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করা কি একধরনের যৌন হয়রানি না? নারীবাদীরা তো ক্রমাগত পারস্পরিক সম্মতির গুরুত্ব নিয়ে চেঁচামেচি করে, কিন্তু এ বিষয়ে তারা মুখে কুলুপ এঁটে রইল কেন? সম্ভবত মুসলিম পুরুষের ক্ষেত্রে এসবের কোনো মূল্য নেই। একজন মুসলিম পুরুষ যখন অমুসলিম কোনো নারীর সাথে হাতে মেলাতে অস্বীকার করে তখন সে সম্ভবত সেই নারীকে শোষণ করার চেষ্টা করছে, যেভাবে সে নিজের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাকে শোষণ করে–তাই না?

পশ্চিমা বিশ্বে এমনও মহিলা আছে, কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে না হাসলে যারা রীতিমতো অপমানিত বোধ করে। এটা নাকি অপমান, অশ্রদ্ধা! কী অদ্ভুত! তুমি যে ধরনের সামাজিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত কোনো কিছু সেটার সাথে না মেলা মানেই সেটা অশ্রদ্ধা? অপমান?

এই পশ্চিমারা একদিকে সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ আর বৈচিত্র্যকে সম্মান করার কথা বলে। অন্যদিকে কোনো মুসলিম তার ধর্মের বিধান মেনে চললে সেটাকে অসহিষ্ণুতা বলে গলা ফাটায়। একজন মুসলিম আদৌ অসম্মান করতে চাচ্ছে কি না, সেটা ধর্তব্য না। আমার সংস্কৃতি অনুযায়ী আমার কাছে একে অসম্মান মনে হচ্ছে, তাই আমি এটাকে অসহিষ্ণুতা বলে চালিয়ে দেবো। আসলে সহিষ্ণুতা বলতে ওরা কী বোঝায়? মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ান কারী কিংবা অ্যারাবিয়ান শর্মা খাওয়া? হ্যালোউইনের সময় বিভিন্ন দেশের পোশাক পরে যেমন খুশি তেমন সাজো খেলা?

---

[১৫] In Switzerland, Muslim schoolchildren who refuse to shake their teacher's hand may be fined $5,000. May 25, 2016. The Washington Post

শিক্ষিকার হাত মেলাতে অস্বীকার করা কেন বেআইনি, তার পক্ষে সেক্যুলারদের পছন্দের আরেকটা যুক্তি আছে–

> এর মাধ্যমে জেন্ডার রোল আর জেন্ডার সেগ্রেগেশানের ধারণাগুলো আরও পোক্ত হয়।

হ্যাঁ, তা তো হয়ই। সমাজে নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামী বিধানগুলোর উদ্দেশ্যই হলো নারীপুরুষের মেলামেশা সীমিত করা। তুমি মুসলিম না, তুমি কাফের, তাই নারী-পুরুষের মেলামেশা সীমিত করার ব্যাপারটা তোমার কাছে খারাপ লাগতেই পারে। কিন্তু তাই বলে আমাকেও কেন সেটা খারাপ বলে মানতে হবে? তুমি অজ্ঞ, তোমার অজ্ঞতাকে আমার কেন মানতে হবে? হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো, এটা তোমাদের দেশ। তাই ইচ্ছেমতো আইন বানানোর অধিকার তোমাদের আছে। তোমাদের দেশে থাকতে হলে তোমাদের মূল্যবোধ আর তোমাদের নৈতিকতা মেনে নিয়েই থাকতে হবে।

ঠিক আছে, মানলাম। তাহলে সৌদি আরব, ইরান কিংবা আফগানিস্তান যখন তাদের দেশে, তাদের পছন্দমতো আইন বানায় তখন কেন তোমাদের এত আপত্তি? তারা যখন তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস আর নৈতিকতা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ড্রেস কোড কিংবা জেন্ডার সেগ্রেগেশানের নিয়ম করে তখন কেন তোমাদের এত চেঁচামেচি?

এটা কি ভণ্ডামি না? ডাবলস্ট্যান্ডার্ড না?

একই কাজ তোমরা করলে উদারতা-সহিষ্ণুতা আর আমরা করলে সাম্প্রদায়িকতা? তোমরা তোমাদের পশ্চিমা মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাও। মুসলিমরা তাদের ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বাস্তবায়ন করতে চায়। একমাত্র পার্থক্য হলো, মুসলিমরা লুকোচুরি করে না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর ধর্মীয় স্বাধীনতার দোহাই দেয় না। নিজেদের বিশ্বাস আর উদ্দেশ্যের কথা আমরা সোজাসুজি স্বীকার করি।

ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের ইসলামের বিধান মানতে বাধা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিধান অমান্য করতে বাধ্য করে। এটাই প্রমাণ করে সেক্যুলারিসমের নিরপেক্ষতা আসলে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই না। এমন অনেক উদাহরণ আছে। সুইযারল্যান্ডের 'হ্যান্ডশেইক আইন' সেই লিস্টে নতুন এক সংযোজন কেবল।

আসলে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। নিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমারা তাদের মূল্যবোধ আর সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়। এ কারণেই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুক্তি আওড়ে ইসলামের পক্ষে কথা বলার মানে হয় না। ধর্মীয় স্বাধীনতার পুরো

ধারণাটাই এসেছে একটা নির্দিষ্ট পশ্চিমা প্রেক্ষাপট ও দর্শন থেকে। যেখানে ধর্মের নির্দিষ্ট একটা সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা আছে। আর এই সংজ্ঞার জন্মও নির্দিষ্ট পশ্চিমা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণার অবধারিত ফলাফল হলো কালচারের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেকোনো কিছু ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে চালিয়ে দেয়া।

সমকামিতার কথাই ধরুন না। প্রথমে এটা ছিল সর্বজনীনভাবে নিন্দনীয় কাজ। তারপর কালচার যখন একটু বদলাল, তখন এটা হয়ে গেল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন। কিছু ধার্মিক লোক এটাকে পাপ মনে করে আর কিছু মুক্তমনা টাইপের ধার্মিক এতে খারাপ কিছু দেখে না। তারপর এটা হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন। এখানে ভিন্নমতের সুযোগ আছে। এটা ইখতিলাফি বিষয়। ইজতিহাদের বিষয়। তারপর এল আরেকটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। সমকামিতা এখন সর্বজনীনভাবে নন্দিত। যারা এর বিপক্ষে, যারা সমকামিতার অধিকার নিয়ে উচ্ছ্বসিত না তারা গোঁড়া, ধর্মান্ধ। তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না। কারণ, এটা তাদের ঘৃণা, বিদ্বেষ, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতার ফসল। আর এগুলো খুব ক্ষতিকর বিষয়। তাই এগুলো এখন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোন ধর্মীয় অবস্থান সঠিক সেটা এখন থেকে রাষ্ট্র ঠিক করে দেবে। কোনো সমকামী এসে তার 'বিয়ের' জন্য আপনাকে কেক বানাতে বললে, চান বা না চান, আপনাকে সেটা বানাতেই হবে।[১৬] ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন না।

অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময়জুড়ে অনেক মুসলিম পশ্চিমা-বিশ্বে পাড়ি জমিয়েছে। সেখানে অবস্থান করে সীমিতভাবে মোটামুটি ইসলাম পালন করতে পেরেছে। কিন্তু সেটা ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে না। একেবারেই না। যারা আজও এটা বিশ্বাস করে বসে আছেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। মুসলিমরা মোটামুটিভাবে ইসলামের কিছু অংশ এতদিন পালন করতে পেরেছে, কারণ পশ্চিমা দেশগুলোর মূল সাংস্কৃতিক শেকড় ছিল খ্রিষ্টধর্মে। খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম এবং ইসলামের নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে বেশ অনেকটুকু মিল আছে। যেহেতু ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো কালচারের সাথে অনেক দিক থেকে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তাই মুসলিমদের এতদিন অতটা সমস্যা হয়নি।

---

[১৬] সমকামী বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কেক বা ফুলের ডেকোরেশান করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে আইনী হয়রানি এবং জরিমানার বেশ অনেকগুলো ঘটনা পশ্চিমে ঘটেছে। আগ্রহী পাঠক দেখুন, Klein, dba Sweet Cakes by Melissa, v. Oregon Bureau of Labor and Industries, Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, এবং Arlene's Flowers lawsuit. ~ অনুবাদক

কিন্তু এখন সেটা বদলাচ্ছে। ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মীয় শেকড় ত্যাগ করে পশ্চিমা সমাজ আজ ক্রমেই গ্রহণ করছে পৌত্তলিক এবং স্যাইটানিক চিন্তা ও সংস্কৃতি। খুব শীঘ্রই এমন অবস্থা আসবে যখন পশ্চিমা দেশগুলোর আইন ইসলামের একেবারে 'নির্দোষ' ফরয বিধানগুলো মানাও অসম্ভব করে তুলবে। এই আইনগুলো যখন বানানো হবে তখন পশ্চিমাদের কাছে সেগুলোকে ধর্মীয় স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ বলে মনে হবে না; বরং তারা মনে করবে, এসব আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে আরও মজবুত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান পালনকে বেআইনি করার আইন তৈরি করা হবে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে।

কিন্তু তখনো এমন একদল মুসলিম থাকবে, যারা বোকার মতো বিশ্বাস করবে, মুসলিমরা পশ্চিমে 'স্বাধীনভাবে' দ্বীন পালন করতে পারবে। আর ওই পর্যায়ে তারা এমন এক 'ইসলাম' আবিষ্কার করবে, যার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসলাম এর কোনো মিল নেই।[১৭]

আর যে মুসলিমরা কল্পনার জগৎ থেকে বের হয়ে প্রকৃত ইসলাম আঁকড়ে ধরতে চাইবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে কঠিন পরীক্ষা আর দুর্দশার। গত দশ বছরে অ্যামেরিকা আর ইউরোপে যেভাবে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়েছে, তা চলতে থাকলে এমন হওয়াটা সময়ের ব্যাপারমাত্র। ওয়াল্লাহু 'আলাম।

---

[১৭] 'পশ্চিমা ইসলামের' এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। ~ অনুবাদক

স্বৈরাচারই ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে শরীয়াহকে প্রতিস্থাপন করতে চায়

অর্থনীতিবিদ মার্ক কোয়োমা তার 'আইডিয়াস আর নট ইনাফ' প্রবন্ধে সরল স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা এমন কোনো বৈপ্লবিক ধারণা না, যেটা তার অন্তর্নিহিত শক্তি আর অপ্রতিরোধ্য যুক্তির জোরে পশ্চিমা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বরং অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি সহিষ্ণু হওয়া ছিল ইউরোপের জন্য সময়ের দাবি। এটা কোনো আদর্শিক অবস্থান ছিল না, এটা ছিল প্র্যাকটিকাল সিদ্ধান্ত।[১৮]

এই পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো? কোয়োমার মতে–

একসময় ইউরোপের শাসকদের জন্য চার্চ বা পাদরিদের সাথে সম্পর্ক রাখা অপরিহার্য ছিল। জনসাধারণের কাছে বৈধতা আর গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য চার্চের অনুমোদন লাগত। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে হলে জনগণের কাছে বৈধতা পেতে হবে। আর শাসকদের কাছে স্থিতিশীলতা অত্যন্ত দামি। তাই শাসকরা চার্চের সাথে মৈত্রী করত। তবে এই মৈত্রীর কারণে শাসকদের 'সহিষ্ণুতা' বিসর্জন দিতে হতো। অনেক সময়ে চার্চের হয়ে ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসীদের শাস্তি দিতে হতো।

কিন্তু আধুনিকতার যুগের প্রথম দিক থেকে নানা কারণে রাজনৈতিক বৈধতার জন্য চার্চের ওপর শাসকদের নির্ভরতা কমতে থাকে। জনপরিসরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যেও একসময় শাসকদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর করতে হতো। শিক্ষা, গরিবদের সাহায্য, বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজসহ নানা ক্ষেত্রে চার্চ ছিল দুর্বল রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। আইন এবং সামাজিক নিয়মগুলো আজ জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের (নাগরিকত্ব) ওপর নির্ভর করে। সেই সময়ে এগুলো নির্ভর করত ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর। ফলে ওই সময়কার সমাজে তেমন একটা ধর্মীয় বৈচিত্র্য দেখা যেত না। এমন প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণাই ছিল অকল্পনীয়।

তাহলে অতীত থেকে বর্তমানের এই বিশাল পরিবর্তন কীভাবে এল?

---

[১৮] Ideas were not enough, Mark Koyama, Aeon.co

কোয়োমার মতে—প্রথমত, রাষ্ট্র ট্যাক্স নেয়া বাড়িয়ে দিলো। বেশি টাকা পেয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হতে শুরু করল। শক্তি বাড়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব হারাতে শুরু করল চার্চ। রাষ্ট্রের শক্তি যত বাড়ল তত বাড়ল আইন এবং সামাজিক বিধান প্রয়োগের ক্ষমতা। ধর্মীয় পরিচিতির ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন ফুরাল। রাষ্ট্রের কাছে ইহুদী, ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট–সবাই এখন সমান। ধর্মীয় পরিচিতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা নিয়ম করার প্রয়োজন রইল না। সবার একটাই পরিচয়—ট্যাক্সদাতা। নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে যেহেতু আর ধর্মের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে না, তাই নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস আর অবস্থান বাস্তবায়নেরও প্রয়োজন থাকল না। জন্ম নিল, 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'। নীতি, আদর্শ বা মূল্যবোধ হিসেবে না। বাস্তববাদিতা আর সুবিধার জন্যে।

কেউ হয়তো বলতে পারেন–ঠিক যাছে, জন্ম যেভাবেই হোক না কেন, জিনিসটা তো ভালো, তাই না?

আসলে না। একটু খতিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে ব্যাপারটা আসলে ভালো কিছু না। দেখুন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী?

নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ করা। আর এর জন্যে যেভাবে দরকার সেভাবে মানুষকে চলতে বাধ্য করা। প্রথম দিকে এ উদ্দেশ্য পূরণে চার্চ কার্যকর ছিল। তাই রাষ্ট্র চার্চের সাথে মৈত্রী করেছে। পরে আরও কার্যকর পথ পাওয়া গেছে, তাই চার্চের মূল্য ফুরিয়েছে। চার্চ সেকেলে হয়ে গেছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চিমে চার্চের গুরুত্ব ও ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমেছে। একই সময়ে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক যে প্রতিষ্ঠান–সেই সামরিক বাহিনী শক্তি, সামর্থ্য, সম্পদ, জনবল এবং প্রযুক্তির দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে। জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য জান্তব সামরিক শক্তির চেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি আর কী হতে পারে? রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখন আর স্রষ্টার দোহাই দিতে হয় না। সামরিক শক্তি ব্যবহার করলেই চলে।

কিন্তু এই পরিবর্তনকে কি উন্নতি বলা যায়? পশ্চিমা বিশ্বে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব কমেছে, সত্য। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা কি আসলেই বেড়েছে? নাকি বদলেছে শুধু কর্তৃত্বের উৎস? আগে পাদরির বাইবেলকে ব্যবহৃত হতো, এখন ব্যবহৃত হয় জেনারেলের বন্দুক। ইউরোপের ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের জন্য নির্মম চার্চের চেয়ে আজকের নিষ্ঠুর সামরিক বাহিনী সমর্থিত রাষ্ট্র উত্তম হতে পারে। সব হিসেবেনিকেশের পর লাভের পাল্লাটাই হয়তো তাদের দিকে ভারী। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি এখনো ওদের জন্য আবেদন রাখে।

কিন্তু একই কথা ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য খাটে না। মধ্যযুগের ইউরোপের গির্জার ক্ষেত্রে যে কথাগুলো সত্য, ইসলামী শাসনের জন্য সেগুলো সত্য না। ইসলামী শাসনের অধীনে মুসলিমরা কখনোই ওইভাবে শোষিত হয়নি যেভাবে চার্চের কর্তৃত্বের সময়ে ইউরোপিয়ানরা হয়েছে। হ্যাঁ, মুসলিম-বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে শাসকদের মাধ্যমে শোষণ, সহিংসতা এবং নির্মমতা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে ইসলামী শরীয়াহ এবং ইসলামী আলিমদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে। শাসকগোষ্ঠীর অধীনস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে মুসলিম উলামায়ে কেরাম এর ঐতিহ্য প্রসিদ্ধ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে আলিমগণ নির্যাতিত হয়েছেন। উম্মাহর ইতিহাসের অধিকাংশ সময় শাসক ও শাসনক্ষমতার সাথে সংস্পর্শের ব্যাপারে আলিমগণ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> *'যে শাসকদের দরজায় যায় সে ফিতনায় পতিত হয়। শাসকের সঙ্গে যার নৈকট্য যত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর থেকে তার দূরত্ব তত বেশি বেড়ে যায়।'*[১৯]

এ কারণে শাসকদের সাথে ঐতিহাসিকভাবে উলামায়ে কেরামের একধরনের অস্বস্তিকর সম্পর্ক ছিল। অনেক সময় দ্বীনের বিষয়ে দ্বন্দ্বও হয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ ছিল শাসক কর্তৃক শরীয়াহর সীমালঙ্ঘন। শরীয়াহ বরাবরই ছিল আদল, ইনসাফ এবং রাহমাহর উৎস। আর তাই কেবল স্বৈরাচারই শরীয়াহকে সরিয়ে রাখতে চায়।

---

[১৯] মুসনাদ আহমাদ

লিবারেলিসমের মোড়কে ইসলামের প্রচার ক্ষতিকর

শাসক আর সরকারকে আমরা বিচার করি তাদের কাজ দিয়ে। তাদের কাজগুলো আল্লাহর নাযিল করা শরীয়াহ এবং ইনসাফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা দিয়ে। কোনটা গণতান্ত্রিক আর কোনটা অগণতান্ত্রিক—সেই অর্থহীন পার্থক্যের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই। গণতান্ত্রিক-অগণতান্ত্রিকের বিভাজনের আড়ালে আমরা আমাদের বিশ্বাস গোপন করি না। আমাদের মাপকাঠি ওয়াহি।

এসব বুলি যে আসলেই অর্থহীন তা নিয়ে কারও সন্দেহ থাকলে ২০১৩-তে মিসর এবং ২০১৬-তে তুরস্কের সামরিক অভ্যুত্থানের প্রতি পশ্চিমা প্রতিক্রিয়া সে বিশ্লেষণ করতে পারে।

মিসর আর তুরস্ক—দু-জায়গাতেই সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর ধর্মীয় অবস্থানভেদে অভ্যুত্থান দুটোর ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যেই দু-ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে দু-পক্ষের অবস্থানে কিছু মিল আছে। দু-পক্ষই মনে করে অভ্যুত্থান দুটোর মধ্যে একটা ছিল গণতান্ত্রিক' আর অন্যটা 'অগণতান্ত্রিক'। একটা অভ্যুত্থানে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যটাতে ঘটেনি। এক অভ্যুত্থানে মারা পড়া মানুষেরা বিশ্বাসঘাতক, আর অন্য অভ্যুত্থানে মারা পড়া মানুষেরা শহীদ। দু-পক্ষই এটা মনে করে। তফাত হলো এক দল একটাকে গণতান্ত্রিক মনে করে অন্য দল অপরটাকে।

কোনটা কতটা গণতান্ত্রিক ছিল তা নিয়ে সারাদিন তর্ক করা যাবে, কিন্তু শেষমেশ সমাধান আসবে না। কারণ, গণতান্ত্রিক-অগণতান্ত্রিকের এই ধারণাগুলো ফাঁপা এবং আপেক্ষিক। যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা সরকারি কাঠামোর ওপর এগুলো ইচ্ছেমতো আরোপ করা যায়।

ইসলামের অবস্থানগুলোকে লিবারেলিসমের ভাষা আর গণতন্ত্রের মতো ধারণাগুলোর সাথে জুড়ে উপস্থাপন করা ক্ষতিকর। এভাবে আমরা আসলে মূল আলোচনাকে বিলম্বিত করছি। প্রকৃত প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাচ্ছি।

মূল আলোচনা হলো–জনগণের প্রতি সরকারের (যেকোনো সরকারের) আর সরকারের প্রতি জনগণের দায়িত্বগুলো কী কী?

তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই প্রশ্নের উত্তরগুলোর মধ্য থেকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ আমরা কীভাবে সনাক্ত করব?

আমরা কি নায়ালিস্টদের[২০] মতো করে ধরে নেব এসব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নেই, সবই আপেক্ষিক?

নাকি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে? যদি থাকে, তাহলে সেই উত্তর খুঁজে বের করার উপায় কী? মাপকাঠি কী?

এ ধরনের প্রশ্নগুলো মানব অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে। বাধ্য করে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে। কিন্তু লিবারেল-সেক্যুলারিসম এই প্রশ্ন এবং চিন্তাগুলো থেকে আমাদের দূরে রাখতে চায়। মানুষ এ প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবুক, আল্লাহর কথা চিন্তা করুক–এটা লিবারেল সেক্যুলারিসম চায় না। এই কাঠামো তাই আমাদের বলে–

> স্রষ্টা অপ্রাসঙ্গিক, অগুরুত্বপূর্ণ। অস্তিত্ব, জীবনের উদ্দেশ্য–এসব অর্থহীন, গুরুত্বহীন প্রশ্ন। এসব বাদ দাও, আর আমাদের ঠিক করে দেয়া কিছু ফাঁপা বুলি আওড়ে যাও। অন্তঃসারশূন্য এ বুলিগুলো কোনো সরকার আর কোনো শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নিয়ে ফালতু তর্কে ব্যস্ত থাকো। এমন বিতর্কে নিজেদের মগ্ন রাখো, যার কোনো শেষ নেই। যার কোনো অর্থবোধক ফলাফল নেই। আর মনে রেখো, আর যাই করো না কেন, স্রষ্টাকে নিয়ে কথা বলা যাবে না। এটা অস্বস্তিকর, শিশুতোষ বিষয়। এ নিয়ে কথা বলা আর ঠাকুমার ঝুলি নিয়ে কথা বলা একই কথা। যদি সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী মহলের অংশ হতে চাও, যদি চাও তোমার কথা গুরুত্বের সাথে নেয়া হোক, তাহলে এসব বাদ দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদের মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলো যাও।

না, আমাদের এমন বুদ্ধি-জীবিতার প্রয়োজন নেই।

---

[২০] নায়ালিসম (Nihilism)—বাংলায় ধ্বংসবাদ বা নিরর্থবাদ। নায়ালিসম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন–nihil–থেকে। যার অর্থে 'কিছুই না/nothing'। নায়ালিসম একধরনের দার্শনিক অবস্থান, যা মনে করে সব মূল্যবোধ এবং নীতিনৈতিকতা দিনশেষে ভিত্তিহীন। মহাবিশ্ব এবং মানব-অস্তিত্ব উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন। সব অর্থ আর নৈতিকতার আলোচনা মানুষের বানানো, অর্থহীন এবং অকার্যকর। নায়ালিসম সব ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক রীতিনীতি অস্বীকার করে। নায়ালিস্ট–নায়ালিসমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। ~ অনুবাদক

গণতন্ত্র কি ইসলামী শাসনের চেয়ে উত্তম?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কি আদর্শ সরকার ব্যবস্থা?

প্রশ্নটা নিয়ে মুসলিমদের সতর্কতার সাথে চিন্তা করা দরকার। আজ আমরা নানা দিক থেকে বারবার শুনি গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ সরকার-ব্যবস্থা। সবচেয়ে ন্যায্য ব্যবস্থা। কিন্তু এ দাবির সাথে ইসলামের ঘোরতর সংঘর্ষ আছে।

কেন?

কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহতে আমরা গণতন্ত্রের কথা পাই না। স্পষ্টভাবে না, ইঙ্গিতেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। মদীনার শাসনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ছিল না। খুলাফায়ে রাশেদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো করে সরকারকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে তাঁরা রাষ্ট্র চালাননি।

গণতন্ত্র যদি শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হয় তাহলে আল্লাহ্ কেন গণতন্ত্রের কথা বললেন না? কেন আসমানি নির্দেশনায় গণতন্ত্রের কথা এল না? মানুষ নিজে নিজে এমন একটা সরকার-ব্যবস্থা বানিয়ে ফেলল, যা আল্লাহর ওয়াহি আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশনার চেয়ে উত্তম—এটা কীভাবে সম্ভব?

এমন সংশয় এবং সন্দেহ মানুষের মনে সৃষ্টি হতেই পারে। কীভাবে আমরা এর মোকাবিলা করব?

আমার মতে, মৌলিক একটা প্রশ্ন দিয়ে প্রথমে শুরু করা উচিত।

আমরা কেন আজ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ সরকার-ব্যবস্থা মনে করছি?

গণতন্ত্রের শক্তি হিসেবে এর প্রচারকরা প্রথম যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলে তা হলো–চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন।[২১] এই বৈশিষ্ট্য নাকি

---

[২১] চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স: একে সেপারেশন অফ পাওয়ার (ক্ষমতার বিভাজন) বলা হয়ে থাকে নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ–রাষ্ট্রের এ তিন অঙ্গের স্বাধীন উপস্থিতি এবং ক্ষমতার বিভাজন থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং তাদের নির্ধারিত ভূমিকা স্বাধীনভাবে

গণতন্ত্রকে অন্য সব ব্যবস্থার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এনে দেয়।

চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যাপারটা আসলে কী?

মূল বিষয়টা হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেয়া থাকবে। প্রতিটি বিভাগ অন্য দুটি বিভাগের ক্ষমতার ওপর একধরনের বাঁধ হিসেবে কাজ করবে। ফলে কোনো ব্যাক্তি, দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারবে না। একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না।

যেমন অ্যামেরিকাতে নির্বাহী শাখা, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ আছে—প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট। এই তিন শাখা একে অপরের ওপর নজরদারি করে। কোনো এক বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে না, কারও একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে, বরং তিনটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বিভাগের মাধ্যমে একধরনের ভারসাম্য তৈরি হবে। দেশের আইন, যুদ্ধের সিদ্ধান্তের মতো বিভিন্ন বিষয়ে কোনো শাখা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সিদ্ধান্ত হতে হবে তিন শাখার সমন্বয়ে।

চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের এই ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে খুব চমৎকার মনে হয়। ইসলামেও একধরনের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ধারণা আছে। তবে পার্থক্য হলো গণতন্ত্রে এ ধারণা কেবল বাহ্যিকভাবে আছে। ভাসাভাসা কিছু প্রয়োগ ছাড়া এর কোনো প্রকৃত বাস্তবতা নেই। অন্যদিকে ইসলামের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা বাস্তব এবং প্রকৃত অর্থে ভারসাম্য তৈরি করে।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়ান, ব্যাখ্যা করছি।

অ্যামেরিকা কিংবা অন্য কোনো পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে তাকালে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা যায়। বিভিন্ন লবি, পলিটিকাল অ্যাকশন গ্রুপ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করে। যেমন, অ্যামেরিকাতে হেলথ ইন্সুরেন্স (স্বাস্থ্যবীমা) কোম্পানিগুলো কংগ্রেস আর প্রেসিডেন্টকে টার্গেট করে লবিয়িং করে। সহজ ভাষায় বললে, প্রচুর টাকার বিনিময়ে এই দুই শাখার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে

পালন করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি আরেকটির ওপরে কার্যত নজরদারি করবে। নির্বাহী বিভাগ যেন ইচ্ছেমতো চলতে না পারে, তা আইনপ্রণেতারা (অর্থাৎ আইনসভা) এবং বিচার বিভাগ দেখবে। আইনপ্রণেতারা যেন এমন আইন তৈরি করতে না পারেন, যা নাগরিকের অধিকারকে খর্ব করে, তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। একেই 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' বলে অভিহিত করা হয়। স্বাধীনভাবে এগুলো চলার অর্থ হচ্ছে কেউ কারও মুখাপেক্ষী হবে না, কেউ কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পদক্ষেপ নেবে না। এর উদ্দেশ্য ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার একক ব্যবহার নিরোধ। রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা যাতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সার্বিকভাবে ন্যস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা, এই তত্ত্বের মূল কথা। ~ অনুবাদক

তারা এমন আইন পাশ করিয়ে নেয়, যেটা তাদের ব্যবসার জন্য লাভজনক হবে। এটা অবশ্যই একধরনের দুর্নীতি। কংগ্রেস সদস্য এবং প্রেসিডেন্টের কর্তব্য সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। জনগণের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভালো তা দেখা। কিন্তু টাকার কারণে জনগণের স্বার্থের বদলে তারা মনোযোগ দিচ্ছে কর্পোরেশানগুলোর স্বার্থ রক্ষায়। এভাবে বিভিন্ন স্বার্থবাদী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং লবিগুলো সরকারের বিভিন্ন অংশের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অ্যামেরিকার ইতিহাসজুড়ে এমন অনেক উদাহরণ আছে। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব নেতিবাচক। এ কারণেই অ্যামেরিকার ইতিহাসে আমরা এত যুলুম দেখতে পাই।

উত্তর অ্যামেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ান' আদিবাসীদের ওপর চালানো গণহত্যা, আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে আনা মানুষের ওপর শোষণ, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা হামলার মতো অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা, সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক এবং আফগানিস্তানে চালানো আগ্রাসন—অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এ সব বিশাল মাপের অপরাধের সিদ্ধান্ত কিন্তু রাষ্ট্রের সব শাখার ঐকমত্যেই হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বন্ধ হবার কিংবা কমে যাবার দাবি আসলে করা যায় না। এমন দাবির বিরুদ্ধে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। জেনোসাইডের চেয়ে মারাত্মক অপরাধ কয়টা আছে? কিন্তু অ্যামেরিকার মতো সেক্যুলার গণতন্ত্রগুলো এ ধরনের অপরাধ বারবার করেছে। তাদের মৌন সম্মতি নিয়ে এমন অপরাধ হয়েছে এবং হচ্ছে। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যবস্থার ভেতর, রাষ্ট্রের সব বিভাগের ঐকমত্যেই এসব অপরাধ হয়েছে।

গণতন্ত্রের পক্ষের লোকজন বলতে পারে, এ ঘটনাগুলোর জন্য গণতন্ত্রকে দোষী করা উচিত না। এগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'ভুল প্রয়োগ'-এর উদাহরণ। গণতন্ত্র যখন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়, তখন এ ধরনের কিছু হয় না। হ্যাঁ, বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু এগুলো গণতন্ত্রের কারণে না। গণতন্ত্র যদি আদর্শভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, দুর্নীতিবিরোধী শক্ত আইন তৈরি হয়, যদি আমরা অ্যান্টি-লবিয়িং আইন বানাই, তাহলে এসব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাধের কথা বললে এটা হবে গণতন্ত্রের পক্ষে কাউন্টার আরগুমেন্ট। সেই কাউন্টার আরগুমেন্টের উত্তর কী হবে?

আমার মতে—গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা আইনের উৎস নিয়ে। গণতন্ত্রে আইনের ভিত্তি কী হবে? অধিকাংশের মতামত? অধিকাংশ মানুষ ভোট দিয়ে সাংসদ বা কংগ্রেস সদস্য নির্বাচন করবে, তারপর জনপ্রতিনিধিরা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করবে?

যদি তাই হয় তাহলে এখানে বড় ধরনের একটা সমস্যা থেকে যায়। জনপ্রিয়তা কখনো সঠিকত্বের মাপকাঠি হতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ যে নৈতিকভাবে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করবে তার গ্যারান্টি কী? অধিকাংশের মতামত যে সত্যিকারের ইনসাফের অবস্থান হবে তার নিশ্চয়তা কী? আমরা কেন ধরে নিচ্ছি ভোটদাতাদের অধিকাংশ নৈতিকভাবে সঠিক অবস্থানের পক্ষেই ভোট দেবেন? মানুষ তার নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে, এমন ধরে নেয়াই তো যৌক্তিক। যদি এমনই হয় তাহলে কীভাবে এই প্রক্রিয়া থেকে নৈতিক এবং ইনসাফপূর্ণ ফলাফল আসবে? উল্টোটাই তো আসার কথা।

আরেকটা বাস্তবতা হলো, জনমত প্রভাবিত করা এবং ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা বেশ সহজ। অ্যামেরিকার ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই এবং আজও দেখতে পাচ্ছি। ম্যাস মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করা যায়। এই প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে সামান্য পরিমাণ ধারণা কারও থেকে থাকলে সে সহজেই বুঝবে, অধিকাংশের মত দিয়ে মানুষের কুপ্রবৃত্তির ওপর কোনো ধরনের বাঁধ দেয়া সম্ভব না; বরং অধিকাংশের মতামত, অধিকাংশ সময় জাতিকে ইনসাফ ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

গণতন্ত্র কখনো নৈতিকতার বিকল্প হতে পারে না। আর এ কারণেই ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ, এ কারণেই সত্য ধর্ম–ইসলাম–গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সত্যিকারের নৈতিকতার ধারণা দেয় ইসলাম। ইসলামে নৈতিকতার মাপকাঠি মানুষের খেয়ালখুশি না। মাপকাঠি হলো ওয়াহি এবং রিসালাত। ইসলামে ভালোমন্দের বাছবিচারের জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশকে গ্রহণ করা হয়, যিনি মানবজাতিসহ সবকিছুর স্রষ্টা। আর ইসলামের এই নৈতিকতা কার্যকরী নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। আমাদের কাছে যদি ভালোমন্দের পরম মাপকাঠি থাকে তাহলে সরকার কিংবা শাসক সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নাকি ভুল করছে, ন্যায়বিচার করছে নাকি যুলুম করছে, সেই মাপকাঠির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব। এমন একটি পরম মানদণ্ড থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই মানদণ্ড যদি না থাকে; যেমন আজকের সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেই, তাহলে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতার ওপর কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকতে পারে না।

এর বাস্তব প্রমাণ আমাদের সামনেই আছে। কোনটা নৈতিক কোনটা ন্যায্য–এ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে অ্যামেরিকা রাষ্ট্রের সব শাখার অবস্থান মোটামুটি একই। যখন যে অবস্থান সমাজে জনপ্রিয়তা পায়, রাষ্ট্রের শাখাগুলো সেই অবস্থানই গ্রহণ করে। ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার স্বাধীন কোনো মাপকাঠি এখানে নেই। তাই সত্যিকার অর্থে এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কোনো ভারসাম্য

নেই।

রাষ্ট্রে যদিও বিভিন্ন শাখা আছে, কিন্তু তারা খুব সহজে নিজেদের মধ্যে আঁতাত করতে পারে। কেউ চাইলে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী সবগুলো শাখাকে একই অবস্থানে নিয়ে আসতে পারে। আর এমন কোনো স্বতন্ত্র, স্বাধীন মাপকাঠিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেই, যার ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ডের বিচার করা যাবে। এ কারণেই সেক্যুলার-লিবারেল গণতন্ত্রগুলোর জন্য এত ভয়ংকর মাত্রার অপরাধ করা এতটা সহজ। এ জন্যই তাদের ইতিহাসজুড়ে এত নৃশংসতা।

কিন্তু ইসলামী ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি নৈতিকতার পরম মাপকাঠি যখন গ্রহণ করা হয় তখন এমন ঘটে না। ইসলামী আইন আর নৈতিকতার এই মাপকাঠির হেফাযতকারী হলেন আলিমগণ। ইসলামী ইতিহাসজুড়ে উলামায়ে কেরাম সতর্কতার সাথে শাসকদের (সুলতান, আমির, খলিফা) সাথে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কারণ, তারা জানতেন ক্ষমতা মানুষকে কলুষিত করতে পারে। আলিম যখন শাসকের কাছাকাছি হয়ে যান তখন শাসক সেই আলিমের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। শাসক তাকে দিয়ে এমন ফতোয়া দেয়ায়, যেটা তার স্বার্থসিদ্ধি করবে।

আর আলিম ও শাসকের মধ্যে এই দূরত্বের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

যে শাসকদের দরজায় যায়, সে ফিতনায় পতিত হয়। শাসকের সঙ্গে যার নৈকট্য যত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর থেকে তার দূরত্ব তত বেশি বেড়ে যায়।[২২]

এই হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সীরাতের শিক্ষা, সাহাবায়ে কেরামের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দৃষ্টান্ত এবং উম্মাহর পূর্ববর্তী কল্যাণময় প্রজন্মের অধিকাংশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলিমগণদের একটি অংশ সব সময় শাসকদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন।

এটা হলো একটা সত্যিকারের নৈতিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যবস্থা। সুলতান কিংবা খলিফা দুর্নীতিবাজ হতে পারে। সে জনগণকে কিংবা অর্থনীতিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। কিছু আলিমকেও সে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। কিন্তু সব সময় এমন কিছু আলেম থাকবেন, যারা দুর্নীতি এবং বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কথা বলবেন। শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণে অনেক আলিম নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের বন্দী করা হয়েছে, হত্যাও করা হয়েছে। এটি ইসলামী

[২২] মুসনাদ আহমাদ

ইতিহাস এবং ইসলামী শাসনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের পশ্চিমা যে ধারণা, সেটা ইসলামে নেই। জনগণের সাথে শাসকের চুক্তি হলো, শাসক ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে, ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধান অনুযায়ী শাসন করবে। এই কাজগুলো সে যতদিন করবে ততদিন জনগণ তার আনুগত্য করবে। এই হলো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু যে চূড়ান্ত নৈতিক মানদণ্ড পুরো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তার ধারক-বাহকেরা–অর্থাৎ আলিমরা–সরাসরি শাসকের সাথে যুক্ত নন। আর এ কারণেই তাঁরা ক্ষমতা ও সম্পদের কলুষিত করার প্রভাব থেকে মুক্ত।

সেক্যুলার গণতন্ত্রের মৌলিক ত্রুটি হলো তারা ধরে নেয় জনমত সঠিক সমাধান দেবে। বাস্তবতা বলে অধিকাংশের মত অধিকাংশ সময় ভুল হয়। এমন নড়বড়ে, নৈতিক ভিত্তির ওপর আসলে ভরসা করা যায় না। এ কারণেই আধুনিক পশ্চিমের ইতিহাসে ভালোমন্দের সংজ্ঞা আমরা বারবার বদলাতে দেখি। সংজ্ঞা বদলায়, কারণ জনমত বদলায়। যা ঘৃণ্য ছিল, একসময় সেটার বিরোধিতা করা ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের বাস্তবতা বোঝা উচিত। গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং নিখুঁত ব্যবস্থা ইসলামে আছে, এটা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাসে যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের ইতিহাসে এমন শাসক ছিল, যারা যালিম, দুর্নীতিবাজ, যারা অনেক ভয়ংকর অপরাধ করেছে। কিন্তু এ পুরোটা সময়জুড়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট এবং সুসংগত নৈতিকতা ছিল–শরীয়াহ। এমন এক কম্পাস ছিল, যা শত ঝড়ের মাঝেও আমাদের সঠিক পথের ওপর রেখেছে। শত যুলুমের পরও ন্যায়-অন্যায়ের বোধ আমাদের মাঝে জাগ্রত রেখেছে। উম্মাহ কখনো এই অপরাধগুলোকে বৈধতা দেয়নি। এটাই হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা প্রকৃত নির্দেশনা।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আজ আমরা ইসলাম এবং আমাদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগি। আর তাই ভাবি নৈতিকতা আর শাসন-ব্যবস্থাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে দুনিয়ার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের কিছু দার্শনিক ভালোভাবে বুঝেছে।

সাম্য, মুক্তি, স্বাধীনতা

ধর্মীয় দীক্ষা বনাম সেক্যুলার দীক্ষা

আরব বসন্ত চলাকালে একজন সিরিয়ান অ্যাক্টিভিস্টের সাথে কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন–

> 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর চেয়ে স্বাধীনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্বাধীনতা না থাকলে আমি নিজের ইচ্ছেমতো বিশ্বাস বেছে নিতে পারব না।'

কথাটা শুনে মনে হতে পারে উনি স্বাধীনতা আর ঈমানকে মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন। আসলে উনি স্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। উনার মতে স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। কিন্তু স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। স্বাধীনতার শাব্দিক অর্থ আর লিবারেলিসমের বলা 'স্বাধীনতা'র অর্থ এক না।

লিবারেল দর্শন অনুযায়ী একজন প্রকৃত স্বাধীন মানুষ চিন্তা শুরু করে একটা ব্ল্যাংক স্লেইট বা খালি খাতা নিয়ে। মনের এ অবস্থাকে বলা হয় টাবুলা রাসা (Tabula Rasa)। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপিয়ান এমপিরিসিস্টদের সময় থেকে শুরু করে এটাই হলো লিবারেল দার্শনিকদের অবস্থান।[২৩]

টাবুলা রাসা তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন সত্যিকারের স্বাধীন মানুষের মনের খাতা থাকে খালি, সব ধরনের বিশ্বাস আর অঙ্গীকার থেকে মুক্ত। বিশ্ব, প্রকৃতি, কিংবা স্রষ্টার ব্যাপারে চাপিয়ে দেয়া কোনো বিশ্বাস বা আদর্শ তার মধ্যে থাকে না। তার মন, তার চিন্তা সব ধরনের পূর্বধারণা থেকে 'পবিত্র।' একবারে শূন্য খাতা নিয়ে শুরু করার পর এই মানুষ ধীরে ধীরে তার নিজস্ব বিশ্বাস তৈরি করে।

এম্পিরিসিস্টদের আশা ছিল, এই প্রকৃত স্বাধীন মানুষ নিজস্ব বিশ্বাস ও দর্শন গড়ে তুলবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে। আর কেউ যদি বিজ্ঞানের আলোতে

---

[২৩] Empiricism–বাংলায় অভিজ্ঞতাবাদ। একটি জ্ঞানতত্ত্ব বা Epistemology, যা দাবি করে জ্ঞানের একমাত্র অথবা প্রধান উৎস হল ইন্দ্রিয়জাত (অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ) অভিজ্ঞতা। এম্পিরিসিস্ট (empiricist)–অভিজ্ঞতাবাদী। যে অভিজ্ঞতাবাদের অবস্থান গ্রহণ করে। ~ অনুবাদক

নিজের বিশ্বাস নাও গড়ে, তবুও খালি খাতা নিয়ে শুরু করার কারণে তার বিশ্বাস—সেটা যা-ই হোক না কেন—কমসেকম খাঁটি এবং অকৃত্রিম হবে। তাই কোনো মানুষ শূন্য খাতা নিয়ে শুরু করার পর স্বেচ্ছায় ধার্মিক হলে লিবারেল দর্শন সেটা মেনে নেয়। যদিও বাস্তবতা হলো, লিবারেল দর্শন যে জায়গা থেকে শুরু করার কথা বলে—টাবুলা রাসা, খালি খাতা—সেটা কার্যত ধর্মহীনতার অবস্থান।

এ অবস্থানের বেশ মজার কিছু তাৎপর্য আছে।

ধরুন, আমার জন্ম ধার্মিক পরিবারে। শুরু থেকেই পরিবার আমাকে একটা নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর বড় করেছে। আমি বেড়ে উঠেছি এ বিশ্বাসের সাথেই। তার মানে কি এই বিশ্বাস আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?

আমি কিন্তু যুক্তি দেখাতে পারি—একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে আমি স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে এই নির্দিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করছি।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে—আজকের যে 'আমি' সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেই মানুষটার চিন্তা-চেতনা কি তার শৈশব দ্বারা প্রভাবিত হয়নি? ধার্মিক পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে আজকের 'আমি' কি একধরনের ধর্মীয় দীক্ষার মধ্য দিয়ে যাইনি? এর প্রভাব কি আমার সিদ্ধান্তে পড়ছে না? হয়তো আমি ব্রেইনওয়াশড। তাহলে আমি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, এটা আসলে বলা যায় না। ছোটবেলা থেকে যা শেখানো হয়েছে, আমি আসলে সেটা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আর ভাবছি আমার সিদ্ধান্ত স্বাধীন।

লিবারেলরা এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকে। এটা তাদের খুব পছন্দের একটা যুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একই কথা কি তাদের ক্ষেত্রেও খাটে না?

ধার্মিক পরিবারের বড় হওয়া শিশুরা যদি ধর্মীয় দীক্ষার শিকার হয়, তাহলে অধার্মিক পরিবারে বড় হওয়া সন্তানেরাও কি একধরনের দীক্ষার মধ্য দিয়ে যায় না?

দুটোই ব্রেইনওয়াশিং। একটা ধর্মীয় আরেকটা সেক্যুলার।

ধরুন, একটা শিশুকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হলো বস্তুবাদী পৃথিবীই সব, স্রষ্টা বলে কেউ নেই। উচ্চতর কোনো সত্তা কিংবা শক্তি নেই। তাকে আরও শেখানো হলো, ধর্মীয় ভক্তি আসলে মূল্যহীন এবং গোড়ামি। বুঝ হবার পর এই শিশু যদি নাস্তিক হয় এবং ধর্ম নিয়ে তুচ্ছতাছিল্য করে, তাহলে তাকে কি আসলে স্বাধীন বলা যায়? এটা কি আসলেই মুক্তচিন্তা? স্বাধীন চিন্তা? নাকি তার এ বিশ্বাস ও দর্শন তার পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের ফসল কেবল?

আসলে টাবুলা রাসা বা খালি খাতা বলে কিছু নেই। মানুষের মন কখনো সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ হতে পারে না। লিবারেল দার্শনিকদের কল্পনার জগৎ ছাড়া আর

কোথাও এই খালি খাতার অস্তিত্ব নেই। সব পূর্বধারণা, পক্ষপাত, সংস্কার, অঙ্গীকার, মূল্যবোধ, নৈতিকতা—সব একেবারে ধুয়েমুছে, শূন্য থেকে মানুষ নিজের দর্শন ও বিশ্বাসের কাঠামো তৈরি করতে পারে না।

আমরা সবাই একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্ম নিই। শৈশব থেকে নির্দিষ্ট কিছু ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধ আমাদের মনে গেঁথে যায়। এর অনেক কিছুই আমরা সারাজীবন নিজেদের মধ্যে বয়ে বেড়াই।

কাজেই যে প্রশ্নটা নিয়ে আসলে চিন্তা করা দরকার তা হলো, এই ধারণা এবং মূল্যবোধগুলো কি সঠিক?

যদি সঠিক হয়, তাহলে কীভাবে এ অবস্থান আসলাম সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ না। খালি খাতা নিয়ে এসেছি না ভরা খাতা নিয়ে, সেই আলোচনা মূল্যহীন। আর বাস্তবে খালি খাতা বলে কিছু নেইও।

অন্যদিকে, আমার ভেতরে গেঁথে যাওয়া এই ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধগুলো যদি ভুল এবং মিথ্যে হয়, তাহলে সংশোধনের একমাত্র উপায় হলো সত্য ও সঠিকের অনুসরণ করা। ভুল 'স্বাধীনভাবে' করলেও, সেটা ভুলই থাকে। স্বাধীনতা নামের ভাসাভাসা, বায়বীয় বস্তুর অজুহাত দিয়ে ভুলকে সঠিক প্রমাণ করা যায় না, আর না-ই-বা মিথ্যাকে সত্য বানানো যায়। আর এই কথিত 'স্বাধীনতা'-ও এনলাইটেনমেন্ট দার্শনিকদের দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না।

দিনশেষে সত্য ও ইনসাফের চূড়ান্ত ঘোষণা হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

পুরো আলোচনাটা অন্যভাবে দেখানো যায়।

আজকের সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র কথা বলে। সেক্যুলারিসম ধরে নেয় ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রথম ধাপ হলো ধর্মহীনতার জায়গা থেকে শুরু করা (খালি খাতা)। কিন্তু খালি খাতাকে কেন প্রথম ধাপ ধরা হচ্ছে? কেন একে নিরপেক্ষ ভাবা হচ্ছে? কেন ধরে নেয়া হচ্ছে বিশ্বাসহীনতা হলো আমাদের ডিফল্ট, সহজাত অবস্থান?

কেউ হয়তো বলবে—পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে। অনেক রকমের বিশ্বাস আছে। সেক্যুলার রাষ্ট্র এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটার পক্ষ না নিয়ে সব ধর্মই ত্যাগ করে। নিরপেক্ষ হবার জন্য সে সব ধর্ম থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখে।

কিন্তু এটা আসলে বাস্তবতার বেশ মোটা দাগের ভুল উপস্থাপনা। কারণ, ধর্মহীনতাও একধরনের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের আছে নিজস্ব মূল্যবোধ আর মূলনীতি। আছে নৈতিকতার নিজস্ব মাপকাঠি—লিবারেল দর্শন। তাত্ত্বিকভাবে আসলেই নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কি না, সেটা ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু বাস্তবতা হলো আজকের সেক্যুলার রাষ্ট্র

নিরপেক্ষ না; বরং সে লিবারেল মূল্যবোধ তথা লিবারেল বিশ্বাসের কাঠামো গ্রহণ করে।

কাজেই সেক্যুলার রাষ্ট্র যখন ধর্মহীনতার অবস্থান গ্রহণ করে তখন সে নির্দিষ্ট এক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার কাঠামো গ্রহণ করছে। সে ঠিকই নির্দিষ্ট মতাদর্শ ও বিশ্বাসের পক্ষ নিচ্ছে। পক্ষপাতের দিক থেকে, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মূলনীতির ভিত্তিতে চালানো ধর্মীয় রাষ্ট্র—যেখানে একটি ধর্মকে অন্য সব ধর্ম কিংবা দর্শনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়—আর আজকের সেক্যুলার রাষ্ট্রের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য হলো ধর্মীয় রাষ্ট্র নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করে না। ধর্মীয় রাষ্ট্র নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে মিথ্যা বলে না, বিভ্রান্তিতেও থাকে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সেক্যুলার রাষ্ট্রের পার্থক্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাওহিদ, ঈমান, সত্য এবং ইনসাফের ভিত্তিতে। সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় কুফর ও শিরকের ভিত্তিতে।

ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করে না

ইসলাম কি ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণাকে সমর্থন করে?

না, অবশ্যই না।

এ কথা অনেকে মানতে চান না। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে যারা ইসলামের অবস্থান মানতে পারেন না তারা আসলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না। বাস্তবতা হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। এটাই সোজাসাপ্টা উত্তর। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একটাই। যদিও এ কথা আজ অনেকের কাছে জঘন্য মনে হয়। আল্লাহ কীভাবে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতাকে সম্মান না করতে পারেন, কীভাবে একজন পরম করুণাময় স্রষ্টা মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হন—এটা অনেকের মাথায় ধরে না। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করা মুসলিমদের অনেককে একসময় ইসলাম ত্যাগ করতে দেখা যায়। এমন হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ধর্মীয় স্বাধীনতার এই ধারণা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

একটু ভেবে দেখুন, ধর্মীয় স্বাধীনতা যদি আসলেই মহান কোনো মূল্যবোধ হয় তাহলে এটা শুধু দুনিয়াতে কেন প্রযোজ্য হবে? এটা তো আখিরাতেও প্রযোজ্য হবার কথা। মৃত্যুর পরের জীবনেও ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। আমরা যদি সরকার এবং শাসকদের কাছে সব ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতা আর সমান আচরণের দাবি করি—একে নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং ইনসাফের দাবি মনে করি, তাহলে সেটা তো স্রষ্টার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবার কথা। তাই না?

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব বিশ্বাস সমান না। মহান আল্লাহর মনোনীত এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। তিনি এটা শুধু কুরআনে বলেননি, আগের আসমানি কিতাবগুলোতেও এ কথা বলা হয়েছে। যে ইসলামের অনুসরণ করবে আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করবে সে হবে চিরকালের জন্য জাহান্নামী।

ধর্মীয় স্বাধীনতা আর আখিরাতে শুধু মুসলিমদের নাজাত পাওয়া—এ দুই বিশ্বাস সাংঘর্ষিক। তাই লিবারেলিসম এবং সেক্যুলারিসম দ্বারা প্রভাবিত অনেকেই মনে করে,

কে কোন ধর্ম অনুসরণ করল তা গুরুত্বপূর্ণ না। দুনিয়াতে তো না-ই, আখিরাতেও না। কেবল ইসলামই যে আখিরাতে নাজাত দিতে পারে, এই বিশ্বাস তারা ত্যাগ করেছে। দেখবেন এই ধরনের মানুষেরা বলছে—

> দিনশেষে সব ধর্মই সমান। একই স্রষ্টার কাছে পৌঁছোবার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা কেবল। সব ধর্মই শেষ পর্যন্ত কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়...ইত্যাদি।

অনেক সময় মনে হতে পারে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা সমর্থনের ব্যাপারটা আসলে রাজনৈতিক অবস্থান। রাজনৈতিক হিসেবেনিকেশের কারণে কৌশল হিসেবে এগুলো বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের ঈমানের ওপর এ ধরনের মতাদর্শের গভীর, নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর এভাবেই লিবারেলিসমের দর্শন (যা থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার উৎপত্তি) ধীরে ধীরে, সূক্ষ্মভাবে মুসলিমের ঈমান ও আকীদাহ নষ্ট করে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এ ফিতনা থেকে হেফাযত করুন।

আত্ম-উপাসনা, গোল্ডেন রুল এবং স্যাইটানিসম

স্যাইটানিসমের মূল মন্ত্র কী জানেন?

> Do what thou wilt shall be the whole of the law.
>
> যা ইচ্ছে তা-ই করো, এই হলো পূর্ণাঙ্গ বিধান।

কথাটা অ্যালিস্টার ক্রউলির 'দা বুক অফ দা ল' থেকে নেয়া। এ বইকে আধুনিক শয়তান উপাসনার প্রধানতম রচনাগুলো অন্যতম ধরা হয়। আর অ্যালিস্টার ক্রউলিকে মনে করা আধুনিক স্যাইটানিসমের গডফাদার।

আচ্ছা বলুন তো, মানুষকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

এর নানা পদ্ধতি আছে। তবে ইতিহাস বলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতির অন্যতম হলো মানুষকে এই কথা বলা–

> তুমিই সর্বেসর্বা। তুমি নিজেই নিজের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করো। নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ো, তোমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ তোমারই হাতে। তুমিই দেবতা, তুমি কেবল তোমারই আরাধনা করো।

মানুষ প্রাণী হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু ছকের মধ্যে চলে। মানুষের সিদ্ধান্তগুলো ছক বাঁধা। কামনাবাসনার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করে। নিজের ইগো আর প্রবৃত্তিকে সে সন্তুষ্ট করতে চায় নানাভাবে। নিজেকে সে সাময়িক সুখে মগ্ন করে। চকচকে জিনিস তার দৃষ্টি আর মন, দুটোই কেড়ে নেয়। এগুলো আমাদের নফসের বৈশিষ্ট্য।

যখন বলা হয়–মনের কথা শোনো, মন যা চায় তা-ই করো–মানুষ তখন নফসের কামনা-বাসনাগুলোর দিকে ফিরে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো নফসের চাহিদা মেটানোয় ব্যস্ত থাকে। কামনাবাসনা তার ওপর রাজত্ব করে। সে পরিণত হয় শরীর, নফস, আর চাহিদার দাসে। আর পুরোটা সময় মনে করে সে মুক্ত, স্বাধীন। সে নিজেই তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। নিজের ভাগ্য গড়ে নিচ্ছে।

লিবারেল দর্শন, 'মুক্তি-স্বাধীনতা-ক্ষমতায়নের' মুখস্থ বুলি, সেলফহেল্প, পসিটিভ সাইকোলজি, মাই লাইফ মাই রুলস, জাস্ট ডু ইট, ইউ ওনলি লিভ ওয়ান্স–এই

সবকিছুর মূল মন্ত্র হলো নফসের দাসত্ব। খেয়ালখুশির গোলামি।

ব্যাপারটা মাদকাসক্ত হওয়ার মতো। আসক্ত ব্যক্তি মনে করে নিজের চিন্তা আর কাজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আছে। মনে করে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কথাটা সত্য। মাদকাসক্তরা যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় সেটা স্বেচ্ছায়ই তো নেয়। কিন্তু সমস্যা হলো, সিদ্ধান্তগুলো বেশির ভাগ সময় ভুল হয় এবং তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। নফসের গোলামি করা মানুষেরও একই অবস্থা।

এ জন্যই দখল করা অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব ধ্বংসের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বহুদিন ধরে মাদক আর মদ ব্যবহার করে আসছে। মানুষকে তার আদিম, পাশবিক সত্তায় ফিরিয়ে নিতে পারলে তাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ হয়ে যায়।

লিবারেলিসম গোল্ডেন রুলের কথা বলে। গোল্ডেন রুলের বক্তব্য হলো–

অন্যের সাথে এমন আচরণ করো, যেমন আচরণ তুমি নিজের জন্য চাও

এটা আসলে অ্যালিস্টার ক্রউলির Do what thou wilt-এর একটা সংস্করণ। কারণ, লিবারেল দর্শনের ভেতরে থাকা অবস্থায় এটা একটা অসার কথা, যার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এই নীতি কোনো কাজের দিকে মানুষ ধাবিত করে না। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে না।

কারণ, একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়–তুমি নিজের জন্য কেমন আচরণ চাও?

দেখুন, ঘুরেফিরে আবারও বৃত্তের কেন্দ্রে বসানো হচ্ছে নিজেকেই। নিজের ইচ্ছা, নিজের ভালোলাগাই চূড়ান্ত মাপকাঠি। নৈতিকতা হলো পুরো বিশ্বকে আমার অবয়বে দেখা। এটা ন্যায়পরায়ণতা না, এটা আত্ম-উপাসনা। আত্মকেন্দ্রিক লিবারেল দর্শনের প্রধান স্তম্ভ এই 'গ্লোডেন রুল' হওয়াই স্বাভাবিক।

লিবারেলরা অবশ্য এখানে একটা বস্তাপচা যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবে। তারা বলবে– প্রত্যেক ধর্মেই কোনো-না-কোনোভাবে গোল্ডেন রুলের কথা এসেছে। যেমন হাদিসে এসেছে–

'তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।'[২৪]

হ্যাঁ, বিভিন্ন ধর্মে এমন কথা এসেছে, এটা সত্য। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে এটা কীভাবে এসেছে? লিবারেলদের দেয়া এই যুক্তির ত্রুটি হলো, এ কথাটা কোনো ধর্মে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন

[২৪] সহীহ মুসলিম

মূলনীতি হিসেবে আসেনি; বরং বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান ও অন্যান্য মূলনীতির সাথে যুক্ত হয়ে এসেছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যখন বলেছেন–'... *যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে'*–তখন সেটাকে ইসলামী শরীয়াহর বেঁধে দেয়া সীমার ভেতরেই বুঝতে হবে। কেউ তার সমকামী যৌনসঙ্গীকে বিয়ে করতে চায়, তাই তার উচিত সমকামী বিয়ে সমর্থন করা—এটা বলা যাবে না। কেউ যিনা করে তাই সে চায় সমাজে যিনা বহুল-প্রচলিত হয়ে যাক, এটাও বলা যাবে না। তখন এই যুক্তি দেয়া যাবে না যে–একজন মুসলিম *'তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে'*!

কল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দের সংজ্ঞা নিজে নিজে ঠিক করা যায় না। ভালোমন্দ, হারাম-হালাল আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্ধারিত সেই সীমার মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু লিবারেলিসমের ক্ষেত্রে গোল্ডেন রুল স্বতন্ত্র এবং একাকী। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শুধু সিদ্ধান্তই নেয়া হয় না; বরং ভালোমন্দ পর্যন্ত ঠিক করা হয়।

> এ কাজটা কি আমার কাছে ভালো মনে হয়? যদি হয়, তাহলে আমি চাই অন্য সবাই এই কাজ করার সুযোগ পাক।
>
> সমকামিতা, অজাচার কিংবা মাদক আমার ভালো লাগে। তাই আমি চাই এগুলো বৈধ করে দেয়া হোক। সবাই যেন এই ভালো জিনিসগুলো উপভোগ করতে পারে।

ঘুরেফিরে এটা সেই আত্ম-উপাসনাই। ভালোমন্দের মাপকাঠি আমি। আমার যা ভালো লাগে সেটাই আমি দুনিয়ার জন্য চাই।

প্রশ্ন–কোন সৃষ্টি সর্বপ্রথম নিজেকে ভালোমন্দের কেন্দ্র বানিয়েছিল?

> সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।'[২৫]

মদ ও স্বাধীনতা

সেক্যুলাররা প্রায়ই বলে ইসলামে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। মানুষের স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকারকে ইসলাম সম্মান করে না। যেমন ইসলামে মদ পান অথবা বিক্রি নিষিদ্ধ। অন্যদিকে স্বাধীন পশ্চিমে মদ চলে পানির মতো। যার ইচ্ছে খাবে, যার ইচ্ছে খাবে না। মদ খেলে ক্ষতি যা হবার তার হবে, অন্য কারও না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। তার স্বাধীনতায় বাধা দেয়ার কিংবা তার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার অধিকার ধার্মিক ব্যক্তির নেই।

এই হলো মোটাদাগে সেক্যুলারিসমের বক্তব্য। কথাগুলো আরেকটি খতিয়ে দেখা যাক।

এমন কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই, যা মানুষকে যা ইচ্ছে তা-ই করার স্বাধীনতা দেয়। সব আইনি কাঠামো কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের সিদ্ধান্তের সীমানাকে সীমিত করে এবং সেই সীমাবদ্ধতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে।

যেমন গাড়ি চালাতে হলে লাইসেন্স লাগে। এ নিয়মের কারণে অনেক মানুষের গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা কিন্তু খর্ব হচ্ছে। এমন অনেক মানুষ থাকতে পারে যারা গাড়ি চালাতে পারে, কিন্তু তাদের লাইসেন্স নেই। এমন মানুষ থাকতে পারে যাদের গাড়ি চালানো দরকার। হয়তো তার জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু লাইসেন্স না থাকার কারণে সে যেতে পারছে না। এই আইনের কারণে মানুষের চলাচলের সুযোগ সীমিত হচ্ছে। তবু এ আইন সবাই মেনে নেয়, কারণ এ আইনকে দরকারি মনে করা হয়। লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাতে দেয়া হলে দুর্ঘটনা বেড়ে যাবে। আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়বে। ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে। এসব প্র্যাকটিকাল কারণে মানুষ চায় এ আইনটা থাকুক এবং ঠিকঠাকভাবে এর প্রয়োগ হোক। যাতে ক্ষতি এড়ানো যায়।

এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসে। ‘ক্ষতি’ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে? ক্ষতির সংজ্ঞা কী? মাপকাঠি কী? কোনটাকে ক্ষতি মনে করা হবে, কোনটাকে হবে না? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে একজন মানুষের সার্বিক মতাদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর। প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে আপাতত এগুলো সরিয়ে রাখা যাক। তর্কের খাতিরে ক্ষতির পশ্চিমা স্ট্যান্ডার্ড এবং সংজ্ঞাকেই আপাতত আমরা মেনে নিচ্ছি।

আসুন মদের উদাহরণে ফিরে যাওয়া যাক। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে অ্যামেরিকার জনসংখ্যার কমপক্ষে ৫% Fetal Alcohol Spectrum Disorder বা FASD-নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।[২৬] কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মাত্রাটা ৪০%। FASD এর কারণে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। লারনিং ডিস্যাবিলিটি তৈরি হয় এবং তীব্র ধরনের অ্যান্টি সোশাল বিহেইভিয়ার-ও তৈরি হতে পারে।[২৭]

এ রোগে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ পদ্ধতিতে শেখাতে হয়। অনেকে বড় হয়ে জেল খাটে, বেকার থাকে কিংবা জড়িয়ে পড়ে অপরাধ আর মাদকের জীবনে। আর এসব কিছুর শুরু হয় অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের মদ পান থেকে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মা অল্প পরিমাণ মদ খেলেও সন্তানের মধ্যে FASD দেখা দিতে পারে। প্রেগনেন্সির কথা জানার পর অনেক মহিলা মদ্যপান কমিয়ে দেন বা একেবারে বন্ধ করে দেন। কিন্তু সমস্যা হলো অনেক সময় প্রেগনেন্সির বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই ক্ষতি হয়ে যায়। আর ভুলের কারণে চড়া দাম দিতে হয়।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হিসেবে জীবন কাটানো অনেক চড়া মাশুল। সেই সাথে সমাজের ক্ষতি তো আছেই। এ ধরনের শিশুর দায়িত্ব নিতে হয় রাষ্ট্রকে। তাদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়। খরচ করতে হয়। সেই টাকা আসে জনগণের দেয়া ট্যাক্সের টাকা থেকে। এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাব ওই স্বাধীনতা সীমিত করে এবং কমিয়ে আনে, যে স্বাধীনতার কথা বলে বলে পশ্চিমা সংস্কৃতি মুখে ফেনা তোলে।

এই হিসেব সামনে রাখলে মদ বৈধ করার আইনকে খুব একটা স্বাধীনতাবান্ধব মনে হয় না; বরং মদ নিষিদ্ধ করার ইসলামী বিধানকে যৌক্তিক মনে হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে লিবারেল-সেক্যুলারিসমের অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা নিয়ে এমন আরও অনেক উদাহরণ আর যুক্তি দেয়া যায়। এসব ফাঁকা বুলি দিয়ে ওরা প্রমাণ করতে চায় ইসলামী

---

[২৬] অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মদ্যপান করলে গর্ভস্থ শিশুর ফিটাল অ্যালকোহল স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (FASD) অর্থাৎ 'ভ্রূণের মদ্যজনিত সমস্যারাশি' হতে পারে। এর ফলে সার্বিকভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত। FASD এর কিছু ফলাফল হলো—অস্বাভাবিক চেহারা, স্বল্প উচ্চতা, শরীরের কম ওজন, ক্ষুদ্র আকৃতির মাথা, সমন্বয়হীনতা, বুদ্ধিমত্তার অভাব, আচরণগত সমস্যা, কানে কম শোনা এবং চোখের সমস্যা। ~ অনুবাদক

[২৭] লার্নিং ডিসেবিলিটি বা শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত বিকার একধরনের স্নায়বিক ব্যাধি যা মস্তিষ্কের তথ্য সঞ্চালন এবং তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। লার্নিং ডিসেবিলিটিতে আক্রান্ত শিশুর পড়তে, লিখতে, কথা বলতে, বলা কথা শুনে তার মানে বুঝতে, গণিতের সমীকরণ বুঝতে অসুবিধে হয় এবং এ ধরনের শিশু বোধশক্তি-সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগে। লার্নিং ডিসেবিলিটি অনেক ধরনের হতে পারে যেমন ডিসলেক্সিয়া, ডিসপ্রেক্সিয়া, ডিসক্যালকুলিয়া এবং ডিসগ্রাফিয়া। একই শিশুর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা একসাথে হতে পারে।
অ্যান্টি সোশাল বিহেইভিয়ার (Antisocial personality disorder)-সোশিওপ্যাথি। ~ অনুবাদক

আইন পশ্চাৎপদ এবং প্রগতিবিরোধী। অন্যদিকে সেক্যুলার আইন মুক্তচিন্তা, প্রগতি আর ব্যক্তির ক্ষমতায়নের সোপান।

মানুষের জীবনে মদ কতটা অবর্ণনীয় কষ্ট নিয়ে আসে সেটা বোঝানোর জন্য একটা খবর কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি–

> সুস্যান আর্ল যখন মা হয় তখন ওর বয়স পঁচিশের আশেপাশে। মা হবার আগে ওর বেশির ভাগ রাত কাটত ক্লাব আর বারে। পার্টি আর মদে বুঁদ হয়ে কেটে যেত প্রত্যেক উইকএন্ড। ওর তখনকার বয়ফ্রেন্ডও ওকে উৎসাহিত করত। সুস্যান যখন জানল ও প্রেগনেন্ট, ততদিনে ছয় সপ্তাহ হয়ে গেছে।
>
> 'প্রেগনেন্সির কথা জানামাত্র আমি ড্রিংক করা বন্ধ করে দিই', শান্ত গলায় বলে সুস্যান। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। সুস্যানের ছেলে কুইনটন মিলসের জন্ম হয় ডেলিভারি ডেইট অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের চার সপ্তাহ আগে। জন্মের সময় কুইনটনের মুখে FASD এর পরিষ্কার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। ও কথা বলা শুরু করে স্বাভাবিকের শিশুদের চেয়ে অনেক পরে। কিন্ডারগার্টেনে পড়ার সময় অন্যদের কামড় দেয়া, লাথি দেয়া আর চিৎকার করা শুরু হয়। ক্লাসমেটরা ওকে বুলি করত। বিছানা ভেজানোর অভ্যাস ছিল ১২ বছর পর্যন্ত'।[২৮]

এমন অনেক গল্প আছে। তুলনামূলকভাবে কম কষ্টের একটা গল্প বললাম। এই নিষ্পাপ শিশুটিকে জন্ম পর থেকে কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে হচ্ছে মদের কারণে। তার জীবন অন্য দশটা মানুষের চেয়ে আলাদা—মদের কারণে। হৃদয়ে সামান্য পরিমাণ মায়ামমতা থাকা মানুষমাত্রই বুঝতে পারবে মদ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। মানুষকে মদ থেকে দূরে রাখা দরকার। হাজার বছর ধরে ইসলামী শাসন সমাজকে মদ থেকে মুক্ত রেখেছে। তবু কেন আধুনিক বিশ্ব ইসলামী শাসনের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না?

মুসলিম-বিশ্ব দীর্ঘদিন এই বিষ থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে পশ্চিমারা ধীরে ধীরে মুসলিম-বিশ্বে এই বিষ ছড়াতে শুরু করে। একে গ্ল্যামারাইযও করে। আজ তাই করাচি থেকে রাবাত পর্যন্ত মুসলিম তরুণদের বড় একটা অংশ মদ খাওয়াকে মনে করে মুক্তি, স্বাধীনতার আর পরিশীলিত হবার চিহ্ন। অনাগত শিশুর ক্ষতি করা তাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিত্বের কারণ হওয়া কীভাবে মুক্তি আর স্বাধীনতা হয়?

যদি নিজের স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের মতো মানবিকতা না থাকে, তাহলে অন্তত নিষ্পাপ শিশুদের এ কষ্ট থেকে রেহাই দেয়ার মতো মানবিক কি হওয়া যায় না?

---

[২৮] This Chicago doctor stumbled on a hidden epidemic of fetal brain damage. May 31, 2016. Pbs.org

হুদুদ, দুর্নীতি এবং সাম্য

ইসলামী নৈতিকতায় সাম্যের ধারণা আছে। বেশ গুরুত্বের সাথেই আছে। কিন্তু সাম্যের সব ধারণা এক না। আধুনিক লিবারেলিসম যে সমতার কথা বলে সেটার সাথে ক্লাসিকাল লিবারেলদের, অর্থাৎ প্রথম দিককার লিবারেল দার্শনিকদের দেয়া সমতার সংজ্ঞা মেলে না। অ্যামেরিকার প্রতিষ্ঠাতারা সমতায় বিশ্বাস করত। সেই সাথে আরও বিশ্বাস করত যে কৃষ্ণাঙ্গ ও নারীদের ভোট আর সম্পদের মালিকানার অধিকার নেই। এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে তারা কোনো সাংঘর্ষিকতা দেখেনি।

সে যা-ই হোক, ইসলামে কোন ধরনের সাম্যের কথা আছে, তাঁর একটা উদাহরণ দেখা যাক। সহীহ বুখারীতে আছে,

মক্কার কুরাইশ বংশের মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করে। লোকেরা উসামাহ ইবনু যাইদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশ করতে বলে। উসামাহ ইবনু যাইদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সুপারিশ করতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?"

তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যখন চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার ওপর শরীয়াতের শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত কেটে দেবে।'[২৯]

---

[২৯] সহীহ বুখারী

আরেক বর্ণনা থেকে আরও বিস্তারিত জানা যায়–

'আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, আল-মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবা কিরামগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবেন না। তখন উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন : এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, কোনো সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার ওপর শরীয়াহর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ তার হাত কেটে দেবে।'[৩০]

হাত কাটা কিংবা শারীরিক শাস্তির ব্যাপারটা হয়তো ঢালাওভাবে অমুসলিমদের কাছে অস্বস্তিকর লাগতে পারে। কিন্তু একজন বিবেচনাসম্পন্ন কাফিরও বুঝতে পারার কথা যে গুরুতর পর্যায়ের চুরির মতো অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এ ধরনের শাস্তি কার্যকরী। কাজেই এ ধরনের শাস্তির বিধানকে অটোম্যাটিকভাবে অনুপযোগী ধরে নেয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। বড় বড় কর্পোরেশান আর ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো বৈশ্বিক পর্যায়ে ফ্রড আর চুরি করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের পকেট থেকে আক্ষরিক অর্থে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার চুরি করছে। এদের কারণে দেখা দিচ্ছে মন্দাসহ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়। যখন এদের কেউ ধরা পড়ছে তখন তাকে জেলেও যেতে হচ্ছে না। কিছু টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন। আপনি মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছেন। শাস্তি হিসেবে আপনাকে বলা হলো কয়েক লক্ষ বা বেশি হলে কয়েক কোটি টাকা জরিমানা দিতে। এটাকে কি শাস্তি বলে? নাকি প্রফিট মার্জিন? এমন শাস্তিতে চুরি কি কমবে নাকি বাড়বে?

---

[৩০] সহীহ মুসলিম

অন্যদিকে গরিব মানুষ যখন ছোটখাটো অপরাধ করে, তখন আধুনিক সেক্যুলার আইন তার সাথে কেমন আচরণ করে? সামান্য একটা টিভি চুরির কারণে একজন মানুষকে বছরের পর বছর জেল খাটতে হয়। হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করলে লক্ষ টাকা জরিমানা আর কয়েক হাজার টাকা দামের টিভি চুরি করলে কয়েক বছরের জেল? এটা কেমন ইনসাফ? এখানে সাম্য কোথায়? সমানাধিকার কোথায়?

ব্যাংকার আর কর্পোরেশানগুলোর অপরাধের কারণে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়েছে, গৃহহারা হয়েছে, পথের ভিখারি হয়েছে। এই অপরাধীদের অবশ্যই হাত কাটার মতো শাস্তি প্রাপ্য।

ইসলাম কি স্বাধীনতার ধর্ম?

পশ্চিমা ডানপন্থী আর বামপন্থী, দু-দলই ইসলামের সমালোচনা করে। দু-দলেরই সমালোচনার ভিত্তি লিবারেল দর্শনের বিভিন্ন ধ্যানধারণা—ধর্মীয় স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পোশাকের স্বাধীনতা, জেন্ডার সমতা, ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

এ ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হলে অনেক মুসলিম বিচিত্র এক স্ট্র্যাটিজি গ্রহণ করে। তারা বোঝানোর চেষ্টা করে লিবারেল এই ধ্যানধারণাগুলো আসলে ইসলামসম্মত। এগুলো নাকি অনেক আগে থেকেই ইসলামে আছে। ইসলাম এগুলো সমর্থন করে ইত্যাদি।

এটা একটা লুসিং স্ট্র্যাটিজি। এভাবে কখনো জেতা সম্ভব না। হ্যাঁ, ইসলামী শরীয়াহ এবং মূল্যবোধের কিছু কিছু দিকের সাথে লিবারেল এসব ধারণার কিছু দিক মেলে। কিন্তু সার্বিকভাবে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলগুলো গৌণ বিষয়ে। অন্যদিকে ইসলামের সাথে এসব মতবাদের সংঘর্ষ মৌলিক জায়গাতে। তাই জোর করে দুটোকে মিলিয়ে দিলে হবে না।

তা ছাড়া স্ট্র্যাটিজি হিসেবে এটা যাচ্ছেতাই।

মুক্তচিন্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পোশাকের স্বাধীনতা, জেন্ডার সমতা, বৈবাহিক সমতাসহ যাবতীয় লিবারেল ধ্যানধারণা মুসলিমরা মেনে নিলেও শেষ রক্ষা হবে না। পশ্চিমের মন জয় করার জন্য আজ যদি মুসলিমরা মক্কাতে সমকামী বিয়ের আয়োজন করে, তাহলে কাল ওরা বলে বসবে সত্যিকার অর্থে মুক্তমনা হবার জন্য মাসজিদুল হারামে কোনো ট্রান্সজেন্ডার কিংবা নারীর পোশাক পরা পুরুষকে ইমামতিতে দাঁড় করাতে হবে। যদি এই দাবি মানা হয় তাহলে অন্য কোনো অভিযোগ এনে বলবে প্রগতিশীল পশ্চিমের তুলনায় ইসলাম আসলে অনেক বেশি সংকীর্ণ।

এটাই প্রগতিবাদের বাস্তবতা। আধুনিক পশ্চিমা চিন্তা ও সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ হলো এই প্রগতিবাদ। এই দর্শন অনুযায়ী ক্রমাগত পরিবর্তন ভালো এবং জরুরি। পরিবর্তন না হওয়া মানে পিছিয়ে যাওয়া। ইতিহাসের স্রোতের ভুল দিকে চলা।

প্রগতিবাদের এ দর্শন সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি সবচেয়ে ভালো সময় ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়। সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম ছিল ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম। সবচেয়ে ভালো যুগ ছিল তাঁদের যুগ। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে অবনতি হচ্ছে।

কে বেশি প্রগতিশীল, কে বেশি স্বাধীন, তা প্রমাণে পশ্চিমা দর্শন ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। আমরা মুসলিমরা কখনো এ প্রতিযোগিতায় জিততে পারব না। আর তার দরকারও আমাদের নেই। এমন পাতানো খেলায় যাবারই প্রয়োজন নেই।

তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটিজি কী হওয়া উচিত?

মুক্তি, স্বাধীনতা, সাম্যের মতো ধারণাগুলো কোন কোন কারণে অসংলগ্ন, সেটা আমাদের তুলে ধরা উচিত। আমাদের পরিষ্কার করা দরকার যে এগুলো অনুসরণ করে কল্যাণ এবং ইনসাফ অর্জিত হয় না; বরং মানবজাতির জন্য সবচেয়ে উত্তম সমাধান দেয় ইসলাম। ইসলামের সমাধান কেন সর্বোত্তম সেটা নিয়েও আলোচনা করা দরকার। মডার্নিস্ট প্রগতিবাদীদের সাথে তর্ক করা উচিত এই ছকে।

আমাদের কি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমর্থন করা উচিত না?

প্রশ্ন–ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তিঅধিকার লিবারেল দর্শনের মূল ভিত্তির অংশ। কিন্তু এগুলো কোনো ধরাবাঁধা মাপকাঠি নেই। যেহেতু এগুলো লিবারেলিসমের মূল ভিত্তি তাই সংখ্যালঘু হিসেবে পশ্চিমা দেশে থাকা মুসলিমদের কি উচিত না ব্যক্তিস্বাধীনতার আর ব্যক্তিঅধিকারের এই প্যারাডাইম সমর্থন করা?

উত্তর–ব্যক্তিস্বাধীনতা আর অধিকারের কথা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু আইন এই স্বাধীনতা আর অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে। এটা সব সমাজের ক্ষেত্রে সত্য। সব আইনের ক্ষেত্রে সত্য। আইনমাত্রই স্বাধীনতা খর্ব করে, মানুষের সিদ্ধান্তকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে ফেলে। প্রত্যেকের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

কিন্তু লিবারেল-সেক্যুলারিসম বলে, কেউ যেন নিজ স্বার্থ কিংবা সুখের জন্য আরেকজনের ক্ষতি করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করাই আইনের উদ্দেশ্য। কোনো আইন তখনই বৈধ হবে যখন তা অন্যের ক্ষতিকে নিবারণ করে। তাই ধর্মীয় এবং সেক্যুলার আইন–দুটোই মানুষের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেও সেক্যুলার আইন গ্রহণযোগ্য আর ধর্মীয় আইন অগ্রহণযোগ্য। সেক্যুলার আইনের উদ্দেশ্য ক্ষতি নিবারণ করা। আর এটা সর্বজনীনভাবে সব মানুষের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে ধর্মীয় আইনের ভিত্তি হলো ধর্মীয় ভক্তি, যা শুধু ওই নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; বাকিদের জন্য না।

এটা লিবারেল-সেক্যুলারিসমের বক্তব্য।

সেক্যুলার আর ধর্মীয় আইন এর ব্যাপারে এই যে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে, তার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা আছে। ফাঁকফোকর আছে।

প্রথম সমস্যা, ক্ষতির সংজ্ঞা কী? লাভক্ষতির হিসেব কিসের ভিত্তিতে হচ্ছে? এ নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ এবং বিতর্কের জায়গা থাকে। সেক্যুলার দর্শনের দেয়া 'ক্ষতি'র সংজ্ঞাই কি চূড়ান্ত? এটাই কি একমাত্র বৈধ সংজ্ঞা?

কোনটা ক্ষতিকর আর কোনটা ক্ষতিকর না সেটা নির্ভর করে মানবপ্রকৃতি এবং বিশ্বের

ব্যাপারে একজন মানুষের মেটাফিযিকাল[৩১] অবস্থানের ওপর। এই অবস্থানগুলোকে সব সময় ধর্ম হিসেবে ধরা করা হয় না, কিন্তু মৌলিকভাবে এগুলো ধর্মের চেয়ে খুব একটা আলাদা না।

সেক্যুলার লিবারেলিসম আসলে ভালোমন্দ, লাভক্ষতির ব্যাপারে নিজের ধ্যানধারণাকে সর্বজনীন হিসেবে উপস্থাপন করে। সর্বজনীন সত্য বা স্বার্থের নাম দিয়ে নিজস্ব কিছু মেটাফিযিকাল অবস্থান সে চালান করে দেয়।

একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক।

গর্ভপাত নিয়ে তর্ককে বেশির ভাগ সময় দেখানো হয় সেক্যুলার আর ধার্মিকদের মধ্যেকার ঝগড়া হিসেবে।

গর্ভপাত কি নৈতিক নাকি অনৈতিক?

একে আইনের আওতায় আনা উচিত কি না?

এ ব্যাপারে আইনের অবস্থান কী হওয়া উচিত?

এ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে ব্যক্তির উত্তর নির্ভর করবে ভ্রূণের ব্যাপারে তার ধারণা, ভ্রূণকে 'মানুষ' গণ্য করা হবে কি না, পিতামাতার নৈতিক দায়িত্ব কী– ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তার বিশ্বাসের ওপর।

যারা গর্ভপাতের বিরোধিতা করে তারা ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা চালিত। অন্যদিকে গর্ভপাতের পক্ষে যারা প্রচারণা চালায় তারা চালিত হয় ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তিঅধিকারের মতো বিভিন্ন সেক্যুলার চিন্তা দিয়ে। এভাবেই বিতর্কটা উপস্থাপন করা হয়।

কিন্তু ভ্রূণ এবং নারীদেহের ব্যাপারে সেক্যুলারদের অবস্থানও কিন্তু তাদের ধার্মিক প্রতিপক্ষের অবস্থানের মতোই মেটাফিযিকাল। অর্থাৎ বিশ্বাসজাত। কিন্তু এ বিতর্ককে এক মেটাফিযিকাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরেক মেটাফিযিকাল বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখানো হয় না; বরং একে দেখানো হয় ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বনাম সেক্যুলার উদারতার লড়াই হিসেবে। ধর্মীয় ভক্তি বনাম স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব হিসেবে।

কেন এমন হয়?

কারণ, দুটি মেটাফিযিকাল অবস্থানের দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হলে শুরুতেই কেন একটা অবস্থানকে অন্যটার ওপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে তা নিয়ে মানুষ প্রশ্ন করবে।

---

[৩১] মেটাফিযিক্স–বাংলায় অধিবিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জানা, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, সময়, স্থান, সম্ভাবনা এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে কাজ করে। ~ অনুবাদক

মানুষের মাথায় এই প্রশ্নটা আসুক, সেটা লিবারেল সেক্যুলারিস্টরা চায় না। আর সেক্যুলার আইনের ব্যাপারে এ প্রশ্নটাই আমাদের করা উচিত।

সেক্যুলার নৈতিকতা থেকে শুরু করে সেক্যুলার আইন—সবকিছুর ভিত্তি হলো এমন কিছু মেটাফিযিকাল বিশ্বাস, যেগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো। মৌলিকভাবে এ বিশ্বাসগুলোর ধরন 'ধর্মীয়'। যদিও এগুলোকে তা মনে করা হয় না। এই বিশ্বাসগুলোর ভিত্তিতে সেক্যুলার আইন প্রণয়ন করা হয়। সেগুলো চাপিয়ে দেয়া হয় বাকি সবার ওপর। তারপর আমাদের বাধ্য করা হয় সেক্যুলারিসমের ধর্ম আর বিধান মেনে চলতে। বাধ্য করা হয় সেক্যুলার ধর্মের শাসন মেনে নিতে।

ইসলাম কি সমতা শেখায়?

ইসলাম কি সমানাধিকার সমর্থন করে? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বড় ধরনের বিভ্রান্তি আছে। এক অর্থে বলা যায়, মুসলিমরা সমতার নীতিতে বিশ্বাসী, কারণ সমতা সব ধরনের মৌলিকতার ভিত্তি।

সব নৈতিকতার কাঠামোতে একটা প্রচ্ছন্ন নীতি থাকে—

একই জাতীয় দুটো বিষয়কে সমানভাবে বিচার করা উচিত।

ব্যক্তি 'ক' দোকান থেকে চুরি করলে সেটাকে যদি অপরাধ গণ্য করা হয়, তাহলে একই কাজ 'খ' কিংবা 'গ' করলে সেটাকেও অপরাধ গণ্য করা উচিত—যদি বাকি সবকিছু অপরিবর্তিত থাকে। 'বাকি সবকিছু অপরিবর্তিত থাকা'র এই শর্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'ক' আর 'খ' কখনো হুবহু একইরকম হবে না। দুটো মানুষ কখনো এক হয় না। তাদের পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট, ব্যাকগ্রাউন্ড সবই আলাদা। এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নৈতিকতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চুরির ক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ' পর্যাপ্ত পরিমাণে একইরকম হওয়া। অর্থাৎ তাদের অবস্থা ওইসব দিক থেকে একইরকম হতে হবে যেগুলো এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই কাজের নৈতিকতার প্রশ্নের মীমাংসায় যেগুলো দরকারি।

যেমন ধরুন, 'ক' এর চোখের মণি কালো। 'খ' এর চোখের মণি নীল। এটা একটা পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ না। চুরির প্রশ্নে এই পার্থক্য প্রাসঙ্গিক না। তাই এই পার্থক্য সত্ত্বেও আইনের চোখে তারা সমান গণ্য হবে।

কিন্তু 'ক' যদি কোটিপতি হয় আর 'খ' যদি হয় দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের মানুষ, কিংবা অনাহারে থাকা রিফিউজি—তাহলে সেটা প্রাসঙ্গিক। চুরির নৈতিকতার প্রশ্নে এই পার্থক্য তখন বিবেচনা করতে হবে। 'ক' আর 'খ' এর কাজকে তখন মূল্যায়ন ও বিচার করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে।

এখান থেকে আমরা কী পেলাম?

আমরা বুঝলাম সমানাধিকারের ব্যাপারে আমাদের ধারণা নির্ভর করে 'নৈতিকভাবে

প্রাসঙ্গিক' কিছু ফ্যাক্টরের ওপর। এই বিষয়টা বোঝা জরুরি।

অনেক মানুষ আছে যারা ইসলামী আইনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখো, ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করে। মুসলিমরা তো সমানাধিকারে বিশ্বাসী না।' দুঃখজনকভাবে, কাফিরদের পাশাপাশি আজ অনেক মুসলিমও এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে এমন কিছু পার্থক্য আছে যা নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক। ইসলামী আইন এই পার্থক্যগুলো আমলে নেয়। তাই ইসলামী আইন বৈষম্যমূলক কিংবা শোষণমূলক না; বরং যেসব আইন বা নৈতিকতার কাঠামো নারী ও পুরুষের বাস্তব পার্থক্যগুলো আমলে নেয় না সেগুলোই অন্যায্য এবং শোষণমূলক।

সমানাধিকারের কথা বলে লিবারেলিসম দেখাতে চায় সমতার ধারণা যেন তারাই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তারা আসলে এমন একটা ধারণার ব্যাপারে ক্রেডিট নিতে চাচ্ছে, যেটা সবার মধ্যেই আছে। সব ধরনের নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সমতার ধারণা থাকে। সবাই মনে করে একইরকমের দুটো জিনিসকে সমানভাবে বিচার করা উচিত। যে জায়গাটায় গিয়ে নৈতিক কাঠামোগুলোর মধ্যে পার্থক্য হয় তা হলো, কোন কোন ফ্যাক্টরগুলোকে তারা প্রাসঙ্গিক ধরছে, কেন ধরছে, কীভাবে ধরছে। আর এই আলোচনাটা একটা মেটা-এথিকাল[৩২], মেটাফিযিকাল আলোচনা।

তাই লিবারেল সেক্যুলারিসম আর ইসলামের মধ্যে সমানাধিকারের মূলনীতির প্রতি কে বেশি শ্রদ্ধাশীল তা নিয়ে অর্থহীন তর্ক বাদ দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে কি চিন্তা করা যায় না–

আদর্শ মানবজীবন কেমন?

একটা আদর্শ সমাজে কী কী থাকবে?

কোন জিনিসগুলো মানবজীবনের সমৃদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

এগুলো হলো সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে এমন অনেক কিছু সামনে আসবে যেগুলোর আলোচনা সেক্যুলারিসম এড়িয়ে যায়। একই সাথে কোন ফ্যাক্টরগুলো নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক সেটাও আমরা বুঝতে পারব। কিন্তু লিবারেল-সেক্যুলারিসম এ প্রশ্নগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। এগুলোর আলোচনা থেকে বাঁচার জন্য সে গিয়ে লুকায় স্বাধীনতা আর সমতার ফাঁপা স্লোগানের পেছনে। সে বলে, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সঠিক উত্তর নেই, ভুল উত্তরও নেই। মানুষ

[৩২] মেটা-এথিক্স–বাংলায় পরা-নীতিবিদ্যা। নীতিশাস্ত্রের ওই শাখা যা নৈতিক ধারণা উৎস, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য, প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র প্রশ্ন করে 'মানুষের কী করা উচিত'? পরানীতিবিদ্যা প্রশ্ন করে, 'ভালো হবার অর্থ কী?', 'মন্দ হবার অর্থ কী?', ইত্যাদি। – অনুবাদক

নিজেই নিজের উত্তর খুঁজে নেবে। আর সে যে উত্তর খুঁজে নেবে সেটাই তার জন্য সঠিক। লিবারেল-সেক্যুলারিসমের এ অবস্থান উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই না।

শরীয়াহসম্মত বাকস্বাধীনতা

বিভিন্ন সময় আমি বাকস্বাধীনতার সমালোচনা করেছি। আমি মনে করি কিছু কিছু ধরনের কথা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কিছু বক্তব্য এতই ক্ষতিকর যে এগুলোর কারণে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেয়া উচিত। এ ধরনের সীমা এবং আইন ইসলামে আছে। আর আমি বিশ্বাস করি এটা শুধু যৌক্তিক এবং নৈতিকভাবে সঠিক না; বরং এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ এবং আইনের উদাহরণ সেক্যুলার রাষ্ট্রেও আছে। পার্থক্য হলো ইসলামে কিছু বিষয়কে পবিত্র গণ্য করা হয়, আর লিবারেল রাষ্ট্রে অন্য কিছু বিষয়কে পবিত্র গণ্য করা হয়। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই 'পবিত্র বিষয়গুলো' রক্ষার জন্য সামাজিক এবং আইনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

কিন্তু বিষয়গুলোকে আমরা এভাবে দেখি না। দেখি না বলেই পশ্চিমারা আজও ছোট্ট শিশুর মতো বিশ্বাস করে, তাদের সমাজে চূড়ান্ত বাকস্বাধীনতা আছে অন্যদিকে ইসলামী সমাজে—যে সমাজ ও শাসন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ১৪০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—বাকস্বাধীনতার গলা টিপে ধরা হয়।

যাই হোক, বাকস্বাধীনতার একটি দিক আছে, যা মুসলিমদের গ্রহণ করা উচিত। আর তা হলো, শাসকদের ভুল কিংবা অপরাধের সমালোচনা করার অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। লিবারেল দর্শন (তাত্ত্বিকভাবে হলেও) এই অবস্থানকে সমর্থন করে। আর মুসলিম শাসনের ইতিহাস থেকেও আমরা এমন অনেক উদাহরণ, পাই যা এ অবস্থানকে সমর্থন করে। আমরা এমন উদাহরণ দেখি যেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রত্যেকের প্রকাশ্য সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনাগুলো ন্যায্য ছিল না, ভুল ছিল। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করেননি। সমালোচকদের বন্দী করেননি, নির্যাতন করেননি, হত্যা করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খুলাফায়ে রাশেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন ন্যায়পরায়ণ শাসনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁরাও যদি সমালোচিত হন এবং সমালোচকদের সহ্য করেন তাহলে আজকের মুসলিম-বিশ্বের শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন হবার কথা?

মানবপ্রকৃতির একটা বাস্তবতা হলো, যারা আন্তরিক, সত্যবাদী, সৎ, এবং ন্যায়পরায়ণ–তারা সমালোচিত হলে ক্রুদ্ধ হয় না। একে নেতিবাচকভাবে নেয় না; বরং কেউ সংশোধন করে দিলে তারা কৃতজ্ঞবোধ করে। কারণ, সমালোচনা সঠিক হলে এর দ্বারা নিজের ভুল শোধরানোর সুযোগ পাওয়া যায়।

কিন্তু যারা ন্যায়পরায়ণ না, সমালোচনাকে তারা ঘৃণা করে। তারা কেবল নিজেদের ক্ষমতা আর স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। সত্য ও ন্যায়বিচার নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তাই সর্বশক্তি দিয়ে তারা সমালোচনা আর সমালোচকদের দমিয়ে রাখতে চায়।

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিবাদে লিপ্ত হলে সে অশ্লীল গালি দেয়[৩৩]। মুনাফিক যখন তর্ক করে তখন সত্য নিয়ে চিন্তা করে না। তার লক্ষ্য যেকোনো মূল্যে তর্কে জেতা, সত্য যা-ই হোক না কেন।

তাহলে ওই সব শাসকদের কী বলা হবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলে ঠিক-বেঠিক যাচাই করার বদলে তারা সমালোচকদের বন্দী করে, গ্রেপ্তার করে, নির্যাতন করে কিংবা হত্যা করে? আর সমালোচকের ভাগ্য নিতান্ত ভালো হলে সমালোচনা উপেক্ষা করে?

তাই এই ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতার ধারণাকে ইসলাম সমর্থন করে এবং এ ধরনের বাকস্বাধীনতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো যৌক্তিক এবং বিবেচক ব্যক্তি এই ধরনের বাকস্বাধীনতার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। প্রত্যেক সমাজে যা পবিত্র গণ্য করা হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রক্ষা করা হয়। ইসলামী সমাজ ও শাসনে সত্যিকার অর্থে পবিত্র কী? আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং দ্বীন ইসলাম। আল্লাহ্‌, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং দ্বীন ইসলামের ওপর আক্রমণ করা পুরো ইসলামী সমাজের ওপর আক্রমণ করার শামিল। কারণ, এগুলো ইসলামী শাসন ও সমাজের ভিত্তি। কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের উৎস। কিন্তু আজ এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যা এই বিষয়গুলোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র মনে করে। আজকের শাসকদের কাছে

---

[৩৩] কাবীসা ইবনু 'উকবা (রহ.) ... আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়।

১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে

২. কথা বললে মিথ্যা বলে

৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং

৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।-সহীহ বুখারী

সবচেয়ে পবিত্র তাদের ক্ষমতা, তাদের গদি। আর হাতেগোনা অন্য কিছু বিষয়। তাই একদিকে নিজেদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে দমন করার চেষ্টা করে, অন্যদিকে 'বাকস্বাধীনতার' বুলি প্রচার করে।

নারীবাদ

'নারীবাদী ইসলামের' ভয়ংকর পরিণতি

আমার স্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় ভার্সিটিতে। আমরা দুজনেই তখন হার্ভার্ডে পড়ি। নিজেদের আমরা তখন নারীবাদী ভাবতাম। এর কারণ ছিল। নারীর ওপর পারিবারিক সহিংসতা আর নির্যাতনের প্রভাব কেমন হতে পারে তা নিয়ে দুজনেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। কোনো নারী ঘরের ভেতরে শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতনের শিকার হোক, এটা আমরা চাইতাম না। নির্যাতনের হাত থেকে নারীদের বাঁচানোর একটা শক্ত ইচ্ছা আমাদের মধ্যে কাজ করত। আমরা মনে করতাম, এমন এক পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে যেখানে নারী যথাযথ শ্রদ্ধা, মমতা, সম্মান, ভালোবাসা এবং সহায়তা নিয়ে বাঁচতে পারবে। তার যথাযথ অধিকার পাবে। এখনো আমরা এটা বিশ্বাস করি। তখন মনে হতো, আমাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী পাবার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নারীবাদ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উপলব্ধি করলাম নারীবাদ আসলে সমাধান না। নারীবাদ বরং আরও বড় এক সমস্যার অংশ।

নারীবাদী দর্শনের মধ্যে মারাত্মক রকমের সমস্যা আছে। নারীবাদের ধারাগুলোর মধ্যে এক বা দুটো ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক– ব্যাপারটা এমন না; বরং নারীবাদের সূচনাই হয়েছিল ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন হিসেবে। বিশ্বাস না হলে ইতিহাসের সবচেয়ে নামিদামি নারীবাদী তাত্ত্বিকদের লেখা পড়ে দেখুন। নারীবাদের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে তৃতীয় পর্যায়[৩৪] –সবক্ষেত্রে একই উপসংহারে পৌঁছাতে বাধ্য হবেন।

নারীবাদের এই দিকটা আমাদের মুসলিমের বোঝা দরকার। আজ অনেক মুসলিম

[৩৪] পশ্চিমা নারীবাদী আন্দোলনের তিনটি পর্যায় বা Wave আছে। প্রথম পর্যায়ের সময়কাল ধরা হয় মোটাদাগে ১৮৫০ এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৪০ এর দশক পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল ধরা হয় পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায়ের সূচনাকাল ধরা হয় নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়টা। অনেকে ২০১০ এর দশক থেকে নারীবাদের চতুর্থ পর্যায়ের একটি কথা বলে থাকেন, তবে অধিকাংশ বিশ্লেষক নারীবাদী আন্দোলনকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন। ~ অনুবাদক

নিজেকে নারীবাদী মনে করে, বা নারীবাদী বলে পরিচয় দেয়। একসময় আমি নিজে যে কারণে নারীবাদের চিন্তা গ্রহণ করেছিলাম, সেই একই কারণে অন্য আরও অনেক মুসলিমও এই চিন্তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ প্রবণতা বিপজ্জনক। নারীবাদ তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ধারণ করে, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলে। ইসলামের সাথে নারীবাদের সাংঘর্ষিকতার কিছু দিক বাইরে থেকে বোঝা যায়। আবার কিছু সাংঘর্ষিকতা এমন, যার প্রকৃত মাত্রা অনুধাবন করতে হলে আরও গভীরে ঢুকতে হয়। এ সংঘর্ষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অবশ্যই জরুরি, তবে সেই লম্বা আলোচনায় যাওয়া ছাড়াও নারীবাদের হুমকির বাস্তবতা বোঝার একটা সহজ উপায় আছে। গাছের পরিচয় পাওয়া যায় তার ফল থেকে, নারীবাদের বাস্তবতা বোঝা যাবে নারীবাদীদের দিকে তাকালে।

নারীবাদীদের বিশাল একটা অংশ কেন ইসলামবিদ্বেষী? নারীবাদে দীক্ষিত হবার পর কেন অনেক মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে?

পরিসংখ্যান

এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান পরিষ্কার। জনসংখ্যার বাকি অংশের তুলনায় নারীবাদী বলে পরিচয় দেয়া নারীদের মধ্যে ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা অনেক কম[৩৫]। পশ্চিমা বিশ্বে প্রতি ১০ জন নারীর ৭ জন কোনো-না-কোনো ধর্ম (খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, ইসলাম) অনুসরণ করে। কিন্তু নারীবাদীদের প্রতি ১০ জনে ধর্মে বিশ্বাসী হয় মাত্র ১ জন।[৩৬]

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, এটুকু তথ্য থেকেই কি এটা প্রমাণিত হয় যে নারীবাদের কারণে মানুষ অবিশ্বাসী হয়? আসুন আরও কিছু তথ্য দেখা যাক।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দুই দশকে, ধর্মহীন (non-religious) নারীর সংখ্যা অ্যামেরিকাতে তিন গুণ হয়েছে।[৩৭] এ ২০ বছরে সার্বিকভাবেই অ্যামেরিকাতে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপারটা হলো ধর্মহীনতা বৃদ্ধির এই হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশি। ১৯৯৩ এ নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের ১৬% ছিল নারী। ২০১৩ তে সেটা বেড়ে হয়েছে

---

[৩৫] Aune, Kristin. "Much less religious, A little more spiritual". Feminist Review, vol. 97, no. 1, Mar. 2011, pp. 32-55

[৩৬] Aune, Kristin. Why feminists are less religious. The Guardian. March 29, 2011.

[৩৭] Marcotte, Amanda. America Is Losing Religion: Why More and More Women Are Embracing Non-Belief. AlterNet. May 14, 2015.

৪৩%।[৩৮] প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি। নারীদের মধ্যে ধর্মহীনতা এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার কারণ কী?

বিশ্লেষকদের মতে এর কারণ হলো গণমাধ্যম, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নারীবাদী এবং সেক্যুলার আদর্শের বিস্তার। পশ্চিমে থাকা মুসলিমদের মধ্যেও আমরা এ প্রবণতা দেখেছি। আজকালকার মুরতাদরা (ইসলাম ত্যাগ করা নারী ও পুরুষ) তাদের রিদ্দা বা ধর্মত্যাগ নিয়ে অনেক লেখালেখি করে। কোন কারণে তারা ইসলাম ছেড়ে গেছে সেটা জানার জন্য কোনো অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় না।[৩৯] আর তাদের লেখাতে বারবার যে কথা উঠে আসে তা হলো, তারা বিশ্বাস করে—ইসলাম, কুরআন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষতন্ত্র, অত্যাচার আর নিপীড়নের অনুমোদন দেয়।

অর্থাৎ তারা ইসলাম ত্যাগ করেছে, কারণ ইসলাম নারীবাদী না।

প্রতিক্রিয়া

তবে আজকাল এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা একই সাথে নিজেদের মুসলিম এবং নারীবাদী বলে দাবি করে। নারীবাদ মানুষকে রিদ্দার দিকে নিয়ে যায়, এটা তারা মানতে নারাজ। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিই। নিজেদের মুসলিম নারীবাদী মনে করা সবাই একসময় মুরতাদ হয়ে যাবে, এটা আমি বলছি না। তবে আমাদের মাথায় রাখা উচিত হাঙ্গর ভরা নদীতে কিছু মানুষকে ফেলে দিলে সবাই মারা যাবে না। কেউ কেউ বেঁচে যাবে। কিন্তু তার মানে এই না যে হাঙ্গর নদীতে মানুষকে সাঁতরাতে বলা বুদ্ধিমানের কাজ। খুব চৌকশ সাঁতারু হয়তো ক্ষত-বিক্ষত দেহে জান নিয়ে পালিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু বাকিরা হাঙ্গরের পেটে যাবে। ঠিক একইভাবে নারীবাদ দ্বারা প্রভাবিত মুসলিমদের বিশাল একটা অংশ প্রকাশ্য কিংবা গোপনে ইসলাম ত্যাগ করে অথবা ইসলামের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক বিশ্বাস লালন করে—এটাই বাস্তবতা। তাই আমাদের ঈমান এবং বিশেষ করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ঈমানকে বাঁচাতে হলে নারীবাদের হুমকি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

যেকোনো সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হলো, সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা। দুঃখজনকভাবে এ জায়গাটাতেই আমরা হোঁচট খাচ্ছি। আমিসহ আরও অনেকে হতাশার সাথে লক্ষ করেছি—নারীবাদ আমাদের ঈমানের জন্য ক্ষতিকর এবং হুমকি—পশ্চিমে থাকা, বিশেষ করে অ্যামেরিকায় বসবাস করা মুসলিমরা এ ব্যাপারটা স্বীকারই

---

[৩৮] 2015 State of Atheism in America. Barna Group, March 24, 2015

[৩৯] Bolt, Andres. On Leaving Islam. Herald Sun, June 19, 2017

করতে চান না।

কেন?

এই 'কেন'-এর জবাব দেয়া অস্বস্তিকর, অসুবিধাজনক। এর আছে নানান রকমের প্রতিক্রিয়া। কারও বক্তব্য নারীবাদের বেঁধে দেয়া সীমার বাইরে গেলেই সামাজিক-রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টদের দল তার ওপর হামলে পড়ে। কিন্তু যতই অস্বস্তিকর হোক না কেন সত্যকে তুলে ধরতে হবে। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলা আলিম, ইমাম এবং দা'ঈদের দায়িত্ব। তা নাহলে আমাদের অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে। এটা আজ আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আজ থেকে ৫/১০ বছর পর আজকের নিষ্ক্রিয়তার কথা চিন্তা করে আমরা হয়তো আফসোস করব। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

এ লেখায় আমার উদ্দেশ্য হলো নারীবাদ কীভাবে ধাপে ধাপে একজন মুসলিমকে রিদ্দার দিকে নিয়ে যায়, তা তুলে ধরা। আমি আশা করি এ বিষয়টা স্পষ্ট হলে মুসলিমরা বাস্তবতা উপলব্ধি করবে এবং নারীবাদের বিরুদ্ধে নীরবতা ভাঙবে।

তাহলে রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রার কথা শোনা যাক।

প্রথম ধাপ

শুরুটা হয় যৌক্তিক কিছু অভিযোগ, কিছু ক্ষোভ দিয়ে। এমন অনেক মুসলিম পুরুষ আছে যারা স্ত্রীর হক আদায় করে না, স্ত্রী ওপর যুলুম করে। এমন অনেক মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই যুলুমের বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। নারীর প্রয়োজন এবং তাকে উপযুক্ত সহায়তা দেয়ার দিকগুলো তারা উপেক্ষা করে। এমন অনেক মুসলিম দেশ আছে, যেখানে এ ধরনের যুলুমগুলোকে একধরনের সামাজিক বৈধতা দেয়া হয়। অনেক সমাজে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যারা এই যুলুমগুলো করে অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের যুলুমকে দ্বীন ইসলামের নামে বৈধতা দিতে চায়।

এই সমস্যাগুলো আছে,এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একইসাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান নারীবাদ না। এর সমাধান হলো ইসলামী জ্ঞানের যে কমতি আছে, শরীয়াহর ব্যাপারে যে অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে আছে সেটা দূর করা। এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় হক্বপন্থী আলিমদের মাধ্যমে। ওইসব আলিম ও দাঈদের মাধ্যমে, যারা মডার্নিসম, লিবারেলিসম এবং নারীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। দুঃখজনকভাবে, এই ইলম আজ দুর্লভ। ফলে অনেক মুসলিম নারী (এবং পুরুষ) নিজ হতাশা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে নারীবাদকে।

এভাবেই শুরু হয় নারীবাদের পথে একজন মুসলিমের পথচলা।

নারী নির্যাতন যদি অসুখ হয় তাহলে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হলো এর সহজাত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অন্যদিকে নারীবাদ হলো এমন এক বিষাক্ত ওষুধ, যার ফলে রোগ হয়তো অল্প কিছুটা দূর হবে কিন্তু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় একদিকে রোগী মরার দশা হবে অন্যদিকে আরও দশটা নতুন অসুখ দেখা দেবে।

নারী নির্যাতনের বিষয়টা নারীবাদ কীভাবে উপস্থাপন করে?

নারীবাদ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'সবকিছুর মূলে হলো পুরুষতন্ত্র।' নারীবাদের বক্তব্য হলো–পুরুষ জাতটাতেই সমস্যা। যেসব নারী পুরুষতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তারাও সমস্যার অংশ। নারীবাদের মতে, পুরুষরা সহজাতভাবে নারীকে শোষণ আর নির্যাতন করতে চায়। চায় নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিতে। এটা হলো বাস্তব সমস্যা আর ন্যায্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ ভাষার ব্যবহার। আর একসময় সমস্যাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ভাষাই।

দ্বিতীয় ধাপ

প্রথম ধাপে ক্ষোভ এবং অভিযোগের কারণ ছিল কিছু পুরুষ (এবং নারীর) যুলুম। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ও ক্ষোভগুলো বাস্তবতা থেকে মোড় নেয় নানা বিমূর্ত, মতাদর্শিক দিকে।

অমুক ইসলামী কনফারেন্সে কোনো নারী বক্তাকে রাখা হয়নি কেন? অনুষ্ঠানের পোস্টারে পুরুষ বক্তাদের ছবি থাকলেও নারী বক্তাদের ছবি নেই কেন?

হিজাব নিয়ে পুরুষ ইমামরা কেন লেকচার দিচ্ছে? মুসলিম নারীরা কী পরবে সেটা নিয়ে পুরুষরা কেন কথা বলবে?

নারী ও পুরুষের সালাতের জায়গার মাঝখানে পার্টিশান কেন? আজকের যুগেও নারীপুরুষের মেলামেশায় কেন এত কড়াকড়ি? কেন নারী আর পুরুষের স্থান পৃথক হবে?

পুরুষ হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পাবার কথা মুসলিম পুরুষরা কেন স্বীকার করে না?

নারীদের কেন শালীন আর বিনম্র হতে হবে? পুরুষ কেন নারীর বিষয়ে কথা বলবে?

পুরুষরা কেন নারীবাদ নিয়ে কথা বলবে?

নারীবাদ ঢালাওভাবে পুরুষের বিরুদ্ধে শোষক ও নিপীড়ক হবার অভিযোগ তোলে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। কিন্তু যখনই কোনো পুরুষ সেটা করতে যায় তখন সেটা হয়ে যায় 'পুরুষতান্ত্রিক বয়ান'। নারীবাদের কাছে সব

প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর একটাই–পুরুষতন্ত্র। সবকিছুর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র।

প্রথম ধাপে সমস্যাগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছিল ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী নারী ও পুরুষের হক এবং যুলুম ও ইনসাফের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় ধাপে এসে আলোচনার কাঠামো গড়ে ওঠে এবং চালিত হয় পশ্চিমা নারীবাদী এবং লিবারেল অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এর প্রমাণ হলো দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা এমন অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী আইন ও শরীয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন : পর্দা, ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরা, নারী ও পুরুষের মেলামেশা; বিশেষ করে গাইর-মাহরাম পুরুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখা, ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা জানে না। যেসব বিষয়ে তারা আপত্তি তোলে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং কুরআন-সুন্নাহর দলিলের অবস্থান তাদের অজানা। এ বিষয়গুলো যখন জানানো হয় তখন তারা এগিয়ে যায় তৃতীয় ধাপের দিকে।

তৃতীয় ধাপ

এই ধাপে এসে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় ইসলামী ইলম এবং ইলমের সিলসিলাকে। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ছিল মুসলিম সমাজের বিভিন্ন আচার আর বিধিবিধান নিয়ে। তৃতীয় ধাপে এসে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে অতীত প্রজন্ম এবং আলিমগণকে।

নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী, নারীদের আজ যে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে তার মূল কারণ পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র হলো এমন এক অশুভ ব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের শোষণ করে আসছে। কাজেই নারীবাদের জায়গা থেকে এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে অতীত প্রজন্মগুলোর সময়েও পুরুষতন্ত্র ছিল এবং আজকের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল।

এমন অবস্থায় একজন নারীবাদী নিজেকে প্রশ্ন করে–

> ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে যে আলিমরা এসেছেন তাঁরা সবাই কি এই পুরুষতন্ত্রের অধীনেই ছিলেন না? পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা আর নারীবিদ্বেষের লেন্সের আলোকেই কি তাঁরা তাদের ফতোয়াগুলো লেখেননি? যে নারীবিদ্বেষ আজকের আলিমদের মধ্যে আমরা দেখি সেটা কি কয়েকশ কিংবা হাজার বছর আগের আলিমদের মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় ছিল না?

ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের যেকোনো আলিমের বই খুললে আমরা এমন অসংখ্যা অবস্থান পাব যেগুলো শরীয়াহর দিক থেকে, কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে সঠিক। কিন্তু নারীবাদের দৃষ্টিতে 'পুরুষতান্ত্রিক' এবং 'নারীবিদ্বেষী'। এ কারণেই তৃতীয় ধাপে এসে এমন অনেক নারীকে দেখা যায়, একসময় যারা খুব আগ্রহ নিয়ে ইলম অর্জনের চেষ্টা করত—হয়তো কোনো আলিমের অধীনে কিংবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে পড়ত, কিন্তু তারা যখন আলিমগণের লেখায় এমন কিছু খুঁজে পায়, যা নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী 'ভুল' বা 'ঘৃণ্য', তখন ইলম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের আলিমগণ তাদের চোখে পরিণত হয় পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূতে।

মুসলিম নারীবাদী তখন সিদ্ধান্ত নেয় সে কোনো আলিমের (অতীত কিংবা বর্তমান) কথা শুনবে না। সে সরাসরি কুরআন আর সুন্নাহর কাছে যাবে। কেবল কুরআন আর সুন্নাহই পুরুষতন্ত্রের কালো থাবা থেকে মুক্ত।

কিন্তু...

চতুর্থ ধাপ

কুরআন ও সুন্নাহয় তারা এমন অবস্থান দেখতে পায়, যা নারীবাদের মানদণ্ডে টিকে না।

- সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত[৪০]
- সূরা বাক্বারার ২২৮ নং আয়াত[৪১]
- দুই জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান[৪২]

---

[৪০] পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ করো এবং তাদের (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। [তরজমা, সূরা নিসা, ৩৪]

[৪১] এবং পুরুষদের ওপর নারীদেরও হাক আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের ওপরও হাক আছে, অবশ্য নারীদের ওপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল। [তরজমা, সূরা বাক্বারাহ, ২২৮]

[৪২] আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী রাখো। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারী, যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। [তরজমা, সূরা বাক্বারাহ, ২৮২]

- উত্তরাধিকারের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান[৪৩]
- আকল ও দ্বীনে নারীর অসম্পূর্ণতা
- জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী[৪৪]
- যদি কোনো মানুষকে সিজদাহ করার অনুমতি থাকত তাহলে স্বামীকে সিজদাহ করার হাদীস[৪৫]...

মুসলিম ফেমিনিস্ট এমন আয়াত ও হাদীসের মুখোমুখি হয়, যেগুলো নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না। কীভাবে সে নারীবাদের আদর্শের সাথে এই আয়াত ও হাদীসগুলোর সমন্বয় করবে? কীভাবে আল্লাহ্ এতগুলো আয়াত এবং হাদীস নাযিল করলেন, যেগুলো নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী নারীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই না?

মরিয়া হয়ে সে সমন্বয়ের চেষ্টা করে–

> হয়তো এই সবগুলো আয়াত আর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে। যে ওয়াহিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্পষ্টভাবে বুঝেছে, যা এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞা,

---

[৪৩] আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক।... [তরজমা, সূরা নিসা, ১১]

[৪৪] আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে মহিলা-সমাজ, তোমরা সা'দকা করতে থাকো। কারণ, আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক।
তাঁরা আরয করলেন : কী কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ?
তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর না-শোকরী করে থাকো। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ক্রটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।
তাঁরা বললেন : আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ক্রটি কোথায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ক্রটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ।' তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ক্রটি। [সহীহ বুখারী]

[৪৫] হযরত মুয়াজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদাহ করার আদেশ দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদের আদেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সিজদাহ দিতে।'-সুনানু আবি দাউদ

ভাষাগত উৎকর্ষ এবং ন্যায়ের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে—হয়তো সেটাকে গত ১০০ বছরের সেক্যুলার জেন্ডার স্টাডিস প্রফেসরদের অসংলগ্ন প্রলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে!

কিন্তু এই মনোভাব খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। চতুর্থ ধাপে পৌঁছানোর পর 'মুসলিম ফেমিনিস্ট' উপলব্ধি করে যে বৃত্তকে কখনো ত্রিভুজ বানানো যায় না। নারীবাদের সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর একমাত্র উপায় হলো কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসকে অস্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করা।

এই ধাপের নারীবাদীদের মধ্যে এমন অনেককে আপনি পাবেন যারা বলে—

আমাদের কুরআনকে না বলা শিখতে হবে।[৪৬]

এমনকি এমনও মানুষ পাবেন, যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপার কুৎসিত-সব শব্দ ব্যবহার করে, কারণ তাঁরা নাকি 'পুরুষতান্ত্রিক'! ইয়াদুবিল্লাহ!।

চতুর্থ ধাপে এসে নারীবাদীরা অবলীলায় এমন-সব কথা বলে, যা স্পষ্ট কুফর। একই সাথে এমন-সব বিষয়ের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে যেগুলো ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যেমন : জামাতের সালাতে কোনো মহিলাকে ইমাম বানানো, মুসলিম নারীর সাথে কাফির পুরুষের বিয়ে, সমকামিতার বৈধতা, ট্র্যান্সজেন্ডারিসমের পক্ষে অবস্থান, যিনা এবং ব্যভিচারকে জায়েজ মনে করা, ইত্যাদি।

এটা কীভাবে সম্ভব?

কারণ, চতুর্থ ধাপে পা দেয়া 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট এরই মধ্যে ইতিহাসের সব আলিমের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরীয়াহর চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় এবং আবশ্যক কোনো অবস্থান থাকতে পারে যা মুসলিমদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে—এটাও সে অস্বীকার করে বসেছে। যখনই কেউ বলে—আল্লাহ্ আমাদের এমনটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন—তখনই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি সাব্যস্ত করে নারীবাদীরা তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। কারণ, তাদের কাছে কর্তৃত্বের ধারণাটাও পুরুষতন্ত্রের ফসল।

খুব বেশি দিন চতুর্থ ধাপে থাকা যায় না। পরস্পরবিরোধী দুটো অবস্থান (ইসলাম

[৪৬] "Personally, I have come to places where how the text says what it says is just plain inadequate or unacceptable, however much interpretation is enacted upon it", and where particular articulations in the Qur'ān as a text are problematic, there is the **"possibility of refuting the text, to talk back, to even say "no"**. Wadud, Amina. Inside the Gender Jihad, Oxford, Oneworld (2006), p. 209

এবং নারীবাদ) একসাথে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা কাজ। এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবার পর, এমন-সব অবস্থান গ্রহণ করার পর নিজেকে মুসলিম মনে করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যুক্ত হয় 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অদ্ভুত কথাবার্তা এবং কুফরি অবস্থানের কারণে অন্যান্য মুসলিমদের কাছ থেকে আসা যৌক্তিক বিরোধিতা ও সমালোচনা। সবকিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়েও তাদের মধ্যে তিক্ততা কাজ করে।

আর তারপর...

পঞ্চম ধাপ

পঞ্চম ধাপে এসে 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়। পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়।

- আল্লাহ যদি নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সাম্যবাদী হন তাহলে নিজের ব্যাপারে কুরআনে কেন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন?
- আল্লাহ্ কেন প্রথমে আদমকে (আলাইহিস সালাম); একজন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন? কেন প্রথমে নারীকে সৃষ্টি করলেন না?
- শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন একজন পুরষ? কেন নারী নন?
- কেন আল্লাহর ওয়াহি নারীর মাধ্যমে না এসে পুরুষের মাধ্যমে এল?

জন্ম নেয় একের পর এক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের স্রোত একসময় তাকে নিয়ে যায় কুফর ও রিদ্দার অন্ধকারে। আর যে প্রশ্ন দিয়ে এ পথচলা শুরু হয়েছিল সেই প্রশ্নটাই শেষ ধাক্কা দিয়ে তাকে খাঁদে ফেলে দেয়–

> আল্লাহ্ কেন পুরুষতন্ত্রকে টিকে থাকতে দিলেন? আল্লাহ্ কেন হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন নারীকে পরাধীন এবং ধর্ষিত হতে দিলেন?

আর এই ধাপে এবং বাকি সব ধাপে নারীবাদের উত্তর একটাই–

আল্লাহ্ বলে কেউ নেই। ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্রের বানানো গল্প, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখা।

সমাপ্তি।

***

নারীবাদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মতো। একজন মানুষ যখন সবকিছুকে 'পুরুষতন্ত্র' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে তখন বাকি

ধাপগুলোতে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সব ধরনের অবিচারকে পুরুষতন্ত্রের দোষ বলে চালিয়ে দেয়ার এই ব্যাখ্যা যদিও ভুল, কিন্তু এটা একটা সর্বগ্রাসী ব্যাখ্যা। আসলে পঞ্চম ধাপে থাকা ফেমিনিস্টরা আগের ৪ ধাপের মুসলিম ফেমিনিস্টদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ। পঞ্চম ধাপের নারীবাদী তার আদর্শিক সমীকরণের চূড়ান্ত ধাপ পর্যন্ত গেছে। অন্যরা যায়নি।

নারীবাদ ও ধর্মবিদ্বেষ

পাঠক হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন—এখানে নারীবাদের কোন পর্যায় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে? হয়তো সমস্যা নারীবাদে না; বরং নারীবাদের নির্দিষ্ট কোনো সংস্করণে?

আসলে সমস্যা নারীবাদেই। সমস্যা নারীবাদের মূল আদর্শেই। একটা উদাহরণ দিই। বর্ণবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষের গায়ের রং কিংবা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ ইসলাম কোনোভাবেই মেনে নেয় না। কিন্তু পৃথিবীর সব বর্ণবাদী দলের আদর্শ কিন্তু একরকম না। ক্যু ক্লাক্স ক্ল্যান, নিও নাৎসি, অলট-রাইট—সবার আদর্শ হুবহু এক না। তাদের চিন্তায় সূক্ষ্ম তারতম্য আছে, ধরন এবং মাত্রায় আছে নানান পার্থক্য। কিন্তু শেষ বিচারে এই পার্থক্যগুলো তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ সবার মূল আদর্শ এক—বর্ণবাদ। একইভাবে নারীবাদের বিভিন্ন পর্যায় আর সংস্করণগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সবার মূল আদর্শ এক। দয়া করে কেউ আবার এটা ভেবে বসবেন না যে আমি নারীবাদকে বর্ণবাদী বলছি। আমি কেবল উদাহরণ দিচ্ছি।

নারীবাদ এমন এক আদর্শ, যার মূলনীতিগুলো মেনে নিলে এবং সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে, তা একজন মুসলিমকে ঈমানের সংকট এবং রিদ্দার দিকে নিয়ে যাবে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। কীভাবে প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে একজন মানুষ পঞ্চম ধাপের দিকে এগিয়ে যায় সেটা বুঝলে পুরো প্রক্রিয়া আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। আর এতেও যদি পাঠক সন্তুষ্ট না হন তাহলে সরাসরি নারীবাদের শেকড়ের দিকে তাকানো যেতে পারে। নারীবাদের সবচেয়ে নামিদামি তাত্ত্বিকদের বলা কথার দিকে তাকালে বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যায়। গোড়া থেকেই নারীবাদ ছিল একটা ধর্মবিরোধী মতাদর্শ। নারীবাদের প্রতিটা পর্যায়ের রথীমহারথীরা ছিল তীব্রভাবে ধর্মবিদ্বেষী।

নারীবাদের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে, সামাজিক আন্দোলন হিসেবে। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ ছিল ভোটাধিকার ও সম্পদের মালিকানাসহ বিভিন্ন আইনি অধিকার। এটাকে বলা হয় নারীবাদের ফার্স্ট ওয়েভ বা প্রথম পর্যায়। তখন থেকেই নারীবাদীরা ধর্মকে নারীর পরাধীনতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রথমদিককার নারীবাদীরা তাত্ত্বিকরা মনে করতেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল নারীঅধিকার খর্ব

করার পেছনে ভূমিকা রাখে না; বরং ধর্মই হলো নারীবিদ্বেষী বিশ্বাস ও আচার-আচরণের মূল উৎস। নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেত্রীদের একজন, সুসান বি অ্যানথনি বলেছিল-

'নারীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু হলো গির্জার বেদি'।[৪৭]

সুসান অ্যানথনি নিয়মিত ধর্মের সমালোচনা করত। ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্য অনুযায়ী সে ছিল অজ্ঞেয়বাদী। ধর্মের ব্যাপারে সে বলেছিল–

'একদিকে একের পর ক্ষুধার্ত মুখ পাঠায়, অন্যদিকে সেই মুখে তুলে দেয়ার মতো খাবার দেয় না–তাদের এই ঈশ্বর কতই-না ভয়ংকর এক জীব'![৪৮]

সুসান বি অ্যানথনি আরও বলেছিল,

'মহাবিশ্বের এমন কোনো স্রষ্টার কথা আমি ভাবতে করতে পারি না, আমার নতজানু হওয়া আর স্তুতিবাক্যের ওপর যার সন্তুষ্টি নির্ভর করে'।[৪৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেক উল্লেখযোগ্য নারীবাদী হেলেন এইচ গার্ডনার। নারীর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টধর্মের 'অপরাধ' আর নিপীড়ন' নিয়ে অনেকে লেখাজোখা ছিলেন হেলেনের। সে লিখেছিল–

'এই ধর্ম আর কিতাব (বাইবেল) নারীর কাছে দাবি করে সবকিছু। বিনিময়ে দেয় না কিছুই। এরা নারীর সমর্থন আর ভালোবাসা চায়, বিনিময় দেয় অত্যাচার, নিগ্রহ আর অবজ্ঞা ...খ্রিষ্টধর্মীয় দেশগুলোতে নারীর বিরুদ্ধে যত অত্যাচার আর নিগ্রহ হয়েছে, সেগুলোর বৈধতা দিয়েছে বাইবেল আর টিকিয়ে রেখেছে গির্জার বেদি'।[৫০]

গার্ডনারের ঘৃণা শুধু খ্রিষ্টধর্মের প্রতি ছিল না। Men, Women And Gods বইতে সে লিখেছিল–

'ধর্মগুলো যদিও অতিপ্রাকৃত উৎস থেকে আসার কথা বলে, কিন্তু আমি মনে করি এই দাবিগুলোকে যাচাই করা উচিত মানবীয় বুদ্ধির আলোকে। আমাদের সর্বোচ্চ নীতিবোধ যদি ধর্মের কোনো বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে সেই বিধান বাদ দিতে হবে। কারণ, ধর্মের একমাত্র ভালো জিনিস হলো নৈতিকতা। আর

---

[৪৭] Micmillen, Sally as cited in: 'Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movements.'

[৪৮] New York World, February 2, 1896, quoted in Harper (1898-1908), Vol. 2. Pp. 858-60

[৪৯] Ibid

[৫০] Gardener, Helen Hamilton. Men, Women, and Gods. S.I., Forgotten Books, ২০১৭

নৈতিকতার সাথে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। নৈতিকতার সম্পর্ক দুনিয়াতে সঠিক কাজ করার সাথে, আর বিশ্বাসের সম্পর্ক পরকালের অজ্ঞাত বিষয় নিয়ে। একটা হলো সময়ের চাহিদা আরেকটা চিরন্তনের স্বপ্ন। নৈতিকতার ভিত্তি হলো সর্বজনীন বিবর্তন। বিশ্বাসের ভিত্তি হলো 'ওয়াহি'। আর আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 'ওয়াহি' এসেছে তার কোনোটাই নারীর পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব না।

মুসা কিংবা কনফুশিয়াস, মুহাম্মাদ কিংবা পল, ইব্রাহিম কিংবা ব্রিঘাম ইয়াং[৫১] এসে আমাদের সামনে দাবি করে তার ধর্মমত ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। ঈশ্বর এদের কোনো একজনের সাথে বা সবার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এই ধর্মগুলো দিয়েছে কি না, তার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই। যদি তাদের ধর্মমত আমাদের নৈতিকতা, সুচিন্তা, উন্নত আদর্শ এবং বিশুদ্ধ জীবনবোধের সাথে খাপ না খায় তাহলে আমাদের ওপর এসব ধর্মের কোনো কর্তৃত্ব নেই। তাদের মধ্যে কে আছে এই পরীক্ষায় পাশ করার মতো? আজ পর্যন্ত যত 'ওয়াহি' এসেছে, তার কোনটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দাবি করতে পারে, "আমি তোমাদের সর্বোত্তম বিকাশের সমকক্ষ, আমি আজও তোমাদের সর্বোন্নত চিন্তার পথ দেখাতে সক্ষম, আমার মধ্যে এমন কোন শিক্ষা নেই, যা তোমাদের ন্যায়বিচারের বোধের সাথে সাংঘর্ষিক?" একটাও না'।[৫২]

নারীবাদের প্রথম পর্যায়ের প্রথম সারির তাত্ত্বিকদের অনেকের লেখায় ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ দেখা যায়। এদের মধ্যে ইলিসাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন তো চরম উগ্র এবং উসকানিমূলক The Women's Bible রচনার পেছনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিল। হাল আমলের কোনো মুসলিম নারীবাদী যদি 'দা উইমেনস কুরআন' লেখা শুরু করে তাহলে সেটা অভিনব কিছু হবে না; বরং তা হবে এক শ বছর আগের সেই ফার্স্ট ওয়েভ নারীবাদের অনুকরণমাত্র। মনে রাখবেন নারীবাদের পর্যায়গুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়কে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম উগ্র এবং আপত্তিকর ধরা হয়। এর পরের প্রতি প্রজন্মে নারীবাদের ধর্মবিদ্বেষ আরও বেড়েছে।

নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায় বা সেকেন্ড ওয়েভের কথাই ধরুন। বলা হয় নারীবাদের সেকেন্ড ওয়েভের শুরু ফরাসী দার্শনিক সিমন দি ব্যুভয়ার হাত ধরে। ধর্মের প্রতি তার

---

[৫১] ব্রিঘাম ইয়াং, মৃত্যু ১৮৪৭। মার্কিন ধর্মীয় নেতা এবং রাজনীতিবিদ। মর্মন ধর্মের (চার্চ অফ জিসাস ক্রাইস্ট অফ ল্যাটার ডে সেইন্টস) দ্বিতীয় নেতা। অ্যামেরিকার সল্ট লেক সিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউটাহ প্রদেশের প্রথম গভর্নর। ~ অনুবাদক

[৫২] Gardener, Helen Hamilton. Men, Women, and Gods. S.l., Forgotten Books, 2017.

বিরোধিতা সিমন প্রকাশ করেছিল এভাবে–

'পুরুষের বড় সুবিধা হলো পুরুষের লেখা নিয়মগুলোকেই ঈশ্বর বৈধতা দিয়েছে। আর পুরুষ যেহেতু নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে তাই সার্বভৌম সত্তাও যে ধর্মমতে পুরুষকেই কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, এটা বিশেষ সৌভাগ্যই বলতে হবে। ইহুদী, মোহাম্মাদান, খ্রিষ্টধর্মসহ অন্যান্য সব ধর্মে ঐশ্বরিক অধিকার বলে পুরুষই কর্তা। নিপীড়িত নারীর বিদ্রোহের যেকোনো চেতনা দমন করার জন্য স্রষ্টার ভীতি বরাবরই পুরুষের পক্ষে আছে।'[৫৩]

সেকেন্ড ওয়েভের আরেক বিখ্যাত নারীবাদী, গ্লোরিয়া স্টাইন্যাম ধর্মের ব্যাপারে বলেছিল–

'(ধর্ম) অবিশ্বাস্য মাত্রার জোচ্চুরি। ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। মৃত্যুর পরের পুরস্কারের আশায় বর্তমানে একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকা! গ্রাহক ধরে রাখার জন্য কর্পোরেশানগুলো নানা পুরস্কারের অফার দেয়, কিন্তু তারাও মরণোত্তর পুরস্কার দেয়ার বুদ্ধি বের করতে পারেনি'।[৫৪]

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে স্টাইনেমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আজকের নারীবাদের সবচেয়ে বড় সংকট কী'? জবাবে স্টেইনেম বলেছিল–

'আজকের নারীবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্চার না। আধ্যাত্মিক হওয়া এক জিনিস, ধর্ম আরেক জিনিস। ধর্ম হলো আকাশের রাজনীতি। আমার মনে হয় নারীবাদীদের ধর্মের বিরুদ্ধে আরও কথা বলা দরকার। কারণ, আমাদের নীরবতা ধর্মকে আরও শক্তিশালী করে'।[৫৫]

নারীবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এ ধর্মবিদ্বেষ আরও তীব্র হয় তৃতীয় পর্যায়ে এসে। এ পর্যায়ে এই বিদ্বেষ আবির্ভূত হয় নানান রূপে। যার একটি হলো বিভিন্ন জগাখিচুড়ি আধ্যাত্মিকতা আর বিকল্প ধর্মবিশ্বাস'-এর প্রতি ভক্তি। উইমেন, জেন্ডার এবং সেক্সুয়ালিটির প্রফেসর সুসান শ'র মতে, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন, গির্জা, সিনাগগ, মসজিদ) অবস্থার আলোকে বলা যায়,

'পুরুষতন্ত্রই পৃথিবীর কর্তৃত্বশালী ধর্ম।' আর 'ধর্মগুলো লিঙ্গের (gender) যে

---

[৫৩] Beauvoir, Simone de, and H.M. Parshley. The Second Sex. South Yarra, Vic., Louis Braille Productions, ১৯৮৯.

[৫৪] Gloria Steinem. Freedom From Religion Foundation. Ffrf.org/news/day/dayitems/item/14362-gloria-steinem. Accessed September 12, 2017.

[৫৫] Calloway-Hanauer, Jamie. "Is Religion the 'Biggest Problem' Facing Feminism Today?" Sojourners, May 6, 2015.

ধারণা দেয় তাতে সমস্যা আছে। এই সমস্যা পুরো পৃথিবীর সমস্যা। তাই আমাদের এমন এক সংস্কার দরকার (তা বিপ্লবও হতে পারে), যা পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার বেদিগুলো ভেঙে বিশ্বজুড়ে অন্তর্ভুক্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার, শান্তি এবং ভালোবাসার এক পবিত্র আশ্রম গড়ে তুলবে।'

র‍্যাডিকাল লেসবিয়ান নারীবাদী দার্শনিক ম্যারি ড্যালির মতে, ধর্ম প্রকৃতিগতভাবেই নারীকে নিগৃহীত করে। তার ওপর যুলুম করে। ড্যালির বক্তব্য অনুযায়ী–

'গির্জার কাছে নারীর সমানাধিকার চাওয়া আর কেকেকে (Ku Klax Klan) এর কাছে কালো মানুষের সমানাধিকার চাওয়া একই কথা'।[৫৬]

তার উসকানিমূলক প্রবন্ধ "Sin Big" এ ড্যালি লিখেছে,

'ইংরেজি সিন (পাপ) শব্দটি এসেছে ইন্দো-ইউরোপীয় "এস/es" ধাতুমূল থেকে। এস/es অর্থ অস্তিত্বমান হওয়া (to be)। সিন শব্দের এই উৎস আবিষ্কার করার পর আমি বুঝতে পারলাম, বর্তমান পৃথিবীর ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্র। আর পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকলে আটকা পড়া মানুষের জন্য অস্তিত্বমান হবার পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো পাপ করা (to sin)'।[৫৭]

এ লেখায় ড্যালি নারীদের পাপ করায় সাহসী হতে বলছে। কারণ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেটাকে পাপ বলা হচ্ছে, সেটাই নাকি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রতিবাদ। পুরুষতন্ত্র ধ্বংস করতে হলে ধর্মীয় বিধানগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। কারণ, ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র হলো ধর্ম। এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটাকে ধ্বংস করা মানে অন্যটাকেও ধ্বংস করা।

নারীবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো এ ধরনের কথাবার্তা দিয়ে ভর্তি। এগুলো সব একসাথে করতে গেলে কয়েক ভলিউমেও হয়তো ফুরাবে না। মুসলিম নারীবাদীদের মধ্যেও আমরা এই ধর্মবিদ্বেষ দেখতে পাই, বিশেষ করে পঞ্চম ধাপে গিয়ে। আসলে যত যাই হোক, শিষ্য তার গুরুর কাছ থেকেই শেখে...।

নারীবাদী দর্শনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং শ্লেষাত্মক মন্তব্য। নারীবাদের ইতিহাস থেকে ধর্মবিদ্বেষকে আলাদা করার উপায় নেই। একজন মুসলিম যখন এই আদর্শকে গ্রহণ করবে তখন তা অবশ্যই তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং নষ্ট করবে।

---

[৫৬] Shaw, Susan M. "Is Patriarchy The Religion of the Planet?'. The Huffington Post, October 1, 2015

[৫৭] Daly, Mary. Sin Big. The New Yorker, June 19, 2017.

বিকল্প

আগেই বলেছি, একসময় আমি ও আমার স্ত্রী নিজেদের নারীবাদী মনে করতাম। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই পথ কোন গন্তব্যে নিয়ে যাবে সেটা আমরা বেশ তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিলাম। তবু কিছু প্রশ্ন রয়ে গিয়েছিল।

অনেক নারীকে তীব্র অবিচার ও যুলুমের মুখোমুখি হতে হয়। এর সমাধান কী?

ইসলামী শরীয়াহতে নারী ও পুরুষের জন্য যে আলাদা বিধানগুলো, সেগুলোর সাথে কীভাবে ইসলামের ন্যায়বিচার এবং ইনসাফের চেতনার সামঞ্জস্য করা যায়?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করছিলাম। শুরুতে মনের মধ্যে একটু খচখচানিও ছিল। কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করলাম—হয়তো ন্যায়বিচার এবং ইনসাফের ব্যাপারে আমাদের ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন করে মূল্যায়ন করা দরকার—তখন প্রশ্নগুলোর উত্তর আসতে শুরু করল। আর এ কাজটা করার জন্য ন্যায়বিচার এবং ইনসাফের মালিকের দেয়া কাঠামোর আলোকে আমাদের ধারণাগুলো গড়ে তোলার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?

ন্যায়বিচার এবং ইনসাফের মালিক তাঁর কিতাবে আমাদের জানিয়েছেন,

> *'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সে অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করো এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত করো আর নেক বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। 'হে আমাদের রব, আর আপনি আমাদের তা প্রদান করুন, যার ওয়াদা আপনি আমাদের দিয়েছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদের অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।' অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদের তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদের আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবো এবং তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান। দেশে দেশে কাফিরদের সদম্ভ পদচারণা তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। সামান্য ভোগ, তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস, আর তা কতই-না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!'* [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১৯৩-১৯৭]

এবং তিনি বলেছেন,

'আর আমি তাদের পেছনে মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং (তা ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আর ইনজীলের অনুসারীগণ তাতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যেন ফয়সালা করে আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা করো এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়াহ ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদের এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।' [তরজমা, সূরা আল-মায়'ইদা, ৪৬-৪৮]

নারী কিংবা পুরুষ–কারও আমলকেই মহান আল্লাহ বৃথা যেতে দেবেন না এবং আল্লাহ প্রত্যেককে তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী বিচার করবেন। নারীর বিচার হবে তাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং পুরুষের বিচার হবে তাকে যা দেয়া হয়েছে সেটার ভিত্তিতে।

এটা হলো আল্লাহর নির্ধারিত ইনসাফের মানদণ্ড, যা তিনি কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ সবক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য হুবহু একই বিধান দেননি। নারী ও পুরুষকে তিনি একই বৈশিষ্ট্য দেননি, একই দায়িত্বও দেননি। আল্লাহ্ বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টি তৈরি করেছেন–জিন, ফেরেশতা, মেঘ, পাহাড়, পশু ইত্যাদি। প্রত্যেক সৃষ্টির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত করেছেন। একইভাবে আল্লাহ্ নারী ও পুরুষকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যদিও তারা 'একে অপরের অংশ'।[৫৮] তাই এই পরীক্ষার এ বিপৎসংকুল সময়ে মুসলিম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব একে অপরকে সাহায্য করা।

যে বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নারীর বিরুদ্ধে যে অবিচার এবং অন্যায়ের কারণে

[৫৮] সূরা আলে ইমরান, ১৯৫

একজন মানুষ নারীবাদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে–কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব। আর এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সারাংশ ফুটে উঠেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিচের কথায়—

> *'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি'।*[৫৯]

এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *'...মুহাম্মাদের পরিবারে কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।'*[৬০]

তবে নির্যাতন শুধু শারীরিক হয় না। অনেক নারীকে মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও গুরুতর। অনেক মুসলিম নারী মনে করেন স্বামীরা তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করেন না। তারা উপযুক্ত সম্মান পান না। অনেকের মনে হয় তারা যেন নিজের ঘরে কাজের লোকের মতো। অথচ সূরা মুজাদিলাহয় আল্লাহ্ বলেছেন–

> *'আল্লাহ অবশ্যই সে রমণীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। [তরজমা, সূরা মুজাদিলাহ, ১]*

সমস্ত সৃষ্টির মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন নারীর অভিযোগ শুনেছেন এবং কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। তাহলে একজন মুসলিম কীভাবে তার নিজের স্ত্রীর মানসিক চাহিদা উপেক্ষা করতে পারে? তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর জীবনীর দিকে তাকালে আমরা দেখি তারা নারীদের তাচ্ছিল্য, অপমান, বিদ্রূপ কিংবা অসম্মান করতেন না। সেটা তাদের স্ত্রী, সন্তান কিংবা বোন হোক। অনেক বর্ণনায় স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হবার, তাদের অধিকার পূর্ণ করার এবং ইহসানের কথা এসেছে।

এ বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক লেখা যায় এবং লেখা দরকার। আপাতত আমরা এটুকু বলি যে অবিচার দূর করার জন্য আমাদের ইসলামের শক্তির ওপর বিশ্বাস করতে হবে। 'নারীবাদী ইসলাম'-এর ওপর না। নারী ও পুরুষের মধ্যে ইনসাফ এবং আদল

[৫৯] সুনানুত তিরমিযী, ৩৮৯৫
[৬০] আবু দাউদ

প্রতিষ্ঠার উপায় হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা অনুসরণ করা। সুসান অ্যান্থনি, সিমন ডি ব্যুভয়াহ, বেটি ফ্রিডেন, গ্লোরিয়া স্টাইন্যাম, কিংবা বেলা হুকস এর সুন্নাহ অনুসরণ করা না।

সবশেষে আমি ইমাম, আলিম এবং দা'ঈদের অনুরোধ করব নারীবাদের হুমকিকে আরও গুরুত্বের সাথে নেয়ার জন্য। আমি জানি এ বিষয়ে কথা বলা অনেক সময় অস্বস্তিকর, অনেক সময় ঝামেলার। কিন্তু আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যখন আমাদের কথা বলতেই হবে। ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়া আসার আগের যুগে হয়তো এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ইসলামবিরোধী প্রচারণা আজ এত বেশি বেড়ে গেছে যে এ বিষয়গুলো আর উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। আমরা যদি এগুলো উপেক্ষা করি তাহলে ইসলাম এবং ইসলামী ইলম নিয়ে মানুষের মধ্যে যে অতৃপ্তি এবং বিভ্রান্তি দিন দিন বাড়ছে তা আরও তীব্র হবে।

যে আয়াত ও হাদীসগুলো আধুনিক পশ্চিমের মানদণ্ডে 'বিতর্কিত' কিংবা 'প্রবলেমেটিক' সেগুলো আমরা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে পারব না। আমরা চুপ থাকলেও নাস্তিক এবং লিবারেল অ্যাক্টিভিস্টরা–যাদের কাজই হলো ইসলামকে আক্রমণ করা–বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসবে। সাধারণ মুসলিমরা যখন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবে তখন বিভ্রান্ত হবে। একই সাথে তারা প্রতারিত বোধ করবে এবং এদের মধ্যে অনেকে তখন ইসলাম ত্যাগ করবে। এটা এখনই ঘটছে। বিখ্যাত মুসলিম নারীবাদীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট আর ওয়েবসাইটগুলো একনজরে ঘুরে দেখলেই ইসলামের চিরাচরিত অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরির জন্যে কী ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

তাই নারীবাদীদের ইচ্ছেমতো বিষ ছড়াতে দেয়ার বদলে আমাদের নারীবাদের ক্রিটিক এবং নারীবাদের ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এবং অ্যাকাডেমিকভাবে। নারীবাদী দর্শনকে ব্যবচ্ছেদের করার মাধ্যমে মুসলিমরা জেন্ডার রিলেশনের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষাকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে শিখবে এবং উপলব্ধি করবে যে অন্য সবকিছুর মতোই ইনসাফ এবং রাহমাহর দিক থেকেও ইসলাম শ্রেষ্ঠ।

পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব

নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করে। নারীবাদের ভাষ্যমতে পুরুষতন্ত্র এক অশুভ ব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীকে শোষণ করে আসছে। সভ্যতার শুরু থেকেই পুরুষরা এমন এক বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে, যার উদ্দেশ্য নারীকে অধীনস্থ করা, শোষণ করা, নির্যাতন করা এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

কিন্তু একটা বিষয় আমার মাথায় ধরে না, বিভিন্ন জায়গা, সময়, সমাজ ও সভ্যতার পুরুষরা কেন নারীদের পরাধীন করে রাখার জন্য, তাদের ওপর নির্যাতন আর নিপীড়ন চালাবার জন্য ষড়যন্ত্র করবে? পুরুষরা কেন নিজেদের মা, মেয়ে, স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করার জন্যে এত কিছু করবে?

কাউকে নিগৃহীত করার অর্থ কী? সে যা চায় তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা। তার প্রাপ্য তাকে না দেয়া, তার ক্ষতি করা। এমন ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীকে নির্যাতন করে। কিন্তু এটা একটা পুরো সমাজজুড়ে কীভাবে হয়? কীভাবে বৈশ্বিকভাবে হয়? হাজার হাজার বছর ধরে হয়? এটা কীভাবে সম্ভব?

নারী কি এতই বোকা?

পুরুষ কি এতই বোকা?

নিজের পরিবারে এমন একটা নীলনকশা বাস্তবায়ন করা পুরুষের অবস্থান থেকে অযৌক্তিক। নিজ পরিবারের নারীদের নির্যাতন করা, ক্রমাগত তাদের বঞ্চিত করা পুরুষের জন্য লাভজনক না। কোনো পরিবার এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। যেসব পরিবারের কর্তারা স্বৈরাচারের মতো আচরণ করে সেগুলো কখনোই টেকসই হয় না। সবাই পালানোর পথ খোঁজে। পরিবার একটা সামষ্টিক কাঠামো। ক্রমাগত যুলুম করে গেলে এই কাঠামো কার্যকরী রাখা তো যায়ই না, টিকিয়েও রাখা যায় না। এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি কি পুরুষের নেই? নাকি কেবল আধুনিক মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে, বাকি সব যুগের মানুষ গর্দভ ছিল?

উল্টো দিক থেকে চিন্তা করুন। নারীবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী, আবহমানকাল থেকে

নারী ভিকটিম। শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ জুড়ে সে কেবল পুরুষের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। এই ধারণা কি নারীজাতির সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি অপমানজনক না? পুরো মানব-সভ্যতাজুড়ে নারীরা এতই বোকা, এতই মূর্খ এবং এতই দুর্বল ছিল যে তারা এই নির্যাতন সয়ে গেছে। নিজেদের নির্যাতিত মনে করেনি, নির্যাতন বন্ধের চেষ্টাও করেনি। কিন্তু আধুনিক বুদ্ধিমান নারীবাদীরা এসে এই পুরুষতন্ত্রের বাস্তবতা ধরতে পেরেছে।

এ ধরনের ধারণা কি আদৌ যৌক্তিক মনে হয়? মানুষকে শোষণ করা কি খুব সহজ কোনো কাজ? মোটেই না। এটা আসলে বেশ কঠিন একটা প্রক্রিয়া। পুরুষতন্ত্রের অবস্থান থেকে বিষয়টা একবার দেখার চেষ্টা করুন। আজকের আরব বিশ্বের দিকে তাকান। সেখানকার স্বৈরাচার শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতা কীভাবে টিকিয়ে রেখেছে?

ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, সম্পদ, শ্রম, তাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ, ক্রমাগত প্রপাগ্যান্ডা, মানুষের ওপর নজরদারি–জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার জন্য করতে হচ্ছে নানান কসরত। আজ প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরে এই শাসকেরা ক্ষমতায়। তবু দেখুন কী পরিমাণ প্রতিরোধের মুখোমুখি তাদের হতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ আর অশান্তি হচ্ছে। ওরা জানে একটু ঢিল দিলে, একটু অমনোযোগী হলে প্রাসাদ থেকে ওদের জায়গা হবে সোজা রাস্তার পাশের নর্দমায়। তাই প্রতিনিয়ত এই শোষণ আর যুলুমের কাঠামো তাদের টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হচ্ছে। পুরো বিশ্বের ইতিহাসজুড়েই এমনটা দেখতে পাবেন। শোষণ এবং নির্যাতন সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। একে টিকিয়ে রাখতে খরচ করতে হয় প্রচুর শক্তি ও সম্পদ। তারপরও শেষ রক্ষা হয় না। ক্ষমতা অনির্দিষ্টকাল টিকিয়ে রাখা যায় না। একসময়-না-একসময় মযলুম প্রতিশোধ নেয়ই। কাজেই হাজার হাজার বছর ধরে চলা অত্যাচারী পুরুষতন্ত্রের এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য না।

প্রথমত, পুরুষরা নিজেদের এমন পরিস্থিতিতে কেন ফেলবে? নিজের শয্যাসঙ্গিনীদের সাথে দ্বন্দ্ব চালিয়ে যাওয়া, ক্রমাগত সংঘাতের মাধ্যমে তাদের 'বিদ্রোহ' দমন করে পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা–এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা কেন যাবে?

দ্বিতীয়ত, আসলেই যদি এমন কোনো কাঠামো থেকে থাকে তাহলে সেই কাঠামো টিকিয়ে রাখার মতো সম্পদ, উপকরণ, কোথা থেকে আসবে? পরিবারের অর্থ, সম্পদ, তথ্য, ইত্যাদি স্ত্রী-র কাছ থেকে সব সময় সরিয়ে রাখা তো অনেক কঠিন হবার কথা। বিচ্ছিন্নভাবে এটা হয়তো হতে পারে, কিন্তু সিস্টেম্যাটিকভাবে, বৈশ্বিক মাত্রায় এটা কীভাবে করা সম্ভব?

ঐতিহাসিক সত্য হলো পরিবার ও সমাজে নারীপুরুষ সব সময় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু পরিবারে নারীর ভূমিকা এক প্রাচীন ষড়যন্ত্রের অংশ, যার উদ্দেশ্য নারীকে শোষণ করা—এই বক্তব্য শুধুই আধুনিক নারীবাদের। পরিবারে নারী ও পুরুষের ঐতিহ্যগত ভূমিকা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক—এ কথা শুধু নারীবাদীরাই এনেছে। কিন্তু তাদের এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। শিশু লালনপালন ও তাদের শিক্ষা দেয়া নারীর ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা বা কৃষিকাজ করা পুরুষের। এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে কেন অন্যটার তুলনায় মৌলিকভাবে দুর্বল গণ্য করা হবে এবং কিসের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানা হবে, সেটা পরিষ্কার না।

ব্যাপারটা এভাবে বলা যায়—

নারীবাদীরা বলতে চায় পুরুষরা অন্য পুরুষদের সাথে ষড়যন্ত্র করে নিজের পরিবারের সদস্যদের (মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী) শোষণ করার কাঠামো তৈরি করেছে। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপার আমরা যা জানি, তার সাথে এই দাবি মেলে না।

আপনি যদি একজন নারী হন, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো—আপনার বাবা, ভাই, সন্তান কিংবা স্বামী কি আপনার স্বার্থের ওপর অপরিচিত কিছু পুরুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে কারণ, 'পুরুষরা সব ভাই ভাই?"

উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনার বাবা, ভাই, সন্তান কিংবা স্বামী সম্ভবত মানসিকভাবে অসুস্থ সাইকোপ্যাথ। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ পুরুষ এমন না। বাকি পুরুষদের সাথে মিলে দুনিয়ার সব নারীকে শোষণ করার ষড়যন্ত্র তারা করে না; বরং নিজের পরিবারের জন্য, পরিবারকে রক্ষার জন্য, পরিবারের স্বার্থের জন্য তারা জীবনভর কাজ করে যায়।

আপনি যদি পুরুষ হন, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন—

কিছু অপরিচিত পুরুষের জন্য আপনি কি নিজের মা, মেয়ে, বোন কিংবা স্ত্রীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবেন?

উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনি সম্ভবত মানসিকভাবে অসুস্থ সাইকোপ্যাথ। নারীদের শোষণ করার বৈশ্বিক কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ না।

নারীবাদ কি মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের কারণ?

নিঃসন্দেহে। এর অসংখ্য প্রমাণ আছে। নারীবাদ কীভাবে মুসলিম নারীদের ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায় সেটা বোঝা আসলে কঠিন না। নারীবাদ লিবারেল-সেক্যুলার দর্শনের অংশ। লিবারেল-সেক্যুলারিসম ধর্মকে আক্রমণ করে। নারীবাদও ধর্মকে আক্রমণ করে। ইনফ্যাক্ট, ধর্মকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে লিবারেল-সেক্যুলারিসমের প্রধান হাতিয়ারগুলোর অন্যতম হলো নারীবাদ। যেসব মুসলিমরা নারীবাদী ধ্যানধারণা রাখে তাদের যে ইসলামের ব্যাপারে অনেক, অনেক আপত্তি থাকবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

কাজেই মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের পেছনে নারীবাদের ভূমিকা নেই বলাটা হাস্যকর। কালোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের ঘৃণার পেছনে বর্ণবাদী আদর্শের কোনো ভূমিকা নেই বলাটা কি হাস্যকর না? যে বলে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের আদর্শ আর তাদের বর্ণবাদী ঘৃণার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, সে আসলে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কী, তা-ই বোঝে না।

নারীবাদকে সমর্থন করা মুসলিমদের অবস্থাও অনেকটা এ রকম। মুসলিমদের ঈমানের ওপর নারীবাদের ক্ষতিকর প্রভাব তারা অস্বীকার করতে চায় কারণ তারা নারীবাদের ইতিহাস জানে না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, নারীবাদ কী? তারা আপনাকে স্কুল-কলেজে শেখা কিংবা পত্রিকার পাতা থেকে মুখস্থ করা কোনো উত্তর শুনিয়ে দেবে। যখন নারীবাদের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করবেন, তখন জনপ্রিয় কিছু বই কিংবা গবেষণার কথা তোতাপাখির মত আওড়ে যাবে। এটা অনেকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ব্রিটেনের সরকারি কর্মকর্তাদের লেখাজোখা পড়ে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে জানার মতো। সে আপনাকে রেললাইন আর সতীদাহ প্রথার কথা শোনাবে কিন্তু নীলচাষ, গণহত্যা, জালিওয়ানওয়ালাবাগের কথা এড়িয়ে যাবে। বাস্তবতা হলো ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামকে আক্রমণ করার জন্য লিবারেল-সেক্যুলারিসম যেসব অস্ত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে নারীবাদ তার অন্যতম।

নারীবাদী আর তাদের সমর্থক পুরুষরা যেসব মুখস্থ উত্তর দেয় সেগুলো নিয়ে কিছু

কথা বলি। ওরা বলে, নারীবাদের কারণে মুসলিম নারীরা ইসলাম ত্যাগ করছে না। তারা ইসলাম ত্যাগ করছে মুসলিম পুরুষদের দুর্ব্যবহার আর অত্যাচারের কারণে। এই ধরনের কথা যারা বলে তারা সাধারণত নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে তিন ধরনের প্রমাণ আনে–

১। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা শোনা কথা। (আমি শুনেছি, আমার চেনা একজন, ইত্যাদি)

২। মসজিদে নারীর কম উপস্থিতি।

৩। মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অনুপস্থিতি।

লক্ষ করুন, মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া অনেক নারী আজ কেন ইসলাম নিয়ে হতাশ, তার কোনো ব্যাখ্যা এসব 'প্রমাণ' থেকে পাওয়া যায় না। যেহেতু আজ আগের চেয়ে বেশি নারী ইসলাম ত্যাগ করছে তাই ওপরের যুক্তি অনুযায়ী এখন ১,২,৩ এর পরিমাণ বেশি হবার কথা। অর্থাৎ আগের চেয়ে এখন বেশি মহিলা ঘরে নির্যাতিত হচ্ছে, মসজিদে আগের চেয়ে কম নারী আসতে পারছে এবং নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের সংখ্যা আগের তুলনায় কমছে। কিন্তু এর কোনোটাই সত্য না। ৫, ১০, ২০, ৫০ কিংবা ১০০ বছর আগের চেয়ে আজ নারী নির্যাতন বেশি হচ্ছে–এমন কোনো প্রমাণ নেই; বরং নারীবাদীদের যুক্তি অনুযায়ী নারী নির্যাতন এখন কম হবার কথা। কারণ, 'নারীবাদের আলো' পাবার সৌভাগ্য আগের প্রজন্মগুলোর হয়নি, কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম নারীবাদের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখেছে। তাই আজকের চাইতে আমাদের বাপদাদাদের প্রজন্মে নারী নির্যাতন বেশি হবার কথা। আর আমাদের মা-দাদিদের প্রজন্মে ইসলাম ত্যাগের হারও বেশি হবার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের প্রজন্মে ইসলাম নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজ আছে। কাজেই অত্যাচার বেশি হচ্ছে তাই বেশি নারী ইসলাম ত্যাগ করছে, এই কথার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

একইভাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে মসজিদে এবং নেতৃত্বের অবস্থানে আজ নারীদের উপস্থিতি বেশি (এটা ইসলামের দিক থেকে ভালো না মন্দ, সেটা ভিন্ন আলোচনা)। নারীবাদীরাও এটা স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে না, নারীর 'ক্ষমতায়নের' কৃতিত্বও তারা দাবি করে। যদি মসজিদ কিংবা নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অনুপস্থিতি ইসলাম ত্যাগের কারণ হয় তাহলে আজ সেই হার কি কম হবার কথা না? অথচ সেটা বাড়ছে। কেন?

আমরা বরং দেখছি একদিকে মসজিদে ও নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের উপস্থিতি বাড়ছে অন্যদিকে ইসলাম ত্যাগের হারও বাড়ছে। কেবল সমানুপাতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু বলা যায়, নারীদের ইসলাম ত্যাগ বন্ধ করার জন্য আমাদের উচিত

নারীবাদের আবির্ভাবের আগের সময়টাতে ফিরে যাওয়া।

সত্যি করে বলুন তো, আপনার চেনা কয়জন নারী কয়েক বছর আগে ধার্মিক কিংবা নিদেনপক্ষে ধর্মভীরু ছিল, কিন্তু এখন নারীবাদী বুলি আওড়ায়? শরীয়াহ, উলামা আর ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করে?

আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক বোন আছেন যারা স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নারীবাদী চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বে থাকা মুসলিম নারীদের অবস্থান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। যে দাবি করে নারীবাদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই সে কল্পজগতে আছে।

প্রশ্ন হলো, ইসলাম ত্যাগের কারণ তাহলে কী? শালীনতা এবং নম্রতা হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যা কী? ঈমান হারানোর কারণ কী?

নারীবাদী তত্ত্বের প্রথম ভিত্তি হলো নারী এবং পুরুষের মধ্যে সবকিছু সম্পূর্ণ এক হতে হবে। এই মূলনীতি মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের অনেক কিছুই মেনে নেয়া সম্ভব না। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সমান না। ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা নির্ধারণ করে।

কোন মুসলিম নারী যখন মনে করে নারীর পোশাকের ব্যাপারে বিধিবিধান আসলে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার কূটকৌশল–তখন সে অবশ্যই ওই ধর্মের প্রতি নেতিবাচক ধারণা রাখবে, যে ধর্ম শালীনতা এবং নম্রতার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং কঠোরভাবে পর্দার বিধান মেনে চলাকে বাধ্যতামূলক করে। যখন কোনো মুসলিম নারী মেনে নেয়, নারীকে অধীনস্থ করে রাখার জন্য পুরুষরা ইতিহাসজুড়ে পুরুষতন্ত্র নামের এক বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে, তখন সে তো ওই ধর্মকে মেনে নিতে পারবে না, যে ধর্ম শিক্ষা দেয়—

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৩৪]

আর অতীত এবং বর্তমানের আলিমদের অধিকাংশ পুরুষ। কাজেই নারীবাদের আদর্শে দীক্ষিত কেউ ইসলামকে মেনে নিতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক।

তবে এর দায় শুধু নারীদের না। যেসব পুরুষ (বিশেষ করে ধার্মিক পুরুষ) নারীবাদী বিভিন্ন ধ্যানধারণা প্রচার এবং সমর্থন করে, তাদের ওপরও এর দায় বর্তায়। এই ধরনের পুরুষরা ক্রমাগত বলে, 'মুসলিম পুরুষরা হলো আবর্জনা।' সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়টা

হলো এরা নারীবাদী ধ্যানধারণার একধরনের ধর্মীয় বৈধতা তৈরির চেষ্টা করে। এদের কারণেই নারীবাদের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। যখনই কেউ নারীবাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে, এই পুরুষরা অর্থহীন চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। ভুল যুক্তি, ফ্যালাসি আর ব্যক্তি আক্রমণের পসরা খুলে হাজির হয়।

এই ধরনের পুরুষরা, বিশেষ করে পশ্চিমের অনেক দাঈরা, সমস্যার অংশ। এই লোকগুলোর সমর্থন না থাকলে মুসলিম নারীবাদ নামের বস্তু অনেকে আগেই মুখ থুবড়ে পড়ত।

পুরুষতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক

২০১৫-তে নারীবাদ নিয়ে এক বিতর্কে অংশ নেয়ার প্রস্তাব এসেছিল। বিতর্ক হবার কথা ছিল আমাদের এলাকার এক মসজিদে। অনুষ্ঠানের মাসখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয়া হলো। কেন হলো, তা আজ পর্যন্ত আমাকে জানানো হয়নি। আয়োজকরা কেন এই বিতর্ক বাতিল করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত কাদের ছিল, আমার জানা নেই। এ রকম ঘটনা আগেও হয়েছে। আমার ধারণা সামনে আরও হবে।

বিতর্কের প্রস্তুতি হিসেবে আমি কিছু নোটস তৈরি করেছিলাম। সেই নোটস অনুযায়ী আমার মূল অবস্থান সংক্ষিপ্তভাবে নিচে তুলে ধরছি। এ অবস্থানকে অনেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য এমনকি আপত্তিকরও মনে হয়, তা তো বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আমি মনে করি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা দরকার। অনেক প্রশ্নকে আজ অস্বস্তিকর, কিংবা অসুবিধাজনক মনে হয়, কিন্তু ইসলামের এবং মুসলিমদের স্বার্থে এ প্রশ্নগুলো তোলা জরুরি। যেসব ধ্যানধারণার প্রভাবে মুসলিমরা সন্দেহ এবং সংশয়ে পড়ছে– সেগুলো নিয়ে অবশ্যই অ্যাকাডেমিকভাবে আলোচনা করার সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই আলোচনাগুলো হোক এটা অনেকে চান না। যারা এ প্রশ্নগুলো তোলে, তাদের কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় না।

যাই হোক, আমার ইচ্ছা ছিল ওই বিতর্কে নারীবাদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক বিভিন্ন যুক্তিতর্ক তুলে ধরার। বিশেষ করে নারীবাদীদের নিজেদের লেখা থেকে বিভিন্ন বিষয় দেখানো। এ ছাড়া নারীবাদীরা হিংস্রভাবে মুসলিম আলিমদের আক্রমণ করে, তাই আলিমদের সমর্থনেও আমি কিছু কথা প্রস্তুত করেছিলাম।

এমন কিছু পয়েন্ট এখানে তুলে ধরছি।

নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুর সময় থেকে একটা ধারণা বেশ প্রচার পেয়েছে। ধারণাটা সংক্ষেপে এ রকম–

> প্রত্যেক সমাজে কিছু ক্ষমতার সম্পর্ক এবং লেনদেন থাকে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণি, বর্ণ এবং গোত্রের মতো দুই লিঙ্গের মধ্যেও থাকে ক্ষমতার বোঝাপড়া।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি এবং রাজনৈতিক শক্তি যেমন একে অপরের সাথে শক্তির জন্য প্রতিযোগিতা করে, তেমনি নারীপুরুষও শক্তির জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে। আর এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক সমাজে শক্তির একটা ভারসাম্যহীনতা আছে। প্রত্যেক সমাজে পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে। নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের এই কাঠামোটা হলো পুরুষতন্ত্র।

নারীবাদের ভাষ্য অনুযায়ী—পুরুষ যে সব সময় সচেতনভাবে নারীকে শোষণ করার চেষ্টা করছে, তা না। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এমনটা হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। বর্তমানে এই কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রকাশ্য। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে এমন এক অনমনীয় কাঠামো তৈরি হয়েছে, যা নারীদের শোষণ করছে। তাই নারীবাদ বলে, এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এই কথাগুলো ধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। নারীবাদীরা মনে করে প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগুরুরা পুরুষতান্ত্রিক এবং তারা নারীর প্রতি দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে।

এ ক্ষেত্রে মুসলিম নারীবাদীরা কিছুটা আপত্তি করে। তারা বলে স্রষ্টা পুরুষতান্ত্রিক নন। নারীকে তিনি পুরুষের অধীন করতে চান না। ইসলাম সাম্যবাদী ধর্ম। ইসলাম নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের ধর্ম। সমস্যা হলো, মুসলিম পুরুষরা ইসলামকে পড়েছে পুরুষতান্ত্রিক চোখে। এভাবে তারা ইসলাম পড়েছে, বুঝেছে, শিখেছে এবং শিখিয়েছে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে এমন বিভিন্ন বিধান আর প্রথা তৈরি হয়ে গেছে যেগুলোর মাধ্যমে মুসলিম নারীকে শোষণ করা হচ্ছে।

এই অবস্থান থেকে মুসলিম নারীবাদীদের মধ্যে একেকজন একেকদিকে আলোচনা নিয়ে যায়।

বহুবিবাহ কি ইসলামের অংশ নাকি পুরুষতান্ত্রিক সংযোজন?

নারীর ব্যাপারে কিছু কিছু হাদীস কি সত্যিকারের ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে, নাকি এগুলো পুরুষতন্ত্রের বানানো?

নারীদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমগণ যেসব কথা বলেছেন সেগুলোতে কি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে? নাকি পুরুষতন্ত্রের লেন্সের কারণে তাদের বিবেচনাবোধ প্রভাবিত হয়েছে?

ইসলামের এমন শত শত দিক আছে, যা আধুনিক নারীবাদের চোখে সমস্যাজনক। নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী ইসলামের এই দিকগুলো প্রমাণ করে ইসলাম নারীকে পরাধীন করে এবং শোষণ করে কিংবা নিদেনপক্ষে বঞ্চিত করে।

এ ধরনের বিষয়গুলো মুসলিম নারীবাদীদের জন্য সংকট তৈরি করে। যেহেতু তারা দাবি করে ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দেয়–তাই এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করার বিভিন্ন উপায় তাদের বের করতে হয়।

আমার মতে নারীবাদ–সেক্যুলার কিংবা মুসলিম–ভ্রান্ত। লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে সামাজিক সংঘর্ষের এই ধারণা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রমাণের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কেবল নারীদের অধীন করে রাখার জন্য পুরুষরা একটা বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করেছে ও টিকিয়ে রেখেছে–এ দাবির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মানদণ্ডেও এই দাবি টেকে না।

হ্যাঁ, ইতিহাসে প্রায় সব সমাজ ও সভ্যতায় কর্তৃত্ব ছিল পুরুষের হাতে, সত্য। কিন্তু এই কর্তৃত্ব ছিল নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ–সবার কল্যাণের জন্য। নারীকে অধীন করে শুধু পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য না।

নারীবাদীদের যে অবস্থানগুলোর কথা এতক্ষণ বললাম সেগুলো সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কেউ যখন বিশ্বাস করে ১৪০০ বছরের ইসলামী ইলমের সিলসিলা পুরুষতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবিত, তখন তার ঈমানের ওপর এর প্রভাব কেমন হবে? অতীত ও বর্তমানের সব সমাজ পুরুষতন্ত্র দ্বারা আক্রান্ত, এমন দাবির জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য কী? এ থেকে মানবপ্রকৃতি এবং মানুষের স্রষ্টার ব্যাপারে কী উপসংহার পাওয়া যায়? নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, পারিবারিক সহিংসতাসহ যে সমস্যাগুলো মুসলিম সমাজে আছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা হিসেবে নারীবাদের এই পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব কতটা উপযুক্ত?

এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো–দুনিয়ার সব পুরুষ মিলে নারীকে শোষণ করার এক বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করেছে–নারীবাদের দেয়া এই পুরুষতান্ত্রিক তত্ত্ব একজন মুসলিমের ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই তত্ত্ব সব ধর্ম এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে পুরুষতন্ত্রের অংশ মনে করে। যারা অর্থ দাঁড়ায় ধর্ম হলো নারীকে অধীন বানিয়ে রেখে পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির আরেকটা উপকরণমাত্র।

এমন কথা যারা বিশ্বাস করে তারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবে এবং একসময় ইসলাম ত্যাগ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই মুসলিম নারীদের মধ্যে এই বিষাক্ত আদর্শের প্রচার হতে দেখা হতাশাজনক। নারীবাদ এবং এর সব সংস্করণ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলিম নারীবাদীরা দ্বিমত পোষণ করতে পারে, কিন্তু তাতে বাস্তবতা বদলায় না। এই সাংঘর্ষিকতা খুব সহজে প্রমাণ করা যায়।

নারীবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ—

ক) দর্শন হিসেবে নারীবাদকে গ্রহণ করতে হলে আগে নারীবাদীদের প্রিয় 'পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব' (Patriarchal Thesis)-কে মেনে নিতে হবে। পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব হলো এই বিশ্বাস যে—সভ্যতার শুরু থেকেই পুরুষরা এমন এক বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে, যার উদ্দেশ্য নারীকে অধীন করা, শোষণ করা, নির্যাতন করা এবং তার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

খ) 'পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব' মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এ দুয়ের মধ্যে কোনোভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব না।

গ) সুতরাং নারীবাদ মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

পুরুষতান্ত্রিকতার তত্ত্ব কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষাক্ত?

১) পুরুষতান্ত্রিকতার এই তত্ত্ব নবুওয়্যাতের ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। সব নবী-রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পুরুষ ছিলেন। তবে ইবনু হাযমসহ আরও কয়েকজন আলিম বলেছেন নারীদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়াহি পেয়েছিলেন। অল্প কয়েকজনের এ মতকে যদি আমরা গ্রহণও করি তাহলেও উপসংহার হলো, অধিকাংশ, প্রায় ৯৯% নবী-রাসূল ছিল পুরুষ। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। যদি পুরুষতন্ত্র তত্ত্বকে আমরা মেনে নিই, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) কি নারীর ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করার জন্য তৈরি এই বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ ছিলেন?

২) পুরুষতান্ত্রিকতার তত্ত্ব আলিমদের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ইসলামী ইতিহাসের অধিকাংশ আলিম ছিলেন পুরুষ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মানিতরা ছিলেন পুরুষ। তাদের সবারই এমন অনেক অবস্থান ছিল যেগুলো আধুনিক নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী 'চরম মাত্রার বিষাক্ত নারীবিদ্বেষী পুরুষতান্ত্রিক বাকওয়াস' ছাড়া আর কিছুই না।

এসব আলিম ও ইমামগণ কি নারীর ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করার জন্য তৈরি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ ছিলেন?

৩) 'পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব' ইসলামী আকীদাহকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। পুরুষতন্ত্র যদি মানবজাতির জন্য এত বিপুল পরিমাণ দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, এতই বিষাক্ত, ধ্বংসাত্মক এবং গভীরে প্রোথিত সমস্যা হয়ে থাকে—তাহলে কুর'আনে কেন এ নিয়ে কিছুই বলা হলো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন এ বিষয়ে কিছু বললেন না? নারীবাদীদের মতে মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে

খারাপ শক্তিগুলোর মধ্যে পুরুষতন্ত্র অন্যতম। অথচ এই মারাত্মক বিষয়টার বর্ণনা দেয়ার মতো একটা শব্দও কেন আরবী ভাষায় নেই? মানবজাতিকে এই ভয়ংকর অভিশাপ, শোষণ আর নির্যাতনের ব্যাপারে সতর্ক করে একটি আয়াত, এক লাইন হাদীসও এল না কেন?

এই নিয়মতান্ত্রিক শোষণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ যদি নিশ্চুপ থাকে, তাহলে কীভাবে কুরআন ও সুন্নাহকে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা মনে করা সম্ভব?

যৌক্তিকভাবেই একজন ফেমিনিস্টের মনে ইসলামের ব্যাপারে এই প্রশ্নগুলো উদয় হতে বাধ্য। আর এ কারণেই নারীবাদীরা বিভ্রান্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে এবং একপর্যায়ে এদের অনেকেই ইসলাম ত্যাগ করে।

শুরুটা হয় 'অশুভ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লালনের কারণে' ইসলামী ইতিহাসের আলিমদের ত্যাগ করা দিয়ে। তারপর তারা নবী-রাসূলগণকে (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আক্রমণ করা শুরু করে। যেমন আমিনা ওয়াদুদ নামের এক মহিলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-কে নিয়ে কটূক্তি করেছে। তারপর তারা খোদ কুরআনের সমালোচনা করা শুরু করে–

- আল্লাহ কেন কুরআনে নিজের ব্যাপারে পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করলেন?
- কেন আল্লাহ প্রথমে আদমকে, একজন পুরুষকে, সৃষ্টি করলেন?
- কেন আল্লাহ সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত নাযিল করলেন?[৬১]

পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব নারীবাদের আদর্শিক ভিত্তিপ্রস্তর। আর এ তত্ত্ব সহজাতভাবেই একজন মুসলিমের মধ্যে বিশ্বাসের বিপর্যয় তৈরি করে। ফলে অনেক মুসলিম নারীবাদী ধাপে ধাপে নানা গোমরাহীপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করা শুরু করে, একসময় তাদের অনেকেই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদে পরিণত হয়।

যারা দাবি করে ইসলাম ও নারীবাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব, তারা দয়া করে ওপরের তিনটি পয়েন্টের জবাব দেবেন। আপনাদের হাতে সম্ভাব্য উত্তর সীমিত। ব্যাপারটা আরেকটু সহজ করার জন্য সম্ভাব্য উত্তরগুলোর লিস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি।

---

[৬১] পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ করো এবং তাদের (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। [তরজমা, সূরা নিসা, ৩৪]

আপনি বলতে পারেন–

১) পুরুষতান্ত্রিকতার তত্ত্বে বিশ্বাস না করেও–অর্থাৎ সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই নারীকে অধীন ও শোষণ করার জন্য পুরুষতন্ত্র কাজ করছে–এ তত্ত্বে বিশ্বাসী না হয়েও নারীবাদী হওয়া সম্ভব, অথবা,

২) পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব আসলে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।

কোনটা বেছে নেবেন?

সংস্কারপন্থী, প্রগতিবাদী এবং হাদীস অস্বীকারকারী জাতীয় যেসব লোক আছে; ইসলামী ইতিহাসের আলিমদের সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে যাদের সমস্যা নেই, তারা দু-নম্বরকে বেছে নেবে। কিন্তু সঠিক আকীদাহর ওপর থাকা সাধারণ মুসলিমরা এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত ইলমী সিলসিলা ছাড়া আমরা কুরআন পেতাম না, সুন্নাহ পেতাম না, ইসলাম সংরক্ষিত হতো না–যেহেতু সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন, হাদীস বর্ণনাকারী, আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, এবং ফকিহদের প্রায় ৯৯% পুরুষ।

যদি আলিমদের ছুড়ে ফেলেন, তাহলে ইসলামকেও ছুড়ে ফেলতে হবে। আলিমরা নবীদের (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ওয়ারিশ। যদি কেউ দাবি করে, সারা বিশ্বজুড়ে ইসলামের আলিমরা সিস্টেম্যাটিকালি নারীর বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁরা নারীদের ব্যাপারে না-ইনসাফি করেছেন–তাহলে সে আলিমদের নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং কার্যত ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আমার মতে এটা নারীবাদ ও ইসলামের সহজাত সংঘর্ষের একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা। কেউ দ্বিমত পোষণ করলে যৌক্তিক খণ্ডন উপস্থাপন করতে পারে। তবে আবেগ ও বুলি-সর্বস্ব ন্যাকামি, অ্যাড হমিনেম ঘ্যানঘ্যানানি আর রূপকথার রাজপুত্রসুলভ অভিনয় গ্রাহ্য করা হবে না।

***

বি.দ্র. কিছু অস্পষ্টতা দূর করা যাক।

অবশ্যই পুরুষতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে। অ্যানথ্রোপোলজিকাল বা নৃতাত্ত্বিক অর্থে ইসলাম একটি পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম। ইসলামী আইনে বংশপরিচয় নির্ধারিত হয় পিতৃপরিচয় দ্বারা। সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে, সেটা গোত্রপতি, স্বামী, পিতা কিংবা অন্য কোনো পুরুষ হতে পারে। কিন্তু নারীবাদের প্রচারিত 'পুরুষতন্ত্র'-এর ধারণা আর অ্যানথ্রোপোলজিকাল বা নৃতাত্ত্বিক অর্থে পুরুষতন্ত্রের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। নারীবাদ দাবি করে এ সবগুলো কাঠামো সহজাতভাবে নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ।

নারীবাদীদের দাবি হলো, পুরুষ এসব পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলেছে নারীর স্বার্থের বিনিময়ে পুরুষের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য। অর্থাৎ, নিষ্পাপ, সাদাসিধে, দুর্ভাগা নারীদের আটকে রেখে শোষণ করার জন্য একদল শয়তান লোক ক্রমাগত চক্রান্ত করে চলেছে। সভ্যতার শুরু থেকে এই চক্রান্ত চলে আসলেও মাত্র কয়েক দশক আগে নারীবাদীদের কল্যাণে এই কাপুরুষোচিত মহা-ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়েছে। সেই থেকে পুরুষতন্ত্র নামের এই শয়তানী চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্যে দুঃসাহসী নারীবাদীরা খেয়ে-না-খেয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে? হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আরেকটা মুসলিম প্রজন্ম যেন এই বিষাক্ত আদর্শের কারণে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য নারীবাদের আবিষ্কৃত এই পুরুষতন্ত্র তত্ত্বের খণ্ডন করা মুসলিম চিন্তাবিদ, দাঈ এবং আলিমদের দায়িত্ব।

এটা করার বিভিন্ন উপায় আছে। প্রথমত, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এমন অনেক পুরুষ আছে, যারা নারীদের ওপর নির্যাতন চালায়। এমন অনেক সামাজিক প্রথা, আচার আছে, যা নারীর সাথে যুলুম করে। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এসব যুলুমকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। পারিবারিক সহিংসতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, নিজ ঘরে এবং সমাজে নারীর মতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন বিষয় এড়িয়ে যাওয়া বা ধামাচাপা দেয়া–এসবই বাস্তব। এই যুলুম এবং না-ইনসাফীগুলোর অস্তিত্ব আছে এবং সব সমাজেই এগুলোর বিরুদ্ধে কথা হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করতে হবে এই সমস্যাগুলোর কারণ কি পুরুষতন্ত্র নামের কোনো কাল্পনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব? দুনিয়ার সব পুরুষ মিলে গোপনে চক্রান্ত করে এসব করছে? নাকি এগুলোর কারণ হলো কিছু স্বার্থপর, অজ্ঞ, নির্যাতনকারী মানুষ—যারা পুরুষ?

শরীয়াহ কি স্বামীর জন্য স্ত্রীকে নির্যাতন করা সহজ করে দেয়?

প্রশ্ন–ইসলামী শরীয়াহ স্ত্রীকে নির্যাতন করা কেন সহজ করে দেয়?

উত্তর–আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, মুসলিম দেশগুলোতে বিদ্যমান বিভিন্ন আঞ্চলিক কুসংস্কার, প্রথা, জাহেলি সামাজিক সংস্কার এবং আচার মিলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে একজন অত্যাচারী স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর যুলুম করা, তার হক্ক নষ্ট করা এবং নির্যাতন করা সহজ। এ কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সঠিক না।

যখন ইসলামী শাসন ছিল, সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ছিল এবং সামাজিক কাঠামো ভিন্ন ছিল তখন নির্যাতন, যুলুম এবং হক্ক নষ্ট করার ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। অতীতে পরিবার এবং সামাজিক বন্ধন ছিল বিস্তৃত। পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী। আত্মীয়তার বন্ধনকে মানুষ অনেক বেশি গুরুত্ব দিত। আজ সমাজ বিভক্ত ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পরিবারে। আগে যখন নির্যাতন হতো তখন নির্যাতিত নারী একাকী থাকত না। তার পেছনে থাকত তার অভিভাবক, তার একান্নবর্তী পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি পুরো গ্রামের মানুষের সমর্থন। একজন নারী এই সাপোর্ট নেটওয়ার্কগুলোর ওপর ভরসা করতে পারতেন।

অন্যদিকে ঘরের স্ত্রীর সাথে সম্মান ও ইনসাফের সাথে আচরণ করা স্বামী এবং তার পরিবারের স্বার্থের সাথেও যুক্ত ছিল। কারণ, যেসব পরিবারে নির্যাতন হয় সেই পরিবারগুলোতে তীব্র ধরনের পারিবারিক কলহ এবং অস্থিরতা থাকে। অস্থির পরিবারের সন্তান সুস্থির হয় না। পরিবার, বংশ এবং গোত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সুস্থিত, মজবুত মানসিক গঠনের সন্তান দরকার। কাজেই অযথা এসব ঝামেলায় না গিয়ে ইনসাফ করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। আজকের মতো নারী তখন দুর্বল অবস্থানে ছিল না।

কিন্তু আধুনিক সমাজে নির্যাতনকারী স্বামীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একাকী নারীকে সহায়তার জন্য তেমন কোনো কাঠামো নেই। সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আধুনিক নারীকে নির্ভর করতে হয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানও সব

সময় সাহায্য করতে পারে না। আগে যেখানে নারী নিজের পরিবার, বংশ, গোত্রের ওপর নির্ভর করতে পারত, সেখানে আজ তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে শীতল, অলস এবং অদক্ষ আমলাতন্ত্রের ওপর। আজ তাকে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অথচ আগে খুব তাড়াতাড়ি এবং কার্যকরভাবে পারিবারিক সংকটগুলোর সমাধানের চেষ্টা করা যেত। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে এসেছে। কিন্তু আধুনিক সমাজ বর্ধিত পরিবার এবং সাপোর্ট সিস্টেমকে ভেঙে দিয়ে সে জায়গায় বসিয়েছে আমলাতন্ত্র, এনজিও আর কর্পোরেশানগুলোকে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের জন্য পারিবারিক বন্ধন এবং বর্ধিত পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। অন্যদিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন আধুনিক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি দুর্বল করেছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ—সবাইকেই। পূর্ব ও পশ্চিমের সমাজগুলোর আজকের দুর্দশা থেকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির বাস্তবতা এবং বর্ধিত পরিবারের গুরুত্ব বোঝা যায়।

তাই আসল প্রশ্ন হলো, আমারা কি নানান সমস্যায় জর্জরিত, মুমূর্ষু আধুনিক সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর ইসলামের সংস্কার করব? নাকি ইসলামের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এই সমাজের সংস্কারের মনোযোগী হব? ওইসব সামাজিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান ফিরিয়ে আনব, যা পূর্ববর্তী সমাজগুলোকে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা দিয়েছিল?

নারীবাদের সমালোচনার সঠিক পন্থা

আমি নারীবাদের সমালোচনা করি। তবে নারীবাদী ট্যাগ লাগিয়ে কারও মুখ বন্ধ করা বা বক্তব্য উড়িয়ে দেয়া সমর্থন করি না। আমাদের চারপাশে নারীর প্রতি যুলুমের অনেক ঘটনা ঘটে। আমাদের অনেকের পরিবারেও ঘটে। কেউ যখন এসবের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, যখন কেউ সাহায্য বা বিচার চায়, তখন নারীবাদী ট্যাগ লাগিয়ে তার অবস্থানকে উড়িয়ে দেয়া উচিত না। এমনকি কোনো নারীবাদীও যদি যুলুম বিরুদ্ধে বলে, বিচারের দাবি করে তাহলে নিছক নারীবাদী হবার কারণে তার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

নারীবাদের বিরোধিতার করার মানে নারীর অধিকারের বিরোধিতা করা না। নারী অধিকারের পক্ষ নেয়ার অর্থ নারীবাদী হওয়া না। কেন যেন এই সহজ বিষয়টা অনেকে বুঝতে চান না। নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করা নারীবাদের একচেটিয়া অধিকার না। সমাজ ও পরিবারে নারীর কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য এবং স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করা নারীবাদ না। যদি তাই হয় তাহলে আমি নারীবাদী।

বাস্তবতা হলো, নারীবাদীরা কেবল বাহ্যিক, ভাসাভাসাভাবে নারীর স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। নারীবাদের ইতিহাস এবং আদর্শিক বংশগতির দিকে গভীরভাবে তাকালে বোঝা যায়, নারীবাদের অনেক দিকই নারীর স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই আমাদের নারীবাদের বিরুদ্ধে বলতে হবে। সেই সাথে এটাও বুঝতে হবে যে কোনো একটা দর্শনের অ্যাকাডেমিক ক্রিটিক করা এক জিনিস আর নারীর ওপর চলা যুলুমের সাফাই গাওয়া ভিন্ন জিনিস।

আমাদের আরও মনে রাখা দরকার যে নির্যাতন কেবল শারীরিক হয় না। মানসিক নির্যাতন অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয়।

মাতৃত্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি

মাতৃত্বের ধারণা এবং গুরুত্বকে আধুনিক সমাজ মারাত্মকভাবে হেয় করে। অনেক মায়েরাও নিজেদের 'সামান্য গৃহিণী' কিংবা 'বাচ্চার দেখাশোনা করা মহিলা' মনে করেন। 'গৃহিণী-মা', মানেই নেতিবাচক কিছু মনে করা হয়। ঘরে সন্তানের দেখাশোনা করা মা মানেই যেন দুর্বল, অসহায়, পরনির্ভরশীল, ভীরু কোনো ভিকটিম। যে নারী ঘরে থেকে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে তার ব্যাপারে ধরে নেয়া হয়, তাকে এমন করতে বাধ্য করা হচ্ছে অথবা সে অজ্ঞতা, পশ্চাৎপদতা কিংবা বোকামির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নারী নিজে থেকে এই সিদ্ধান্ত নিলে ব্যক্তিস্বাধীনতার জায়গা থেকে আধুনিক সমাজ হয়তো সেটা মেনে নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্য কোনো যুক্তি বা বৈধতা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। আধুনিক পৃথিবীর চোখে অর্থহীন কোনো কাজের পেছনে পুরো জীবন ব্যয় করা লোকের সিদ্ধান্ত, আর একজন মায়ের ঘরে থাকা সিদ্ধান্তের মূল্য সমান।

এর বাইরে মাতৃত্বের আর কোনো মূল্য কিংবা তাৎপর্য আমাদের সমাজে নেই। মানুষ মা-কে ভালোবাসে, ভালোবাসার কথা বলে, মা-দিবস পালন করে। কিন্তু মায়ের ভূমিকা, মাতৃত্বের গুরুত্ব নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করা হয় না।

নিচের কথাগুলো একজন খ্রিষ্টান লেখকের লেখা।

> 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী চাকরি করে না। কোনো রোজগার করে না। ও বাসায় থাকে। ও একজন মা। মামুলি গৃহিণী মা। যে মা জন্ম দেয়। যে মা শিশুর জীবনকে রং দেয়, কাঠামো দেয়। যে মা ঘর সামলায়, সবদিকে খেয়াল রাখে, সেই সাথে তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল শিশুগুলোকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
>
> হ্যাঁ, আমার স্ত্রী চাকরি করে না। ওর 'ক্যারিয়ার' নেই। ও তো শুধু একজন ঘরে বসে থাকা মা, আর কিছু না। সেই মা যে আমাদের যমজ সন্তানদের বড় করে। ওদের মানুষ হতে শেখায়। আদাব, আচরণ, নৈতিকতা শেখায়। অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে কীভাবে নিজেকে পরিষ্কার করতে হয়—সবকিছু ও-ই শেখায়। সেই মা যে আমার এবং আমাদের পরিবারের নোঙর। সেই ভিত্তিপ্রস্তর, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে

ওঠে বাকি সবকিছু। সেই মা যে সবার জন্য সবকিছু করে। সব চাহিদার দিকে খেয়াল রাখে। সবাইকে খুশি রাখে। যদি ও আর ওর মতো মায়েরা না থাকে তাহলে ভেঙে পড়বে পরিবার, সমাজ, সবকিছু।

হ্যাঁ, ও তো শুধু মা। মামুলি গৃহিণী মা। যেমন আমাদের মাথার ওপরে উজ্জ্বল সোনালি গোল জিনিসটা, কেবল সূর্যই তো, আর কিছু না।'

মা হিসেবে নারী যে ভূমিকা পালন করে তার গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। এর কদর করা উচিত। একজন মা ৯-৫টা চাকরি করে না, তাই সমাজের প্রতি তার কোনো অবদান নেই এমন মনে করা মূর্খতা।

মা হিসেবে নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু এটা কেবল একটা দিক। সমাজ ও জাতির ওপর মায়েদের যে তীব্র ও প্রগাঢ় ভূমিকা সেটাও আমাদের বোঝা দরকার। পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাচেতনার প্রাথমিক কাঠামো গড়ে দেয় মায়েরাই।

তাহলে আধুনিকতা আর নারীবাদ কেন মায়েদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতে চায় না?

কারণ, ওরা বিশ্বাস করে শক্তি, সম্মান, ক্ষমতা, গুরুত্ব পাওয়া যায় শুধু ঘরের বাইরে। চাকরি, ব্যবসা, রাজনীতির মতো কাজে। আর এসব জায়গা নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিপরিমণ্ডলের শক্তিকে পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করে। (যদি আসলেই পাবলিক ও প্রাইভেটের মধ্যে এমন কোনো বিভাজন করা সম্ভব হয়)

বরং যে নারীরা বাসায় থাকেন অর্থনীতি, সমাজ এবং রাজনীতির ওপর তাদেরও গভীর প্রভাব থাকে। কারণ, পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরই হাতে গড়ে ওঠে। তাই মাতৃত্ব নিয়ে হীনম্মন্যতা বোধ করার বদলে নারীর উচিত তার সামনে থাকা পথ দুটো নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করা। নারী যখন চাকরি কিংবা ব্যবসা করে তখন আমরা তার বুদ্ধি, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, আর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি। অথচ এই বৈশিষ্ট্যগুলো একজন ভালো মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরও বেশি প্রযোজ্য। যেসব উচ্চশিক্ষিত নারী চাকরি না করে ঘরে থাকেন তাদের ব্যাপারে কীভাবে লোকে বলে তারা নিজেদের শিক্ষা আর মেধা নষ্ট করছে? ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিচ্ছে?

আধুনিক মানুষ কতই-না বিভ্রান্ত!

হিজাব

বাধ্যতামূলক হিজাবের আইন শোষণ কেন?

প্রশ্ন–কিছু মুসলিম দেশে হিজাব করা বাধ্যতামূলক, এ নিয়ে আপত্তি করার কী আছে? এখানে কোন জিনিসটাকে তোমাদের কাছে শোষণ মনে হচ্ছে?

উত্তর–এসব বিধান শোষণমূলক কারণ নারী তার ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারছে না। নিজের পোশাকটাও স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ তার নেই।

প্রশ্ন–পৃথিবীতে কি এমন কোনো দেশ আছে যেখানে মানুষ যা ইচ্ছে তা-ই পরতে পারে? এমন কোনো দেশ আছে যেখানে সীমাহীন স্বাধীনতা আছে?

উত্তর–আলবৎ আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে আছে

প্রশ্ন–পশ্চিমা দেশগুলোতে কেউ কি রাস্তায় নগ্ন হয়ে হাঁটতে পারে? নিজের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করতে পারে?

উত্তর–না, তা পারে না...

প্রশ্ন–তার মানে তাকে তার নগ্নতা ঢাকতে বাধ্য করা হয়। তোমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা শোষণ না? এসব দেশের মানুষও তো ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা পাচ্ছে না, তাই না?

উত্তর–এটা কেন শোষণ হতে যাবে? মানুষের সামনে যৌনাঙ্গ দেখানো সভ্যতা আর শালীনতাবিরোধী। এর সাথে মাথার চুল ঢাকার তুলনা হয় কীভাবে?

প্রশ্ন–শরীরের কোনো অংশ উন্মুক্ত করা সভ্যতা আর শালীনতাবিরোধী আর কোনো অংশ উন্মুক্ত করা সভ্যতা আর শালীনতাসম্মত, সেটা কে ঠিক করল?

উত্তর–আরে! এখানে ঠিক করার কী আছে? এটাই তো স্বাভাবিক।

প্রশ্ন–কোনটা স্বাভাবিক, সেটা কে ঠিক করল? কিসের ভিত্তিতে ঠিক হলো? স্বাভাবিকের এই ধারণাই-বা কোথা থেকে এল?

উত্তর–উম...

প্রশ্ন—অতীত ও বর্তমানের এমন শত শত সংস্কৃতি আছে যেখানে এ সীমারেখাগুলো ভিন্নভাবে টানা হয়। শালীনতা, সভ্যতা, নগ্নতার মাপকাঠি যেখানে আলাদা। এগুলো সব এককথায় উড়িয়ে দেবে?

উত্তর—উম...

প্রশ্ন—সারা পৃথিবীর মানুষকে কেন তোমাদের স্ট্যান্ডার্ডই মেনে নিতে হবে? মুসলিম-বিশ্বের মানুষকে কেন পশ্চিমা স্ট্যান্ডার্ড মানতে হবে? তোমাদের এসব আবদার কিসের ভিত্তিতে জাস্টিফাই করা যায়?

উত্তর—...

***

দেখুন, পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী মাপকাঠির ভিত্তি হলো আল্লাহর আদেশ। শরীরের কোন অংশ ঢাকতে হবে, কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে, এটা আমরা জেনেছি আল্লাহর কাছ থেকে। আমরা তাঁর আদেশ ও নির্দেশনা মেনে চলি। সাধ্যমতো এসব বিধানের সার্বিক গুরুত্ব এবং হিকমাহ অনুধাবনের চেষ্টা করি। অন্যরা এগুলো বিশ্বাস না করতে পারে, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু এটাই আমাদের মাপকাঠি। আর এর ভিত্তি হলো ওয়াহি।

কিন্তু পোশাকের ব্যাপারে পশ্চিমা মাপকাঠির একমাত্র ভিত্তি হলো সাংস্কৃতিক প্রথা ও প্রচলন। আর এগুলোর কোনো মূলনীতি কিংবা উৎস থাকে না। দিনশেষে সাংস্কৃতিক প্রথাপ্রচলনের ভিত্তি হলো—

আমরা এমন করেই অভ্যস্ত

আমাদের বাপ-দাদাকে এমন করতে দেখেছি

আমরা এগুলো মেনে চলি কারণ আমাদের কাছে এগুলো সঠিক মনে হয়

এর বাইরে আর কোনো ভিত্তি তাদের নেই। মজার ব্যাপার হলো পশ্চিমের নিজস্ব অবস্থানের কোনো ভিত্তি না থাকলেও এরা চরম উগ্র আর উদ্ধত হয়ে অন্য সবার ওপর নিজের অবস্থান চাপিয়ে দিতে চায়। অন্যদিকে, আমাদের অবস্থানের ভিত্তি সবচেয়ে মজবুত, সবচেয়ে দৃঢ়। তবু আমরা অল্পতেই পিছিয়ে যাই। আল্লাহর হুকুম আর ওয়াহির কথা না বলে 'চয়েস' আর ফ্রিডমের' মতো অর্থহীন বুলি আঁকড়ে ধরি।

বি.দ্র.— মুসলিম নারী কেন হিজাব পালন করবে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি; বরং এটা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বহুল-প্রচলিত একটি অভিযোগের (ইসলাম শোষণমূলক, অযৌক্তিক, ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্মান করে না...ইত্যাদি) জবাব।

নারীবাদ ও হিজাব (কিংবা ঢালাওভাবে আধুনিক বয়ান গ্রহণের বিপদ)

আমরা কীভাবে পোশাক পরছি (কিংবা খুলছি) তার নেতিবাচক প্রভাব অন্যদের ওপর পড়তে পারে। ইসলামী এবং সেক্যুলার–দু-ধরনের আইনই এটা স্বীকার করে।

ইসলাম আমাদের শেখায়, মন এবং মস্তিষ্ককে দৃষ্টি প্রভাবিত করতে পারে। সমাজ যদি অনাবৃত মানুষ পরিপূর্ণ হয়, রাস্তাগুলো যদি শরীর দেখাতে উন্মুখ নারীপুরুষে ভরে যায়, তাহলে সমাজে ফাহেশা এবং ফাসাদ তৈরি হবে।

নগ্নতা এবং অশালীনতার নেতিবাচক প্রভাবের কথা সেক্যুলার সংস্কৃতিও স্বীকার করে। এ কারণেই স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট ড্রেস কোড থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে জনসম্মুখে অশালীন আচরণের ব্যাপারে আইন (indecent exposure laws) থাকে।[৬২] আর পর্নোগ্রাফির শারীরিক, মানসিক এবং স্নায়বিক ক্ষতি নিয়ে তো অনেক গবেষণা হয়েছে।

কাজেই আপনি কী পরছেন তার গুরুত্ব আছে। নারী যেভাবে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা পরতে পারবে, খুলতে পারবে; এখানে আর কারও কথা বলার অধিকার নেই–নারীবাদীদের এই দাবি ভুল এবং বিপজ্জনক। অবশ্যই এখানে অন্যদের কথা বলার অধিকার আছে। কোন সীমার ভেতরে পোশাক পরতে হবে পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার 'indecent exposure' আইনের মাধ্যমে সেটা নারীপুরুষকে জানিয়ে দেয়। পশ্চিমা আইন যদি এমন করতে পারে তাহলে ইসলামী আইন কেন পারবে না?

মৌলিকভাবে নীতি তো একই। পার্থক্য হলো অশালীনতার সংজ্ঞা নিয়ে। অশালীনতার ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজের সংজ্ঞা আর ইসলামের সংজ্ঞা এক না। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রমপরিবর্তনশীল সংস্কৃতির দ্বারা। আর অশালীনতার ব্যাপারে ইসলামী

[৬২] indecent exposure laws–কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের শরীরের এমন কোনো অংশ জনসম্মুখে উন্মুক্ত করে যা ওখানকার লোকাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অসংগত বলে বিবেচিত, তবে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের আইনকে indecent exposure laws বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সেক্যুলার দেশে এ ধরনের আইন আছে। ~ অনুবাদক

মাপকাঠির ভিত্তি হলো মানবজাতির সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসা ওয়াহি। যিনি মানুষ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্ক সর্বাধিক অবগত। যিনি জানেন কোনটা আসলে আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর।

সূরা ৩৩ এর ৫৯ আয়াতের কথা চিন্তা করুন–

> *হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের আর মু'মিনদের নারীদের বলে দাও—তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ির বাইরে যায়), এতে তাদের চেনা সহজতর হবে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৫৯]*

এই আয়াতে পর্দা করার প্রধান একটি কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–নিগ্রহ এবং হয়রানি এড়ানো। হিজাব কেন উপকারী, হিজাব কেন যৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ন্যায়বিচারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। মডার্নিস্ট মুসলিমরা যদিও মনে করে হিজাব একটা অন্তঃসারহীন প্রথা, একটা প্রতীকী বিধান, কিন্তু আল্লাহর কুরআনের বক্তব্য ভিন্ন।

হিজাবকে গুরুত্বহীন সাংস্কৃতিক ফসিল কিংবা নারীকে পরাধীন রাখার উপকরণ হিসেবে দেখা হলো সেক্যুলার অবস্থান। একইভাবে হিজাবকে বিকিনির সাথে তুলনা করা, দুটোকেই নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিচায়ক হিসেবে সমান মনে করাও সেক্যুলার মানসিকতার ফসল।

না, হিজাব অবশ্যই বিকিনির চেয়ে নৈতিকভাবে, যৌক্তিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে উত্তম। সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা নিয়ে ফাঁকা বুলি আওড়ানোর বদলে এই সত্য নিয়ে গর্বিত হোন। আল্লাহ কি কোনো কারণ ছাড়া হিজাবের বিধান দিয়েছেন? নাকি এই বিধানের পেছনে হিকমাহ আছে, মানবজাতির কল্যাণ নিহিত আছে?

শরীর উন্মুক্ত করা ভালো, ইচ্ছেমতো নিজের দেহ দেখানোর অধিকার সবার আছে– এই মডার্নিস্ট দাবিগুলো আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। হিজাব আল্লাহর বিধান। মদ, জুয়া, শূকরের মাংস থেকে বিরত থাকাও আল্লাহর বিধান। আমরা বিশ্বাস করি মদ, জুয়া এবং শূকরের মাংস থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য কল্যাণকর। একইভাবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে হিজাব পালন করাও আমাদের জন্য কল্যাণকর। হয়তো আমরা এমন সমাজে বসবাস করছি যেখানে এই বিধান 'আরোপ করা'-র সুযোগ নেই। কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা এই বিধানকে সঠিক এবং মানবজাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর মনে করব না। এ বিশ্বাসকে ধরে রাখতে হবে। আর কিছু না হোক আমাদের সন্তানরা যেন হিজাবের বিধান পালন করে তা নিশ্চিত করার জন্য হলেও

এই বিশ্বাস রাখা জরুরি।

আমরা যদি মনে করি হিজাব প্রতীকী এবং এর কোনো ব্যবহারিক কার্যকারিতা নেই, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই হিজাবকে অর্থহীন মনে করে ত্যাগ করবে। হিজাবকে তারা দেখবে এক সাংস্কৃতিক ফসিল হিসেবে, প্রতীকী গুরুত্বের বাইরে যার আর কোনো অর্থ নেই। অনেকে তো এখনই এভাবে চিন্তা করছে। মুসলিম নারীদের অধিকাংশই আজ হিজাব করে না। কেন? এই দোষ তো শুধু মুসলিম নারীদের না। আমরা সবাই এর জন্য দায়ী। আমরা সবাই পরীক্ষার কঠিন সময় পার করছি। কিন্তু কঠিন সময়েও চিন্তা বিশুদ্ধ থাকা জরুরি।

ফাঁপা বুলিগুলো ছুড়ে ফেলুন। চোখ খুলুন।

হিজাব যখন অবাধ্যতা

ইসলাম ও নারী নিয়ে বিবিসির একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলাম। একজন মুসলিম নারীকে (যে হিজাব পরে) প্রশ্ন করা হলো, 'হিজাব কি একধরনের শোষণ না?

জবাবে মহিলা ভয়ংকর এক উত্তর দিলো—

> 'কেউ যদি আমাকে বলে, 'তোমাকে হিজাব পরতেই হবে', তাহলে আমি হিজাব পরবো না। হিজাব পরতে বাধ্য করা হলে আমি হিজাব খুলে ফেলব। আমি হিজাব পরি ভালোবাসা থেকে। এটা আমার পরিচয়। আমি এটা পরতে ভালোবাসি। এমনকি, আল্লাহ হিজাব পরতে বলেছেন তাই হিজাব পরি, এটাও আমি বলি না। আল্লাহ যা যা করতে বলেছেন, সবকিছুর ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমি হিজাব পরি, কারণ আমি নিজে এটা পরতে চাই। আমি এটা ভালোবাসি। এটা আমার ধর্মের অংশ এবং আমি এটা ঔন করি।'

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো ওপরের কথাগুলোর মধ্যে সমস্যা কী, অনেক তরুণ মুসলিম সেটা বুঝতে পারে না। এ ধরনের বক্তব্যের ভেতরে থাকা কুফরকে তারা চিনতে পারে না। এটাই হলো লিবারেলিসমের কলুষিত করার ক্ষমতা। মানুষের চিন্তাচেতনাকে লিবারেলিসম খুব সূক্ষ্মভাবে সংক্রমিত করে। ধীরে ধীরে ঈমানকে ক্ষয় করে করে একদম নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু মানুষ বুঝতেও পারে না।

আল্লাহও যদি আমাকে কিছু করতে বলেন, আমি করব না—এমন কথা একজন মুসলিম কীভাবে বলে? এমন কথা শুধু তখনই বলা সম্ভব যখন লিবারেলিসমের আদর্শে পুরোপুরিভাবে তার মগজধোলাই হয়ে গেছে।

লিবারেলিসম কী শেখায়? লিবারেলিসম শেখায়—কাউকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করার অর্থ তার 'অটোনমি' বা ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া। তার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। আর যা কিছু মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে তা মন্দ। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার অর্থ মানুষের পরিচয় ছিনিয়ে নেয়া। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

কেউ যখন এভাবে চিন্তা করে তখন ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি

কেমন হবে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আল্লাহ কি আমাদের জন্য কিছু কাজ বাধ্যতামূলক করেননি? কিছু কাজ নিষিদ্ধ করেননি? যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে না, আল্লাহর আনুগত্য করবে না, তাদের জন্য কি আল্লাহর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেননি? এটা কি বলপ্রয়োগ না? হুমকি না?

লিবারেলিসমে আক্রান্ত মুসলিম এই প্রশ্নগুলোর জবাবে দুটো উত্তর দিতে পারে–

১। আল্লাহ খারাপ (নাউযুবিল্লাহ)

২। আল্লাহ খারাপ নন, তবে তিনি আমাদের জন্য কোনো কিছু বাধ্যতামূলক করেননি, কোনো কিছু নিষিদ্ধও করেননি।

দুটো অবস্থানই কুফর।

এই উভয়সংকট থেকে বের হবার উপায় হলো লিবারেলিসমের ক্রিটিক করা। স্বাধীনতা, বলপ্রয়োগের মতো ধারণাগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা।

'হিজাব আমার চয়েস', এবং অন্যান্য বিভ্রান্তি

হিজাবের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য 'চয়েস' বা 'সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা'র কথা বলা অর্থহীন। আধুনিক মানুষ আসলে কোন অর্থে তার পোশাক 'বেছে' নেয়? পশ্চিমা নারী সরলমনে বিশ্বাস করে তার পরনের পোশাক তার নিজের বাছাই করা, সে স্বেচ্ছায় এ পোশাক বেছে নিয়েছে। কিন্তু সে আসলে ঠিক ওই ট্রেন্ডগুলো অনুসরণ করে যেগুলো ভারসাচি, শ্যানেলের মতো ব্র্যান্ড কিংবা টিভি চ্যানেল আর ফ্যাশন ম্যাগাযিনগুলো প্রমোট করে। এটা কি কাকতালীয়? এসব কর্পোরেশানের বেধে দেয়া ফ্যাশনের স্ট্যান্ডার্ড পশ্চিমা নারী যতটা অন্ধভাবে মেনে চলে, সবচেয়ে অন্ধ মুরিদও অত অন্ধভাবে তার পীরের অনুসরণ করে না।

সমাজের নারীদের পোশাক যদি আসলেই তাদের স্বাধীন পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করা হতো, তাহলে আমরা বিভিন্ন ধাঁচের পোশাক দেখতাম। শরীরের কোনো অংশ ঢাকা হবে আর কোনো অংশ উন্মুক্ত রাখা হবে সেটা নিয়েও অনেক পার্থক্য দেখা যেত। পোশাকগুলোর উৎসও আলাদা হতো। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে আমরা সেটা দেখি না; বরং উল্টোটা দেখি। সমাজের নারীরা (এবং পুরুষরাও) একই ধরনের পোশাক পরে। কারণ, নগ্নতা, শালীনতা, ফ্যাশন ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের সবার ধ্যানধারণা মোটামুটি একই। তা ছাড়া অধিকাংশ মানুষ একই ব্র্যান্ডের পোশাক কেনে। এসব পোশাকের রং, ফ্যাব্রিক, কাটিংয়ে অল্পসল্প কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু মূল থিম এক। অথচ মানুষ মনে করছে তারা স্বাধীনভাবে এসব পোশাক বেছে নিয়েছে।

এটা আসলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অতিরঞ্জিত অনুভূতি ছাড়া আর কিছু না। হ্যাঁ, আপনার ব্লাউসের রং আপনি নিজে বাছাই করছেন। কিন্তু বুক যে ঢাকতে হবে, এটা আপনি বেছে নেননি। আপনার আশেপাশে যে দোকানগুলো আছে, সেটা আপনি ঠিক করেননি। দোকানগুলোতে যে ঘুরেফিরে যে একই ডিসাইনগুলো দেখা যায়, সেটাও আপনি ঠিক করেননি।

মানুষকে আপনি যত সীমিত অপশানই দিন না কেন, মানুষ মনে করবে সে স্বাধীন। সে নিজের স্বাধীনতার চর্চা করছে। পশ্চিমা সমাজ যেহেতু 'সিদ্ধান্ত' আর 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'

নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকে তাই এমন হওয়া অবধারিত। লক্ষ লক্ষ নারী সেই একই বুট, জ্যাকেট আর ইয়োগা প্যান্টস পরছে। সেই একই ডিসাইনের অলংকার আর পারফিউম ব্যবহার করছে। ফ্যাক্টরিগুলোতে বানানো হচ্ছে একই আইটেমের কোটি কোটি কপি। সবগুলো এক। অথচ এই পশ্চিমা নারী বোরকা পরা মুসলিম নারীকে বলছে তুমি শোষিত, তোমার কোনো স্বাধীনতা নেই, তোমার কোনো স্বকীয়তা নেই ইত্যাদি...।

অন্যদিকে যাদের শোষিত বলা হচ্ছে, সেই মুসলিম নারীদের অনেকে আবার সাক্ষাৎকার কিংবা প্রবন্ধে অনুনয়-বিনয় করে পশ্চিমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে—না না! আমি শোষিত না, আমি তোমাদের মতোই স্বাধীন। হিজাব আমার চয়েস!'

কী বিচিত্র!

হিজাব ও ক্ষমতায়ন

হিজাব কি নারীর ক্ষমতায়নের নিদর্শন? অনেক মুসলিম ফেমিনিস্টকে এমন দাবি করতে দেখা যায়। তারা এখানে 'সিদ্ধান্তের' এর কথা আনে। তারা বলে–হিজাব পরার মাধ্যমে মুসলিম নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে, কারণ সে নিজেদের ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারে, আর হিজাব পরার সিদ্ধান্ত সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে। স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে পারার মাধ্যমে তার ক্ষমতায়ন ঘটে। এটা হলো মুসলিম ফেমিনিস্টদের যুক্তি।

কিন্তু এই যুক্তি অনুযায়ী যেই নারী স্বেচ্ছায় বিকিনি পরে, তারও ক্ষমতায়ন হচ্ছে, তাই না? বিকিনি আর হিজাব দুটো একইভাবে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক। যেহেতু দুটোই নারী স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। এভাবে যেকোনো পোশাকের ক্ষেত্রে এটা দেখানো সম্ভব।

বুঝতেই পারছেন, এ যুক্তি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ। তাই নারী ক্ষমতায়নের ধারণা মাথায় নিয়ে বেড়ে ওঠা মুসলিম মেয়েদের অনেকে যে একসময় পুরোপুরিভাবে হিজাব করা ছেড়ে দেয় তাতে অবাক হবার কিছু নেই। হিজাব নিয়ে মাথাব্যথার কী আছে, যখন মুখ্য বিষয় হলো ক্ষমতায়ন আর 'সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা'? ফ্যাশনেবল পোশাক পরলে খুব শক্তিশালী ক্ষমতায়নের অনুভূতি হবার কথা। এতে করে নিজেকে দেখতে আকর্ষণীয় লাগে, ছেলেদের মনোযোগ পাওয়া যায়, আর কত কী। আমাদের সমাজের যেকোনো কিশোরী কিংবা তরুণী, হিজাবের বদলে ফ্যাশনেবল পোশাক পরে অনেক বেশি ক্ষমতায়নের অনুভূতি পাবে।

কাজেই ক্ষমতায়নের এই বুলি বাদ দিন। হয়তো কোনো একসময়, কিছু মানুষের কাছে এটা যৌক্তিক মনে হয়েছিল, কিন্তু দিনশেষে এতে করে লাভের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ক্ষমতায়ন দিয়েই যদি হিজাবকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে হয় তাহলে এটা করার আরও ভালো উপায় আছে। নিজেকে ঢেকে রাখা, মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার মাধ্যমে শক্তি অর্জনের ধারণা সর্বজনীন। সিআই, এমআইসিক্সের এর মতো গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কথা চিন্তা করুন। তাদের ক্ষমতার একটা উৎস হলো তাদের গোপনীয়তা, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা।

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষরা থাকে চোখের আড়ালে। তারা ট্যাবলয়েড পত্রিকা কিংবা ছবি তোলা এড়িয়ে যায়। অ্যামেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে শক্তভাবে প্রাইভেসি মেনে চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোক এবং রাজনীতিবিদদের মিটিং হয় বদ্ধ দরজার আড়ালে। আর এটা নতুন কিছু না। আগেরকার দিনের রাজা-বাদশা আর সুলতানরা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। মনে করা হতো সাধারণ মানুষের চোখে পড়লে তাদের সম্মান কমবে। কখনো বাধ্য হয়ে রাজপথ দিয়ে যেতে হলে উসমানী সুলতানরা নিজেদের আড়াল করার জন্য পর্দা করত। আজও শাসক ও রাজনীতিবিদরা কালো কাচ লাগানো লিমুসিনে করে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু কোনো অদ্ভুত কারণে, আজ মানুষ আজ মনে করছে নিজের শরীর উন্মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটে। কী অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতা। মানুষ আজ শুধু নিজের শরীর উন্মুক্ত করে ক্ষান্ত হয় না; বরং ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাগুলোও সোশ্যাল মিডিয়াতে সবার সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে যেকোনো অপরিচিত লোক, এখন আপনার বাসার ভেতরে এখন ঢুকে পড়তে পারে। এটা ক্ষমতার ঠিক বিপরীত। এটা হলো অন্যের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়া। প্রত্যেক সমাজ প্রাইভেসিকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু নারীবাদের মতো দূষিত মতবাদগুলোর প্রভাবে আমাদের সময়ে প্রাইভেসির এই ধারণা একেবার নষ্ট হয়ে গেছে।

এভাবে আমরা হিজাবের বিধানের সম্ভাব্য হিকমাহ নিয়ে চিন্তা করতে পারি। নিজেকে আড়াল করার ব্যাপারটা নারী ও পুরুষ, উভয়ের ক্ষেত্রে খাটে। তবে স্বাভাবিকভাবেই নারীর জন্য এর প্রয়োজন পুরুষের তুলনায় বেশি। আল্লাহ নারী ও পুরুষকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে নারী কেন নিজেকে মানুষের সামনে উন্মুক্ত করবে? এটা বিবেকবুদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ না এবং এটা নানাভাবে তাঁর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

বাস্তবতা হলো, অতীতের নারীরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে জানত। এ শক্তিকে তারা সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক এমনকি রাজনৈতিকভাবেও কাজে লাগাত। কিন্তু আধুনিক অ্যাকাডেমিক আর গবেষকরা সহজভাবে ধরে নেয়–হিজাব মুসলিম নারীর পরাধীনতার চিহ্ন। যখন তারাই আসলে পরাধীন।

আর আমরা জানি যে হিজাব করার মূল কারণ হলো আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর বিধান আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে মেনে চলা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফ্রান্স ও হিজাব

আর যাই হোক, ফরাসীদের সোজাসাপ্টা কথা বলার অভ্যাসের প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে। শরীরের কোন অংশ ঢাকা যাবে আর কোন অংশ ঢাকা যাবে না, তা নিয়ে ওদের নিজস্ব মত আছে। সেই মত ওরা শক্তভাবে মেনে চলে। শুধু নিজেরা মানে না, তাদের দেশে থাকতে হলে সেই মত অন্যদেরও তারা মানতে বাধ্য করে। শরীরের কোন অংশ ঢাকতে হবে আর কোন অংশ ঢাকা হবে না, এ নিয়ে মুসলিমদেরও নিজস্ব অবস্থান আছে। একসময় মুসলিমরাও এই অবস্থান শক্তভাবে মেনে চলত।

ফরাসীদের অবস্থানের ভিত্তি মানবপ্রকৃতি, অধিকার, মর্যাদা ইত্যাদির ব্যাপারে ভাসাভাসা কিছু মেটাফিযিকাল ধারণা আর ধর্মহীনতা। ওদের ভিত্তি নড়বড়ে। তবু নিজেদের মতের পক্ষে ওরা শক্তভাবে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে মুসলিমদের অবস্থানের ভিত্তি আল্লাহ এবং তাঁর বিধানের প্রতি ঈমান, দ্বীনি এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। কিন্তু ভিত শক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের অনেকে নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে শক্ত অবস্থা নেয় না। ফরাসীদের দৃঢ়তার ধারে-কাছেও কিছু তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

ফরাসীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে—আমাদের মতই সঠিক। এটাই যথাযথ।

কিন্তু ফরাসীদের কথার জবাবে মুসলিমরা বড়জোর বলে—হ্যাঁ, তোমাদের কথা সম্ভবত ঠিক। তবে অনেক মহিলা হয়তো মাঝেমাঝে বোরকা পরতে চায়। এটা তাদের সিদ্ধান্ত, আর তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত। তাই না?

এমন মিনমিনে, দুর্বল অবস্থানকে ফরাসীরা (কিংবা অন্য কেউ) কেন সম্মান করবে? ওরা মনে করে বোরকা সভ্যতার সাথে সাংঘর্ষিক, সভ্যতার ওপর আক্রমণ। ওদের কাছে বোরকা ঘৃণ্য, জঘন্য। মানুষ যে জিনিসকে ঘৃণা করে সেটাকে সম্মান করতে পারে না। কিন্তু আমরা মুসলিমরা শক্ত অবস্থান নিই না। ফরাসীদের অবস্থানের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। মানবদেহ, নগ্নতা, লিঙ্গ, শালীনতার ব্যাপারে ফরাসী এবং পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে থাকা ধারণাগুলোকে আমরা প্রশ্ন করি না। আমরা শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা আর 'সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা' করার বুলি আওড়াই। অথচ এগুলো আমাদের ধ্যানধারণা না, আমাদের শব্দ না। এগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যেরও অংশ না। এগুলো ওদের

ধারণা, ওদের শব্দ। তবুও আমরা এগুলো ব্যবহার করি। আমরা বোকার মতো ভাবি হয়তো এতে ওরা আমাদের সম্মান করবে। আমাদের কথা মেনে নেবে।

না, ওরা মানেনি। মানবেও না।

তাই ফরাসীদের প্রশংসা করা উচিত। যতটা আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা নিয়ে বাতিলের পক্ষে ওরা অবস্থান নেয়, তার ভগ্নাংশ পরিমাণ আত্মবিশ্বাস যদি হক্বের পক্ষে আমরা দেখাতে পারতাম!

হিজাব কি যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষন বন্ধে কার্যকরী

হিজাব কি যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে পারে?

হিজাব পরেও তো অনেকে যৌন নির্যাতন আর ধর্ষণের শিকার হয়। তাহলে হিজাব পরে লাভ কী? এটা তো পরিষ্কার যে হিজাব নারীকে যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারে না।

প্রায়ই এ ধরনের কথা শোনা যায়।

কিন্তু এই যুক্তিটা আসলে ভুল। কারণ, হিজাব করলে যৌন নির্যাতন, ধ্বংস কিংবা টিযিং এর সব সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যাবে, এমন দাবি কেউ করেনি। নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন কোনো দাবি করেনি।

বরং দাবি করা হয়েছে বাকি সব ফ্যাক্টর যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে হিজাব উল্লেখযোগ্যভাবে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের আশঙ্কা কমায়।

হ্যাঁ, কায়রোর রাস্তায় হিজাব পরা নারীদেরও টিটকারী কিংবা অশালীন উক্তির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু অনস্বীকার্য সত্য হলো, এই নারীরা যদি ইয়োগা প্যান্টস, ট্যাংক টপ কিংবা অন্যান্য পশ্চিমা পোশাক পরে রাস্তায় হাঁটা চলা করত তাহলে এসব ঘটনার হার আরও অনেক বেশি হতো।

আর এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আয়াতের বক্তব্যও স্পষ্ট:

> *হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের আর মু'মিনদের নারীদের বলে দাও—তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ির বাইরে যায়), এতে তাদের চেনা সহজতর হবে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৫৯]*

হিজাবের কার্যকরী কোনো ভূমিকা নেই

ক–আমি আর কক্ষনো সিটবেল্ট বাঁধব না। সিটবেল্ট বাঁধার কোনো মানেই হয় না।

খ–মানে? কী বলছ এসব?!

ক–সিটবেল্ট একটা প্রতীকী জিনিস। একটা অর্থহীন প্রথা। কিছু মানুষ সিটবেল্ট বেঁধে নিজেদের সুনাগরিক প্রমাণ করতে চায়। এটা হলো নিজেকে ভালো প্রমাণ করার ঢং। যারা এসব করে তাদের সিদ্ধান্তকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি এসব করতে পারব না।

খ–এভাবে হয়তো বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু এর জন্য সিটবেল্ট কেন অর্থহীন হয়ে যাবে? সিটবেল্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিকাল ভূমিকা আছে।

ক–আচ্ছা, তাই নাকি! কী সেটা, শুনি?

খ–সিটবেল্ট মানুষকে দুর্ঘটনায় আহত হওয়া থেকে রক্ষা করে

ক–হাস্যকর কথা! সিটবেল্ট বাঁধার পরও অনেক মানুষ দুর্ঘটনায় আহত হয়, এটা জানো? অনেকে তো সিটবেল্ট বাঁধা সত্ত্বেও মারা যায়। কাজেই সিটবেল্ট ইউসলেস। এটা কোনো ধরনের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

খ–আরে! সিটবেল্ট তো জাদুমন্ত্র না যে এটা সব ধরনের বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাবে। কিন্তু সিটবেল্ট অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগে, এটা তো স্পষ্ট।

ক–না, তুমি ভুল বলছ। আমি এমন মানুষকে চিনি সিটবেল্ট বাঁধার পরও যারা আহত হয়েছে। এদের অনেকে আবার এমন দেশের নাগরিক যেখানে সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক। তারপরও তারা আহত হয়েছে।

খ–দেখো তুমি একটা লজিকাল ভুল করছ। সিটবেল্ট আমাদের ১০০% সুরক্ষা দিতে পারে না এটা ঠিক। কিন্তু তার মানে তো এটা না যে সিটবেল্ট আমাদের কোনো সুরক্ষাই দিতে পারে না। যদি অন্য সব ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সিটবেল্ট উল্লেখযোগ্য হারে আহত ও নিহত হবার আশঙ্কা কমায়।

ক–এসব ফালতু কথা বাদ দাও তো। আরেকজনকে খারাপ প্রমাণ করে তোমার লাভটা

কী? সিটবেল্ট না বেঁধে গাড়ি চালানোর সময় কোনো মাতাল ড্রাইভার যদি আমার গাড়িতে ধাক্কা দেয়, আর আমি যদি আহত হই বা মারা যাই, তাহলে সেটা কি আমার দোষ? নাকি ওই মাতাল ড্রাইভারের দোষ। ভিকটিমকে দোষ দেয়া বন্ধ করো!

খ–আজব! অবশ্যই এটা ওই মাতাল ড্রাইভারের দোষ। কিন্তু এর সাথে সিটবেল্ট বাঁধা-না-বাঁধার কী সম্পর্ক? পৃথিবীতে অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন, পাগল লোক আছে, কিন্তু তাতে তো সিটবেল্টের প্র্যাকটিকাল গুরুত্ব এবং উপকারিতা বাতিল হয়ে যাচ্ছে না; বরং এ ধরনের লোকজন আছে দেখেই আমাদের সিটবেল্ট পরাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

ক–দেখো, তুমি নিজে সিটবেল্ট পরো তাই অন্য সবাইকে ছোট করে দেখছ। তুমি মনে করছ তুমি অন্য সবার চেয়ে ভালো। অথচ আমরা কেবল আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োগ করছি। আমি সিটবেল্ট বাঁধব কি না, সেটা আমার ব্যাপার। এখানে তোমার সমস্যা কী? এই হলো আজকের দুনিয়ার সমস্যা...

খ–শোনো, মাথা ঠান্ডা করো। তোমাকে আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। তোমার গাড়ির সাথে দেয়া ম্যানুয়ালটা খুলে দেখো। গাড়ি যারা বানিয়েছে, তারাই বলছে দুর্ঘটনায় আহত হবার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সিটবেল্ট বাঁধতে হবে। এরাও কি তোমাকে ছোট করে দেখছে? তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে? জ্ঞান দিচ্ছে?

ক–এটা তোমার নিজস্ব ব্যাখ্যা। ম্যানুয়ালের কথা তুমি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছ। তুমি নিজে যেহেতু সিটবেল্ট বাঁধো তাই তুমি ওভাবেই ব্যাখ্যা করছ। কিন্তু ম্যানুয়াল ব্যাখ্যা করার অধিকার তোমার একার না।

খ–আমার তো মনে হয় না, ম্যানুয়ালের বক্তব্য অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে...।

ক–যথেষ্ট হয়েছে! থামো!। আমার জীবন আমার সিদ্ধান্ত! গাড়ি চালাতে গিয়ে আমাকে কেমন-সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়ে তুমি জানো? কোন সাহসে তুমি আমাকে সিটবেল্ট বাঁধার কথা বলো? আবার ম্যানুয়ালের কথা টানছ! তোমার নিজের গাড়ি আছে?

খ–না নেই, কিন্তু সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক কেন?

ক–বাহ! তোমার নিজের কোনো গাড়ি পর্যন্ত নেই, অথচ তুমি আমাকে সিটবেল্ট বাঁধার লেকচার দিয়ে যাচ্ছ! চুপ থাকো!

***

আর এভাবেই হিজাব আর ধর্ষণ নিয়ে আরেকটা গঠনমূলক আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। আচ্ছা ভালো কথা, ম্যানুয়ালের প্রাসঙ্গিক অংশটা কী জানেন? জানা না থাকলে জানিয়ে দিই–

> *হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের আর মু'মিনদের নারীদের বলে দাও–তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ির বাইরে যায়), এতে তাদের চেনা সহজতর হবে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৫৯]*

হিজাব নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে যেভাবে তর্ক করতে হয় না

হিজাব নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যখন 'স্বাধীনতার' দোহাই দিয়ে তর্ক করে, তখন সেটা অসংলগ্নতা। পোশাকপরিচ্ছদের ব্যাপারে প্রত্যেক সমাজের কোনো-না-কোনো মাপকাঠি থাকে। প্রতিটি সমাজ কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের পোশাককে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা সব সময় নির্দিষ্ট কোনো পোশাককে নিষিদ্ধ কিংবা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার মাধ্যমে হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় সামাজিক চাপের মাধ্যমে।

যেমন, পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করা মুসলিম নারীদের অনেকে হিজাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয় সামাজিক চাপের কারণে। তারা এমন এক সমাজে থাকে, যেখানে হিজাব পরলে নিজেকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো মনে হয়। রাস্তাঘাটে মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে। এতে তারা অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো সেক্যুলার আত্মীয়রা হিজাব নিয়ে খোঁটা দেয়। হয়তো বাসা থেকে হিজাব খোলার জন্য চাপ দেয়া হয়। সবকিছু একসাথে জড়ো হতে হতে একসময় সামাজিক প্রথাপ্রচলনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নিজের হিজাব সে খুলে ফেলে। অথবা অন্য কোনোভাবে নিজের পোশাককে বদলে নেয়। এভাবে সমাজ মানুষের পোশাককে নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজেই এ ধরনের শক্তিশালী সামাজিক চাপের উপস্থিতিতে 'স্বাধীন সিদ্ধান্ত'-এর কথা বলা অর্থহীন। মানুষ নিজের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি স্বাধীন এবং নিজস্ব মনে করলেও বাস্তবতা হলো সমাজ মানুষের সামনে সীমিত কিছু সুযোগ রাখে, আর মানুষ সেখান থেকে কোনো একটাকে বেছে নেয়।

তবে এটা আমার আলোচনার মূল বিষয় না। আমার পয়েন্ট হলো, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অর্জন এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছা মুসলিমদেরও থাকা উচিত। একটা আদর্শ মুসলিম সমাজে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পোশাক পরাটাই হবে স্বাভাবিক। এমন কোনো সমাজে যদি কোনো কারণে পোশাকের ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন নাও থাকে, তবু নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পরার ব্যাপারে সামাজিক চাপ সেখানে থাকবে। এমন সমাজে বিকিনি আর শর্ট স্কার্ট পরা নারীরা অস্বস্তি বোধ করবে। যদি কোনো আইন নাও থাকে,

যদি কোনো জরিমানা নাও করা হয়, তবু অন্য সবার মতো পোশাক পরার তীব্র চাপ তারা নিজে থেকেই অনুভব করবে। এভাবে ইসলামী ধর্মীয় রীতি আরোপিত হবে, ঠিক যেভাবে পশ্চিমা ড্রেস কোড আজ আরোপ করা হচ্ছে।

আদর্শ মুসলিম সমাজ কোনটি?

নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তৈরি করা সমাজ। যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নেই, মদীনাতে নির্দিষ্ট কোনো ড্রেস কোড ছিল না, তবু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামী বিধান অনুযায়ী পোশাক পরত। এতে কি অন্য অধিবাসীদের ওপর একই ধরনের পোশাক পরার চাপ তৈরি হতো না? এটা কি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় বিধিবিধান আরোপ করা না? তাহলে স্বাধীন সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়ে আপনি কীভাবে হিজাবের পক্ষে যুক্তি দেবেন? এই অসংলগ্নতা এড়ানোর উপায় হলো,

- হয় ফ্রিডম অফ চয়েসের এই ধারণার বৈধতা অস্বীকার করা এবং এগুলোর সুবিধাবাদী ব্যবহার করা বন্ধ করা, অথবা
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সমাজ যে আদর্শের ওপর ছিল তা অস্বীকার করা।

অন্যভাবে বলা যায়, ফ্রিডম অফ চয়েসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বাস্তবে তো নেই, তাত্ত্বিকভাবেও নেই। আর যদি এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব থাকেও তাহলে সেটা ইসলামী মূল্যবোধ এবং বিধিবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না। কাজেই যখনই হিজাব কিংবা অন্য কোনো মুসলিম পোশাককে আক্রমণ করা হয় তখন 'স্বাধীন সিদ্ধান্তের' বুলি আঁকড়ে ধরার কোনো অর্থ হয় না। চিন্তা, কথায় ও কাজে কনসিসটেন্ট হওয়া জরুরী।

বিজ্ঞানবাদ

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় : প্রচলিত ভুল ধারণা

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় (scientific miracle of the Quran) দিয়ে গুগল সার্চ করলে লাখ লাখ লেখা, ভিডিও এবং ইমেজ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনের বৈধতা বা সঠিকত্ব প্রমাণের এই প্রবণতা স্বাভাবিক। বিজ্ঞান বর্তমান যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী জ্ঞানতাত্ত্বিক শাখা। জাতি-ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে বিজ্ঞান হলো সত্যের সমার্থক। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ আসলেই স্রষ্টার কাছ থেকে এসে থাকলে সেটা অবশ্যই বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কেউ যখন এভাবে চিন্তা করে, তখন তার কাছে মনে হবে, ১৪০০ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনে যদি এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকে, যা সেই সময়ের কোনো মানুষের জানার সুযোগ ছিল না, তাহলে সেটা কুরআনের সত্যতা এবং কুরআন স্রষ্টার বাণী হবার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ।

আপাতভাবে যৌক্তিক এবং আকর্ষণীয় মনে হলেও, এ ধরনের চিন্তার কিছু দিক নিয়ে সতর্কতার সাথে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ নিয়ে বেশ কিছু ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেগুলো শুধরে নেয়াও দরকার।

১। কুরআন ও বিজ্ঞান কখনো সাংঘর্ষিক হয় না

অনেক মুসলিম দাবি করে কুরআন বৈজ্ঞানিকভাবে ১০০% সঠিক। যেমনটা বললাম, তারা কেন এমন বলে থাকেন বা বলার প্রয়োজন অনুভব করেন, তা বোধগম্য। বিজ্ঞানকে আজ বাস্তবতার সবচেয়ে নিখুঁত উপস্থাপনা মনে করা হয়। অন্যদিকে কুরআন হলো বাস্তবতার নির্মাতার বাণী। কাজেই কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকাটাই যৌক্তিক।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো বিজ্ঞান আসলে বাস্তবতার নিখুঁত

প্রতিনিধিত্ব করে না। এ কথা মানার জন্য কুহনিয়ান পোস্ট-মডার্নিস্ট[৬৩] হবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ বিজ্ঞানীও স্বীকার করেন, বিজ্ঞানের বড় একটা অংশজুড়ে থাকে নানা অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যাখ্যা। নতুন নতুন তথ্যের সাথে বিজ্ঞানের অবস্থান ক্রমাগত বদলায়, আপডেট হয়। এ এক ক্রমাগত চলমান প্রক্রিয়া।

যেমন, বর্তমানের সবচেয়ে মজবুত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন এই থিওরি হয় পুরোপুরি ভুল অথবা অন্য এমন কোনো থিওরির অপূর্ণ রূপ, যা এখনো অজানা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন অজানা এই থিওরি অভিকর্ষ বলকে আমলে নিয়ে মহাবিশ্বের আরও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

নিজস্ব গবেষণাক্ষেত্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত সত্য জানার দাবি করে এমন বিজ্ঞানী খুব বেশি পাওয়া যায় না। কার্ল পপারের[৬৪] মতো করে চিন্তা করা বিজ্ঞানীরা হয়তো এও বলবে যে, বিজ্ঞান কখনোই পুরোপুরিভাবে বাস্তবতাকে জানতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী হাইপোথিসিসকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। মোদ্দাকথা হলো, বিজ্ঞানের কাছে থাকা তথ্যের ভান্ডার অপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুল। বিজ্ঞানীরা আজ যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করছেন, কাল সেটার ব্যাপারে তাদের মত বদলে যেতে পারে।

একটা উদাহরণ দিই। বিগ ব্যাং থিওরি[৬৫] আর মহাকাশের পর্যায়ক্রমিক গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন ১৯৩০ এর দিকে। এর আগে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করতেন মহাবিশ্ব অসীম আকার এবং

---

[৬৩] থমাস কুহন–মৃত্যু ১৯৯৬। পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক, 'প্যারাডাইম শিফট' ধারণার জনক। থমাস কুহন, ফিলোসফি অফ সায়েন্সের প্রধানতম দার্শনিকদের অন্যতম। অ্যাকাডেমিক প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা, দু-দিক থেকেই তার বিখ্যাত রচনা The Structure Of Scientific Revolutions-কে গত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বইগুলোর মধ্যে ধরা হয়। এই বইতে দেয়া কুহনের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অনেক পোস্ট-মর্ডানিস্ট দার্শনিক অবজেক্টিভ সায়েন্টিফিক ট্রুথ বা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক সত্যের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। যদিও কুহন নিজে এ অবস্থান সমর্থন করতেন না। ~ অনুবাদক

[৬৪] কার্ল পপার–মৃত্যু, ১৯৯৪। ফিলোসফি অফ সায়েন্সের আরেক দিকপাল। Falsifiability বা বাতিলযোগ্যতা/মিথ্যায়ন তত্ত্বের জনক। ~ অনুবাদক

[৬৫] বিগ ব্যাং থিওরি (Big Bang Theory)—বিগ ব্যাং অর্থাৎ মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে এ পর্যন্ত চলে আসা ধারণাগুলোর মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, আজ থেকে প্রায় ১ হাজার ৩৭৫ কোটি বছর আগে থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় একটি অতি ঘন এবং উত্তপ্ত অবস্থা থেকে। প্রায় শূন্য থেকে মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলে স্থান, শক্তি ও পদার্থসহ মহাবিশ্ব তৈরি হয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে এক সুপ্রাচীন বিন্দুর মতো অবস্থা থেকে। তারপর থেকে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। ~ অনুবাদক

বয়সের এক অনন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় আছে, যাকে স্টেডি স্টেইট মডেল বলা হয়।[৬৬] চিরন্তন মহাবিশ্বের এ ধারণা অবশ্যই কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ কুরআনে মহাবিশ্বকে তাঁর এক সীমিত সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ভেবে দেখুন, কুরআনকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার জন্য সে সময়কার মুসলিমরা যদি স্টেডি স্টেইট মডেলের আলোকে বিভিন্ন আয়াতের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করত, তাহলে কী হতো? কয়েক দশক পর নিজেদের অবস্থান বদলাতে তারা বাধ্য হতো। কারণ, ততদিনে স্টেডি স্টেইট মডেল বাতিল হয়ে গেছে এবং বিগ ব্যাং থিওরি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একইভাবে আজকের যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সত্য ধরে নিয়ে সেগুলোর আলোকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে অনেকে ব্যাখ্যা করছে, সেই তত্ত্বগুলো যে তিন-চার দশক পর ভুল প্রমাণিত হবে না তার নিশ্চয়তা কী? বিজ্ঞানের ক্রমপরিবর্তনশীন এবং উত্থান-পতনের ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন হবার সম্ভাবনাই বরং জোরালো মনে হয়।

দিনশেষে, বিজ্ঞান বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিনিধিত্ব করে না এবং কখনো যে করবে তাও আসলে বলা যায় না। কমসেকম আজকের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন দাবি করা যায় না। অন্য দিকে আল্লাহর কালাম নিখুঁত। কাজেই মানবরচিত এবং সহজাতভাবে অপূর্ণ, দুর্বল এবং ক্রমপরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের ১০০% সামঞ্জস্যের দাবি করা যথাযথ না।

তার মানে কি আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা করব না? বিজ্ঞানের বিভিন্ন আইডিয়ার আলোকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে পারব না? পারব। এভাবে চিন্তা করে অনেক মুসলিমের ঈমান মজবুত হয়। তাই এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়ার কিছু নেই। কিন্তু নিজস্ব এসব চিন্তাভাবনা যদি 'তাফসীরে' পরিণত হয়, মানুষ যদি সেটা অন্যকে বলে বেড়াতে শুরু করে অথবা কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে ঢালাও কোনো দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা। কুরআনের যেকোনো ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হলে সেটা অবশ্যই তাফসীরের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং আল্লাহর কালামের প্রতি যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার।

---

[৬৬] স্টেডি স্টেইট মডেল (steady state model)–এই মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্ব চির সম্প্রসারণশীল। কিন্তু তার গড় ঘনত্ব সর্বদা ধ্রুব। মহাবিশ্বের প্রসার আছে, কিন্তু প্রসারিত শূন্যস্থানে নিরন্তর নতুন বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে সময়ের সাথে মহাবিশ্বের চেহারা অপরিবর্তিত থাকছে। ক্রমবর্ধমান মহাজগতে যেকোনো সময়ে পদার্থের ঘনত্ব অপরিবর্তিত। স্টেডি স্টেইট তত্ত্বে কোনো 'বিগ ব্যাং' তথা 'মহাবিস্ফোরণ' নেই। মহাবিশ্ব এক অনন্ত স্থিরাবস্থায় আছে। ~ অনুবাদক

'যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে, সে সঠিক বললেও অপরাধ করলো (এবং সঠিক ব্যাখ্যা করলেও-সে ভুল করলো)'।[৬৭]

২। কুরআন বিজ্ঞানের পাঠ্যবই না

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কুরআন বিজ্ঞানের পাঠ্যবই না। তবে কথাটা বলার সময় অনেকে পরোক্ষভাবে অন্য কিছু বুঝিয়ে থাকে। কিছু মুসলিম যেমন বিজ্ঞান আর কুরআনের সম্পর্কের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দাবি করে কুরআন আর বিজ্ঞান কখনো সাংঘর্ষিক হতে পারে না, তেমনিভাবে আরেকদল মুসলিম বলে, কুরআন বিজ্ঞানের পাঠ্যবই না। তারা বোঝাতে চায় মহাবিশ্ব আর পার্থিব বাস্তবতার ব্যাপারে কুরআনের (এবং ধর্মের) কিছু বলার নেই। এ রকম মুসলিমরা মনে করে ধর্ম আর বিজ্ঞানের বলয় আলাদা এবং স্বতন্ত্র। ধর্ম আর বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব এবং প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্র আলাদা। বায়োলজিস্ট স্টিফেন জেই গুল্ড[৬৮] এ ধারণার নাম দিয়েছেন, নন ওভারল্যাপিং ম্যাজিস্টেরিয়া (Non-overlapping Magesteria–NOMA)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, চারপাশের পৃথিবী নিয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে বিজ্ঞান। এই কর্তৃত্ব বিজ্ঞানের। আর নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য–ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেবে ধর্ম। এখানে কর্তৃত্ব ধর্মের। ধর্ম আর বিজ্ঞানের রাজ্য আলাদা। একজন আরেকজনের রাজ্যে নাক গলাবে না।

কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে, ইসলামের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। চারপাশের পৃথিবী নিয়ে অনেক বক্তব্য কুরআনে আল্লাহ্ আমাদের জানিয়েছেন। কুরআন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে না ঠিক, কিন্তু বিশ্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে বক্তব্যে কুরআন পরিপূর্ণ। কুরআনের মাধ্যমে এমন কী কী তথ্য আল্লাহ্ আমাদের জানিয়েছেন তার কিছু উদাহরণ দেখা যাক–

১। মহাবিশ্ব সৃষ্ট

২। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং দুনিয়াতে তাদের কার্যক্রম

৩। জ্বিনের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম

৪। সক্রিয় মস্তিষ্কের অবর্তমানেও চেতনার (consciousness) অস্তিত্ব থাকে (রূহ)

৫। মৃত্যু এবং মৃতদেহের পচনের পর পুনরুত্থান

---

[৬৭] আবু দাউদ, তিরমিযী

[৬৮] স্টিফেন জেই গুল্ড—মৃত্যু : ২০০২। ইভ্যুলুশানারি বায়োলজিস্ট এবং বিজ্ঞান নিয়ে অনেক জনপ্রিয় বইয়ের লেখক। ~ অনুবাদক

৬। জান্নাত ও জাহান্নাম

৭। ইসরা ওয়াল মি'রাজ

৮। বিভিন্ন নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) মু'জিযা (চাঁদের দ্বিখণ্ডিতকরণ, লোহিত সাগর দু-ভাগ হওয়া, মৃতকে পুনর্জীবিত করা)

৯। কিছু মানুষের অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন (যেমন নূহ আলাইহিস সালাম, আসহাবে কাহফ)

১০। আল্লাহর আরশ এবং কুরসি

১১। সাত আসমান

১২। আসমান, পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ কর্তৃক কুরআনের আমানাহ/নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি

১৩। বিভিন্ন জীবজন্তু মহান আল্লাহর তাসবীহ করে। নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) সাথে বিভিন্ন জীবজন্তুর কথোপকথন

১৪। জান্নাতে আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি

১৫। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দেয়া ক্ষমতা

১৬। জাদু এবং নজরের অস্তিত্ব

১৭। কবরের জীবন

১৮। ক্রমাগত অনুশোচনাহীনভাবে গুনাহ করার কারণে আল্লাহ বিভিন্ন জনপদ এবং মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছেন

১৯। বারাকাহর বাস্তবতা

আমি ইচ্ছে করেই এমন উদাহরণ আনলাম যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো ছাড়াও, কুরআনের অনেক আয়াতে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা এসেছে, যেমন বৃষ্টি, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের গঠন, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি ইত্যাদি।

এই আয়াতগুলো পড়ার পর আজকের বিজ্ঞানময় যুগের একজন মুসলিম কী উপসংহার টানবে? আমরা কি ধরে নেব যে এই সবগুলো আয়াত রূপক অথবা মিথ? এগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেয়া? আশা করি অধিকাংশ মুসলিম এভাবে চিন্তা করে না।

নাকি আমরা ধরে নেব এই আয়াতগুলোতে মুজিযা, কারামাত এবং গাইবের (অদৃশ্য জগৎ) কথা বলা হচ্ছে, যা বিজ্ঞান এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আওতার বাইরে?

নাকি আমরা এই দুই অবস্থানের একটা মিশ্রণ করার চেষ্টা করব?

ওপরের সবগুলো উদাহরন কিন্তু মুজিযা বা কারামতের শ্রেণিতে পড়ে না। সবগুলো গাইবের আওতাধীন কি না, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। আধুনিক মুসলিমদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত একটা ধারণা হলো, দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান জগতের সীমারেখা গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সীমারেখার সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। সম্ভবত নন-ওভারল্যাপিং ম্যাজেস্টেরিয়ার ধারণার সাথে সুন্দরভাবে মিলে যাওয়ার কারণেই অনেকে এমন মনে করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু এ ধারণা আসলে সঠিক না।

কথাটা এভাবে বলা যায়—ক্লাসিকাল আলিমগণ গাইব (অদৃশ্য) আর হিস্‌স (দৃশ্যমান/উপলব্ধিযোগ্য)-এর যে বিভাজন করেছেন, তা যদি গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সীমারেখার আধুনিক পশ্চিমা ধারণার সাথে হুবহু মিলে যায় তাহলে সেটা বেশ বিস্ময়কর রকমের কাকতালীয় ঘটনা, তাই না?

হিগস-বোসনের মতো সাব-অ্যাটমিক পার্টিকেলকে কি গাইবের অংশ ধরা হবে, যেভাবে জিন জাতি গাইবের অংশ? হিগস-বোসন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের কাছে অদৃশ্য। অল্প কিছুদিন আগে পার্টিকেল কোলাইডারের মাধ্যমে আমরা হিগস বোসনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেয়েছি। কিন্তু কারও চোখ কোনোদিন হিগস বোসন দেখেনি এবং দেখবেও না।

এ ধরনের শ্রেণিবিভাগের জটিলতা থেকে মূল সমস্যাটা পরিষ্কার হয়—এমন কোনো নীতিমালা এবং শ্রেণিবিভাগ আমাদের কাছে নেই, যা একই সাথে ক্লাসিকাল আলিমদের অবস্থান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা কিছু আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে অদৃশ্য, সেটা গাইবের অন্তর্ভুক্ত'—এমন ঢালাও বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব না। কারণ, বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। আজ যেটা বিজ্ঞানের কাছে অদৃশ্য, সেটা কাল দৃশ্যমান হতে পারে। তখন কি সেটা গাইবের জগৎ থেকে বের হয়ে যাবে? কোনো কিছু গাইবের—অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সেই জিনিসের সহজাত প্রকৃতির সাথে জড়িত। কোন বিজ্ঞানী, কোন সময়, কী গবেষণা করছে সেটার ওপর তো এটা নির্ভর করতে পারে না!

কাজেই দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যের শ্রেণিবিভাগজনিত এ জটিলতাকে ঢালাও বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি নিজে এ ধরনের কোনো শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা করব না এবং এতে আমার আগ্রহও নেই। এটা নিয়ে চিন্তা করার কাজ আমরা যোগ্য, উপযুক্ত আলিমদের জন্য ছেড়ে দিতে পারি। তবে যে বিষয়টা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা হলো, আমরা যখন কুরআন পড়ি তখন মহাবিশ্বের মৌলিক প্রকৃতির ব্যাপারে এমন অনেক কিছু জানতে পারি, যা বিজ্ঞান কখনোই আমাদের জানাতে পারবে না। বিজ্ঞান যেসব তথ্য দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সূক্ষ্ম এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তথ্য আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি।

আমার মনে হয়, আধুনিক যুগে বসবাস করার কারণে ওপরের লিস্টে আসা বিষয়গুলোর বাস্তবতা আমরা অতটা গভীরভাবে অনুভব করি না, যেভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা স্বীকৃত বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপারে আমরা অনুভব করি। এমন অনেক মুসলিম আছে, যারা বিজ্ঞান নিয়ে কোনোদিন পড়াশোনা করেনি। সায়েন্টিফিক কোনো রিসার্চ পেপার জীবনে পড়ে দেখেনি, কখনো কোনো ল্যাবরেটরির ভেতর ঢোকেনি। কিন্তু সে চরম আত্মবিশ্বাস (ইয়াক্বীন) নিয়ে বিবর্তনবাদ কিংবা পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। অথচ ফেরেশতা, জ্বিন কিংবা বারযাখের জীবন নিয়ে একই ধরনের আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে কাজ করে না। আমার এ লেখার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের মূল্য কিংবা বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা না। কিন্তু উম্মাহর মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমাগত বাড়ছে। আর এটা আধুনিক মুসলিমদের এপিস্টেমোলজি[৬৯] এবং অন্টোলজির[৭০] ভগ্নদশার উপসর্গ।

তাহলে এত কথার শেষে মূল বার্তা কী?

নন-ওভারল্যাপিং ম্যাজেস্টেরিয়ার ধারণা আমাদের বাদ দিতে হবে। মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্ব কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে অনেক জ্ঞান কুরআনে এসেছে। আমরা যখন বলি চারপাশের পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব বিজ্ঞানের, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কুরআনে বর্ণিত বাস্তবতা আমাদের চিন্তায় পেছনের সারিতে চলে যাবে। সত্যতা এবং যথার্থতার দিক থেকে সেগুলোর অবস্থান চলে যাবে বিজ্ঞানের স্বীকৃত জিনিসের নিচে। এর ফলে ঈমানী ও আত্মিক অবস্থার ওপর যে গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, তা সহজেই বোধগম্য। আমাদের প্রত্যেকের উচিত কুরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্যগুলো জানার, বোঝার এবং আত্মীকরণের চেষ্টা করা। যাতে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ইয়াক্বীন তৈরি হয়, যা আমাদের ভেতর সেগুলোর বাস্তব হওয়ার তীব্র অনুভূতি তৈরি করবে।

এক সত্তা প্রতিনিয়ত আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ–পাহাড়পর্বত, আসমান-যমীন এবং এর মধ্যেকার সবকিছু (যে সৃষ্টিগুলোকে

---

[৬৯] এপিস্টেমোলজি (Epistemology)–বাংলায় জ্ঞানতত্ত্ব। দর্শনের ওই শাখা, যা জ্ঞান, মানবীয় জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎস ও সীমানা নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞান কী? জানার অর্থ কী? জ্ঞানের উৎসগুলো কী? জ্ঞান অর্জনের পথ কী? জ্ঞানের সাথে ধারণা, দাবি, কুসংস্কার কিংবা ব্যক্তিগত মতের পার্থক্য কী–এ ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে এপিস্টেমোলজির আলোচনা। ~ অনুবাদক

[৭০] অনটোলজি (Ontology)–বাংলায় পরাবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। কী আছে, কী নেই? কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব? অস্তিত্বশীল কী? অস্তিত্বশীল হবার অর্থ কী? বস্তু কী? সত্তা কী? অন্টোলজি আলোচনা করে এ ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে। ~ অনুবাদক

আমরা জড় বা অচেতন মনে করি সেগুলোও) প্রতিনিয়ত আল্লাহর তাসবীহ করছে– আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে, যত তুচ্ছ যত ছোট হোক, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে–এ কথাগুলো আমরা সত্য বলে জানি। কিন্তু এই সত্যগুলো এমনভাবে আত্মীকরণের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা এ বাস্তবতা গভীরভাবে অনুভব করছি।

বিজ্ঞানে 'বহুত্ববাদের' স্থান নেই

এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মতবৈচিত্র্যের কোনো স্থান নেই। বহুত্ববাদের ধারণা সেখানে খাটে না। বিজ্ঞানের কথাই ধরুন। ধরে নেয়া হয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রশ্নের কেবল একটা সঠিক উত্তর আছে। কোনো ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থিওরি থাকতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেকোনো একটা থিওরিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানীদের কাজ হলো বিশ্লেষণ, গবেষণা, অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক থিওরিটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।

কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের মনোভাব পুরোপুরি আলাদা। আমাদের শেখানো হয়, কোনো ধর্মকে পুরোপুরি সঠিক বা ভুল মনে করা যাবে না; বরং ধর্ম হলো ব্যক্তিগত পরিচয় আর অনুভূতির ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষ নিজের মতো করে ধর্মকে অনুভব করে। ধর্ম তথ্যপ্রমাণ আর জ্ঞান নিয়ে কাজ করে না, তাই কোনো এক ধর্মকে সঠিক বা সত্য বলে বিবেচনা করা যায় না। ধর্মের ব্যাপারে কেউ এই 'সাবজেক্টিভিস্ট'[৭১] দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে তার মধ্যে কোনো-না-কোনোভাবে 'সব ধর্মই সত্য' মনে করার প্রবণতাও কাজ করতে পারে ।

কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে সব সময় এভাবে চিন্তা করা হতো না; বরং আজ যেভাবে বিজ্ঞানের ব্যাপারে মানুষ চিন্তা করে, ইতিহাসের অধিকাংশ সময়জুড়ে ধর্মকে দেখা হতো অনেকটা সেভাবে। মানুষ মনে করত, বাস্তবতাকে বোঝার মানে স্রষ্টাকে বোঝা, আর স্রষ্টাকে বোঝার মানে স্রষ্টা কী বলেছেন তা বোঝা জরুরি। এটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার না যে, সাধারণত অতীতে সমাজের সবচেয়ে জ্ঞানী এবং শিক্ষিত মানুষরা সবচেয়ে ধার্মিকও হতেন। আগেরকার যুগে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিতর্কগুলো হত

---

[৭১] Subjective থেকে। বাংলায়–ব্যক্তিক, আত্মবাদী। ধর্মের ব্যাপারে সাবজেক্টিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপসংহার হলো, কোন ধর্ম সঠিক (আর কোন ধর্ম ভুল) সেটা জানার কোনো সর্বজনীন, ধ্রুব, বস্তুনিষ্ঠ উপায় নেই অথবা এবং এ প্রশ্নের আদৌ কোনো সঠিক উত্তর নেই। স্থান-কাল-পাত্র-সমাজ-সভ্যতা ভেদে একেক সময় একেক ধর্মকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সব একইভাবে সঠিক কিংবা ভুল। যে যেটাকে সত্য মনে করে তার জন্য সেটাই সঠিক। ~ অনুবাদক

ধর্মতাত্ত্বিক বা আকীদাহগত বিষয়ে। যেমন খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে বিতর্ক হতো আল্লাহর প্রকৃতি, তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু আজকে যেসব বিতর্ক হয়, সেখানে বিতর্কের বিষয়বস্তু থাকে নৈতিকতার বিভিন্ন ধারণা, যেমন মানবাধিকার, নারী অধিকার, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

এখানে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার। ধর্মের ব্যাপারে অবজেক্টিভিস্ট[৭২] দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা মানে সহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে যাওয়া না। কেউ যদি মনে করে তার ধর্মই সঠিক, অন্য সব ধর্ম ভুল, তার মানে এটা না যে সে অন্য ধর্মের লোকের প্রতি অসহিষ্ণু হবে।

দেখুন, আধুনিক সেক্যুলার সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপারে অবজেক্টিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কিন্তু তবুও ওইসব লোকের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয় যারা বিজ্ঞানের ব্যাপারে অজ্ঞ অথবা একেবারে ভুল ধারণা রাখে। তবে কারও ভুল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালে সমাজ সেখানে সীমা টানে। উল্লেখ্য, এখানে 'ক্ষতি'র সংজ্ঞা ঠিক করা হয় ওই সময়ে কোনো বৈজ্ঞানিক প্যারাডাইমকে সঠিক মনে করা হচ্ছে তার সাপেক্ষে। ভ্যাকসিন নিয়ে বিতর্ক এর একটা ভালো উদাহরণ। শিশুদের ওপর ভ্যাকসিনের প্রভাব ভালো নাকি মন্দ, এটা নিয়ে মানুষ যা ইচ্ছে তা-ই বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু একসময় সরকারকে টীকাদান বাধ্যতামূলক করার ম্যান্ডেট দেয়া হলো। সরকার বলল প্রত্যেক শিশুকে টীকা দিতে হবে। কারণ, তখন ধরে নেয়া হয়েছিল, মানুষ যদি ভ্যাকসিনের ব্যাপারে তাদের 'ভুল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস'গুলো আঁকড়ে ধরে রাখে, তাহলে একটা নির্দিষ্ট সীমার পর সমাজের ওপর সেটার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

হয়তো ইসলামের সহিষ্ণুতাকেও আমরা একইভাবে দেখতে পারি। ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলিম এবং ইসলামের সহিষ্ণুতার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কর্তৃত্বশালী প্যারাডাইমের—অর্থাৎ ইসলাম—অবস্থান থেকে ভুল মনে করা হয়, এমন কোনো বিশ্বাস বা অবস্থান নেয়ার সুযোগ ছিল। তবে সেই সহিষ্ণুতার একটা সীমা ছিল। আজকের সেক্যুলার সমাজের ব্যাপারটাও একইরকম। যদিও আমরা বিষয়টাকে ওইভাবে দেখি না।

---

[৭২] সাবজেক্টিভিস্ট অবস্থানের বিপরীত। অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে অবজেক্টিভিস্ট অবস্থান হবে: সত্য ধর্ম আছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, নৈতিকতার মানদণ্ড, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সঠিক, ইত্যাদি। ~ অনুবাদক

বিজ্ঞানের বাস্তবতা

একজন অন্ধ, বধির, বোবা লোকের কথা চিন্তা করুন। তার জন্য দুনিয়াকে জানার একমাত্র মাধ্যম স্পর্শ। ধরুন, তার অবস্থা আরও খারাপ। চারপাশের দুনিয়াকে সে সরাসরি স্পর্শ করতে পারে না। তার হাতে একটা সুঁই ধরা। বিভিন্ন জিনিসের ওপর সুঁইয়ের ডগা ঘষে সে স্পর্শের অনুভূতি পায়। তার জন্য এই ছোট্ট সুঁইয়ের ছোট্ট ডগা হলো মহাবিশ্বের সুবিস্তৃত বাস্তবতাকে জানার একমাত্র উপায়। একমাত্র জানালা।

এই মানুষটা যদি তার নিজের মতো করে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তাহলে সেটা আমাদের কাছে কত অদ্ভুত শোনাবে চিন্তা করুন। নিজের কাছে থাকা অতি সীমিত তথ্য দিয়ে পৃথিবী, মহাবিশ্ব, মানবজাতির অস্তিত্বের অর্থের মতো বিষয়গুলো সে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। যদি সে দাবি করে, তার সুঁইয়ের ডগা দিয়ে যা অনুভব করা যায় শুধু ওই জিনিসগুলোরই অস্তিত্ব আছে–তাহলে সবাই খুব আমোদিত হবে।

আচ্ছা এবার চিন্তা করুন, লোকটার হাতে সুঁই নেই। তার হাতে একটা সুতো আছে। বিভিন্ন জিনিসের ওপর এই সুতো টেনে টেনে সে বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর পর্যবেক্ষণের অবস্থা হলো এই সুতো টানা মানুষের মতো।

কথাটা শোনাতে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর খুব অল্প এক ফালি মানুষের কাছে দৃশ্যমান। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এমন কিছু তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ আমরা সনাক্ত করতে পারি, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন না, যেমন ইনফ্রারেড রশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি। হয়তো তথ্যের এমন আরও অনেক পথ আছে বা অস্তিত্বের এমন অনেক স্তর আছে, প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা নেই। আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হলেও এমন কিছু যে আসলে নেই, সেটা আমরা কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছি?

আমাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা নিয়ে ভেবে দেখুন। কী জানি না, সেটা জানার কোনো উপায়ও আমাদের নেই। ভাগ্য ভালো হলে পথ চলার সময় হোঁচট খেতে খেতে আমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করি। জানতে পারি, মহাবিশ্বের বিশালতার তুলনায় আমাদের এই

পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অথচ এই ছোট্ট পৃথিবীর ব্যাপারেও অনেক কিছু এখনো আমাদের অজানা। কাজেই আমরা যে এখনো বাস্তবতার ব্যাপারে মোটাদাগে অন্ধকারেই আছি, এটা মনে করা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না।

এবার আমাদের মানসিক সক্ষমতার কথা ভাবুন। মানুষের উপলব্ধি করার ক্ষমতা অবধারিতভাবে তার মস্তিষ্কের তথ্য 'প্রক্রিয়াকরণের' ক্ষমতার সাথে যুক্ত। কোনো তথ্য সচেতনভাবে উপলব্ধি করার জন্য আগে সেটা প্রসেস করতে হবে। এমন কি হতে পারে যে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় কিছু কিছু জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করে বা সনাক্ত করতে পারে, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলো 'দেখতে' পায় না? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব না, কারণ কোনো কিছু 'মিস' করছি কি না, মস্তিষ্কের 'বাইরে' বের হয়ে সেটা যাচাই করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই চরম সীমাবদ্ধতার কথা বিজ্ঞান পরোক্ষভাবে স্বীকার করে। আধুনিক বিজ্ঞানের ঐকমত্য অনুযায়ী মানুষ বিবর্তিত বানর (ape) ছাড়া আর কিছু না। আমাদের উপলব্ধি আর চিন্তাশক্তি নাকি বিবর্তিত হয়েছে খাবার উপযোগী ফল আর প্রজননের সম্ভাব্য সাথি খুঁজে বের করার জন্যে। এটা বিজ্ঞানেরই কথা। আবার সেই একই বিজ্ঞান ধরে নিচ্ছে বানর-জীবনের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য বিবর্তিত এই মস্তিষ্ক আর চিন্তাশক্তি নাকি মহাবিশ্বের গভীরতা অনুসন্ধান, অস্তিত্বের তাৎপর্য নিয়ে ভাবা, মানবপ্রকৃতি থেকে শুরু করে নৈতিকতার জৈবিক উৎস নিয়ে দার্শনিক আলাপে মেতে ওঠার জন্য উপযুক্ত।

ব্যাপারটা হাস্যকর রকমের ঔদ্ধত্যপূর্ণ না?

বাস্তবতার বর্ণনায় ইসলাম ও বিজ্ঞানের সংঘাত

কুরআন এবং হাদীসে এমন বক্তব্য এসেছে যেগুলো থেকে মনে হয় পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় না। সূরা কাহফের এ আয়াতটির কথা চিন্তা করুন,

চলতে চলতে যখন সে (যুলকারনাইন) সূর্যের অস্তগমন-স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম: হে যুলকারনাইন, তুমি তাদের শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো। [তরজমা, সূরা আল-কাহফ, ৮৬]

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীসটি,

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কি জানো, এ সূর্য কোথায় যায়? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : এ সূর্য চলতে থাকে এবং (আল্লাহ তা'আলার) আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, উঠো এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও! অনন্তর সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল দিয়েই উদিত হয়। তা আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, উঠো এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই উদিত হয়।

সে আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থান-স্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, উঠো এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই সে উদিত হয়। এমনিভাবে চলতে থাকবে; মানুষ তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু হতে দেখবে না। শেষে একদিন সূর্য যথারীতি আরশের নিচে তার নির্দিষ্ট-স্থলে যাবে। তাকে বলা হবে, উঠো এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। অনন্তর সেদিন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন দিন সে অবস্থা হবে তোমরা জানো? সে দিন ওই ব্যক্তির

ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি।[৭৩]

এই আয়াত এবং হাদীসগুলোকে কীভাবে বোঝা উচিত? এগুলোকে রূপক বলে দেয়া সোজা। হয়তো আসলেই এই আয়াত এবং হাদীসে কিছুটা রূপকার্থে বলা হয়েছে। কিন্তু ঢালাওভাবে সবগুলোকে রূপক বলার সিদ্ধান্ত একটু নড়বড়ে বলে মনে হয়। আর কোনো বিকল্প কি নেই?

ধরুন, মহাবিশ্বের ব্যাপারে দুজন মানুষের জ্ঞান সমানভাবে সঠিক। দুজন দুইভাবে তাদের জ্ঞান প্রকাশ করে। একই জিনিসের বর্ণনা দেয়ার সময় দুজন আলাদা ধরনের ভাষা, ছবি এবং ধারণা ব্যবহার করে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে আক্ষরিকভাবে কোনো কিছু বর্ণনা দেয়ার সময়ও এ দুজনের ভাষা এবং বর্ণনা আলাদা হতে পারে।

একটা সহজ উদাহরণ দেখুন। সিংহের জন্য বেদুইন আরবদের অনেক নাম আছে। বরফ বোঝানোর জন্য এস্কিমোরা অনেক ধরনের শব্দ ব্যবহার করে। সিংহের ব্যাপারে আরব বেদুইন কিংবা বরফের ব্যাপারে একজন এস্কিমো যেভাবে কথা বলে, একজন প্রাণীবিদ কিংবা আবহাওয়াবিদ সেভাবে কথা বলে না। তার মানে কিন্তু এই না যে আরব বা এস্কিমো রূপক অর্থে কথা বলছে আর প্রাণীবিদ বা আবহাওয়াবিদ আক্ষরিকভাবে বর্ণনা দিচ্ছে। সবাই আক্ষরিকভাবে কথা বলছে, কিন্তু আরব-এস্কিমোদের ভাষায় এমন কিছু ধারণা আছে, যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানীদের ভাষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর মধ্যে অনুপস্থিত। আবার এর উল্টোটাও সত্য।

আধুনিক সময়ের মানুষ এটা ধরে নিতে অভ্যস্ত যে বিজ্ঞানের ভাষা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবতার বর্ণনা দেয়। কিন্তু আমরা—মুসলিমরা এটা মেনে নিতে বাধ্য না। এটা মেনে নেয়া আবশ্যিক না এবং এটা মেনে নেয়া উচিতও না, কারণ বিজ্ঞানের ভাষা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে।

ব্যাপারটার আরও গভীরে যাওয়া যায়। মনে করুন, দুজনের মানুষের মধ্যে প্রথম জন মহাবিশ্বের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয় জন রাখে না, তবে সে মনে করে মহাবিশ্বের ব্যাপারে তার জ্ঞান সঠিক।

এবার আগের উদাহরণে ফিরে যাওয়া যাক। সিংহের ব্যাপারে বেদুইনের জ্ঞান শতাব্দীর পর শতাব্দী সিংহের সাথে একই পরিবেশে বসবাস করা অসংখ্য প্রজন্মের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার ফসল। অন্যদিকে প্রাণীবিদ ওই পরিবেশে আসে বাইরে থেকে, অল্প কিছুদিনের জন্য। কয়েক মাস ফিল্ডওয়ার্ক করে সে আবার বাড়ি ফিরে যায়। তাই

[৭৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান

এ দুজনের মধ্যে সিংহের ব্যাপারে বেদুইন যে আরও ভালো ধারণা রাখে সেটা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া প্রাণীবিদ্যা তুলনামূলকভাবে নতুন শাস্ত্র। তাই এ দুজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেদুইনের ভাষা আরও সমৃদ্ধ হবে যেহেতু এই ভাষায় বেদুইনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ গভীর জ্ঞানের ছাপ আছে।

কিন্তু প্রাণীবিদ এ কথাটা মেনে নিতে চাইবে না। সে মনে করে বেদুইনরা অজ্ঞ। সে মনে করে সিংহের ব্যাপারে প্রাণীবিদদের জ্ঞানের তুলনায় বেদুইনের জানাশোনা তেমন কিছুই না। এই ধারণাকে সত্য প্রমাণের জন্য, বেদুইন কীভাবে সিংহের বর্ণনা দেয় সেটা প্রাণীবিদ তুলে ধরবে। তারপর বলবে বেদুইনের এই বর্ণনা ভুল। কিন্তু বেদুইনের বর্ণনাকে সে কিসের ভিত্তিতে 'ভুল' বলছে? তার নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে। আর আমরা ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছি যে সিংহের ব্যাপারে প্রাণীবিদের চেয়ে বেদুইনের জ্ঞান আরও গভীর এবং সমৃদ্ধ। প্রাণীবিদ তবু আত্মবিশ্বাসের সাথে বলবে বেদুইনরা আসলে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

এটা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের অজ্ঞতাপূর্ণ, করুণ ঔদ্ধত্যের অবস্থা।

প্রথমে ধরে নেয়া হয়, বিজ্ঞানের ভাষাই বাস্তবতার বর্ণনা দেয়ার একমাত্র সঠিক, আক্ষরিক এবং গ্রহণযোগ্য ভাষা। তারপর বিজ্ঞান ধরে নেয় মহাবিশ্ব আসলে কেমন সেটা সে জানে। অথচ এ দুটোই ধারণা। দুটো ধারণাকেই প্রত্যাখ্যান করা যায় এবং আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

একটা জিনিস ভেবে দেখুন। বিজ্ঞান নিয়ে স্কুলে যা যা শেখানো হয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ, তার অধিকাংশ শেখানো হয় নিউটোনিয়ান ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেকেই এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে মহাবিশ্বের স্থানিক মাত্রার (spatial dimension) সংখ্যা তিনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার বাইরেও মাত্রা থাকতে পারে। অভিকর্ষের ক্ষেত্রে নন-ইউক্লিডিয়ান গণিত; যেমন রাইমেনিয়ান জ্যামিতি ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে এভাবে চিন্তা করার শুরুটা করেছিলেন আইনস্টাইন।

গত কয়েক দশকে স্ট্রিং থিওরিতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা এমনও বলেছে যে মহাবিশ্বের ২১ টি মাত্রা থাকতে পারে। অবশ্য এ সবই তাদের জল্পনা-কল্পনা, কোনো কিছুই প্রমাণিত না। আসল বাস্তবতা কী, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের যে সীমাকে আজ গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, তার মধ্য থেকেই মহাবিশ্বের বর্ণনা দেয়ার

জন্য 'সমতল' কিংবা 'আসমানকে গুটিয়ে নেয়া'র মতো কথাগুলো বলা যেতে পারে।[৭৪] চতুর্মাত্রিক জগতে কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুকে মুড়িয়ে নেয়া সম্ভব। ঠিক যেভাবে ত্রিমাত্রিক জগতে একটা দ্বিমাত্রিক বৃত্তকে মুড়িয়ে নেয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানের ভাষা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। মহাবিশ্বের ব্যাপারে বিজ্ঞানের জ্ঞানও বদলাচ্ছে। এই ক্রমপরিবর্তনশীল ধ্যানধারণার মাপকাঠিতে কেন আমরা আল্লাহর কালামকে বিচার করতে যাব?

কুরআনের যে আয়াত এবং হাদীসগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো আমার খুব পছন্দের। এগুলো আমার কাছে অমূল্য রত্নের মতো। যখনই এগুলো পড়ি তখন আমার ঈমান আরও শক্তিশালী হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়। কারণ, এখানে আল্লাহ আমাকে এমন কিছু জানাচ্ছেন, এমন কিছুর ব্যাপারে সচেতন করছেন, যা আধুনিক বিজ্ঞান এখনো জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। ওপরে উল্লেখ করা সূরা আল-কাহফের আয়াত এবং হাদীসটি এ কারণে আমার খুব প্রিয়। এ আয়াত এবং হাদীসগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং শক্তিশালী। তড়িঘড়ি করে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এগুলোর ব্যাখ্যা করা কিংবা এগুলো রূপক সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলোকে বাস্তবতার বিশুদ্ধ, অবিকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত, যে বিবরণ আমাদের জানাচ্ছেন আল্লাহ–বাস্তবতার স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র মালিক।

আল্লাহ আমাদের ঈমানকে মজবুত করে দিন, তাঁর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়গুলো আলোকিত করে দিন এবং শয়তানের কুমন্ত্রণার বিপরীতে সুরক্ষিত করে দিন।

---

[৭৪] আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে বলেন (তরজমা) :
সেদিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবই।

লিবারেলিসম

লিবারেলিসম ও অজাচার

পশ্চিমে অজাচার এখনো বেআইনি। মাঝেমধ্যেই অজাচারে লিপ্ত বিভিন্ন দম্পতির গ্রেপ্তারীর খবর দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যায় অজাচারের ব্যাপারে পশ্চিমের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসছে। প্রায় সবক্ষেত্রে দেখা যায় ধরাবাঁধা কিছু কথা–

ওরা দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। যা করেছে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে করেছে।

ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। এটাই তো যথেষ্ট।

কোনো কিছু আমাদের কাছে জঘন্য লাগলেই সেটাকে অনৈতিক কেন মনে করতে হবে? আর কেনই-বা এটা বেআইনি হবে?

ওদের গ্রেপ্তার কেন করা হলো? ওরা কারও ক্ষতি তো করছে না!

এখানে থেমে কয়েকটা প্রশ্ন করা যাক।

যে কাজে অন্যের ক্ষতি হয় না সেটা নৈতিক, যে কাজে অন্যের ক্ষতি হয় তা অনৈতিক– এটা কে ঠিক করে দিলো? অন্যের ক্ষতি হলেই সেটা অনৈতিক কেন হবে? অন্যের ক্ষতি জিনিসটাকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী আছে? হ্যাঁ, ইচ্ছে করে কারও ক্ষতি করার বিষয়টা হয়তো আমাদের খারাপ লাগতে পারে, জঘন্য লাগতে পারে। আমাদের রাগ হতে পারে। কিন্তু তার মানে কি এটা অনৈতিক?

নৈতিকতার দর্শনে 'ইমোটিভিসম' (emotivism) নামে এক থিওরি আছে। ইমোটিভিসম বলে নৈতিক অবস্থানগুলো আসলে আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। আমরা যখন বলি–'ক' কাজ খারাপ, তখন আসলে বলছি–'ক' কাজটা আমার খারাপ লাগে। অর্থাৎ আমার 'খারাপ লাগাটাই' এখানে মুখ্য। এর বাইরে অন্য কোনো গভীর তাৎপর্য 'খারাপ' শব্দটার নেই। আর অনুভূতি–ভালো লাগা, খারাপ লাগা– এগুলো আপেক্ষিক। আমার কাছে 'ক' কাজ খারাপ লাগে, কিন্তু আরেকজনের কাছে ভালো লাগতেই পারে। কেউ যদি দাবি করে 'ক খারাপ' হওয়াটা সর্বজনীনভাবে সত্য, নির্মোহ

ও নিরপেক্ষভাবে সত্য, সব ক্ষেত্রে, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–তাহলে সে ক্যাটাগরি এরর করছে।[৭৫] ধরুন আমার ডাব খেতে ভালো লাগে না। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি যদি বলি ডাব খাওয়া অন্যায়–তাহলে সেটা হাস্যকর একটা কথা হবে। এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আমার কাছে খারাপ লাগতেই পারে, কিন্তু অন্য সবার ওপর আমি সেটা চাপিয়ে দিতে পারি না।

ইমোটিভিসম নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো লিবারেলরা ইমোটিভিসমের যুক্তি ব্যবহার করে। সব সময় করে না, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী করে। যেসব নৈতিক অবস্থানের ব্যাপারে লিবারেলদের দ্বিমত আছে সেগুলোর ব্যাপারে তারা ইমোটিভিসমের যুক্তি দেখায়। যেমন অজাচারের ক্ষেত্রে অনেকে বলে–

> শুধু তোমার ঘেন্না লাগার কারণে অজাচারকে খারাপ বলা যায় না।

কিন্তু যেসব কাজ বা নৈতিক অবস্থানে লিবারেলরা নিজেরা বিশ্বাস করে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা ইমোটিভিসমের যুক্তি দেখায় না। যেমন ক্ষতির নীতি বা হার্ম প্রিন্সিপালের ব্যাপারে তারা বলে–

> অন্যের ক্ষতি করা হলো অনৈতিকতার মূল নির্যাস। আইনের শক্তি ব্যবহার করে হলেও একে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে।

এখানে কিন্তু ইমোটিভিসমের যুক্তি এনে হার্ম প্রিন্সিপালকে তারা নাকচ করে না।

এই ডাবলস্ট্যান্ডার্ড কেন? 'ক্ষতি'-র এই নড়বড়ে এবং অস্পষ্ট ধারণাতে সীমা টানার কারণ কী? অন্যের ক্ষতি করা অনৈতিক কেন? এসব প্রশ্নের জবাবে লিবারেলরা এমন-সব মেটা-এথিকাল এবং মেটা-ফিযিকাল যুক্তি দেয়া শুরু করে যেগুলোর কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা আস্তিকদের সমালোচনা করে।[৭৬] হয় তারা সরাসরি বলে–এটা খারাপ, কারণ এটা খারাপ। এর কোনো যুক্তি নেই। এটা সহজাত বোধ। ধ্রুব

---

[৭৫] ক্যাটাগরি এরর—একটা লজিকাল ফ্যালাসি। যখন এক ক্যাটাগরির বা শ্রেণির জিনিসকে অন্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথবা এক শ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে অন্য শ্রেণির মনে করা হয়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির সদস্যকে একই ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। ~ অনুবাদক

[৭৬] মেটা-এথিক্স—বাংলায় পরা-নীতিবিদ্যা। নীতিশাস্ত্রের ওই শাখা, যা নৈতিক ধারণা উৎস, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য, প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র প্রশ্ন করে 'মানুষের কী করা উচিত?' পরানীতিবিদ্যা প্রশ্ন করে, 'ভালো হবার অর্থ কী?', 'মন্দ হবার অর্থ কী?', ইত্যাদি।
মেটা-এথিকাল–পরানীতিবিদ্যা সমন্ধীয়। ~ অনুবাদক
মেটাফিযিক্স–বাংলায় অধিবিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জানা, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, সময়, স্থান, সম্ভাবনা এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে কাজ করে। মহাবিশ্ব কেমন–এই প্রশ্নের উত্তর মেটাফিযিক্স দেয়ার চেষ্টা করে।
মেটাফিযিকাল–মেটাফিযিক্স সমন্ধীয়। ~ অনুবাদক

সত্য। চিরন্তন বাস্তবতা...ইত্যাদি

অথবা তারা বাধ্য হয়ে নৈতিকতার পুরো ধারণাটাই বাদ দিয়ে এমন একটা অবস্থান গ্রহণ করবে, যা অনেকটা নায়ালিসমের মতো।

সে অবস্থানের বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি দেয়া যায়। কিন্তু একজন লিবারেল যে ভেতরে ভেতরে একজন নায়ালিস্ট[৭৭]—তার মুখ থেকে এটা স্বীকার করাতে পারাটাও একধরনের বিজয়। কারণ, এই স্বীকারোক্তিকে তার অবস্থানের বিরুদ্ধে আপনি পরে ব্যবহার করতে পারবেন।

লিবারেল হিউম্যানিস্টদের ডাবলস্ট্যান্ডার্ডের সাথে খেলতে হয় এভাবে।

---

[৭৭] নায়ালিসম (Nihilism)—বাংলায় ধ্বংসবাদ বা নিরর্থবাদ। নায়ালিসম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন –nihil–থেকে। যার অর্থে 'কিছুই না/nothing। নায়ালিসম একধরনের দার্শনিক অবস্থান, যা মনে করে সব মূল্যবোধ এবং নীতিনৈতিকতা দিনশেষে ভিত্তিহীন। মহাবিশ্ব এবং মানবঅস্তিত্ব উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন। সব অর্থ আর নৈতিকতার আলোচনা মানুষের বানানো, অর্থহীন এবং অকার্যকর। নায়ালিসম সব ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক রীতিনীতি অস্বীকার করে।
নায়ালিস্ট—নায়ালিসমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। ~ অনুবাদক

লিবারেলিসমের নৈতিক 'অগ্রগতি': সম্মতি ট্যাবু!

নাস্তিকদের অনেকে অজাচারকে সমর্থন করে। লরেন্স ক্রউস আর রিচার্ড ডকিন্সের মতো নাস্তিকতার বিখ্যাত আইডলরা খোলাখুলি অজাচার এর সমর্থনে বলেছে। তাদের যুক্তি হলো, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে সেটাকে বৈধতা দেয়া উচিত–তারা যদি সম্পর্কে মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোন, ভাই-ভাই ইত্যাদি হয়–তবুও। এটা আসলে নাস্তিক সেক্যুলার নৈতিকতার পরিচিত ছক। ট্যাবু ভাঙা।[৭৮] ট্যাবু ভাঙাকে সেক্যুলারিসম বীরত্ব ও কৃতিত্বের কাজ মনে করে।

একসময় ব্যভিচারকে অনৈতিক মনে করা হতো। কিন্তু সেক্যুলাররা এসে বলতে শুরু করল যে এটা একটা অযৌক্তিক ট্যাবু। পায়ুকামিতাকে বরাবরই নোংরা এবং ঘৃণ্য হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু সেক্যুলাররা বলতে শুরু করল এটা একটা অযৌক্তিক ট্যাবু। নিছক আবেগের বসে এর বিরোধিতা করা হচ্ছে। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে পায়ুকামের বিরোধিতা করার কোনো যৌক্তিক কারণ পাওয়া যায় না। তাই এই বিরোধিতা বৈধ না।

একই ধরনের চিন্তা অজাচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নাস্তিক ও সেক্যুলারিস্টদের ট্যাবু-ভাঙার পুরোনো অভ্যাস অজাচারের ক্ষেত্রে এসে থামবে কেন? অজাচারের ব্যাপারে বিরোধিতাকেও তো অযৌক্তিক ট্যাবু বলা যায় তাই না? এর বিরোধিতা করার কারণ কী? শুধু আবেগের বসে বিরোধিতা করলে হবে? ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বিরোধিতা করার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ কি পাওয়া যায়?

সমকামিতার বৈধতার জন্য যদি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পারস্পরিক সম্মতি যথেষ্ট হয়, তাহলে অজাচারের ক্ষেত্রে কেন হবে না? একই যাত্রায় উল্টো ফল কেন?

এই যুক্তিকে আরও এগিয়ে নেয়া যায়। যেমন, নাস্তিক আর সেক্যুলারদের অবস্থান থেকে কি বলা যায় না–

---

[৭৮] ট্যাবু (taboo)–কোনো কাজ বা কথার বিরুদ্ধে সমাজ বা ধর্মের প্রচ্ছন্ন নিষেধাজ্ঞা। এমন কিছু, যার চর্চা সমাজে নিষিদ্ধ মনে করা হয়। কারণ তা ওই সমাজের সংস্কৃতি বা ধর্মের মূল্যবোধের বিরোধী, অথবা ওই কাজ বা কথা মানুষের কাছে ঘৃণ্য হিসেবে পরিগণিত। – অনুবাদক

'আগেরকার পশ্চাৎপদ লোকেরা পায়ুকামিতাকে নোংরা, ঘৃণ্য, অস্বাভাবিক, পাপাচার মনে করত। একইভাবে আজকের পশ্চাৎপদ লোকেরা পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া যৌনসংগমকে ঘৃণ্য এবং সীমালঙ্ঘন মনে করে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই তাদের মতের কোনো যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক কারণ পাওয়া যায় না। এগুলো সবই সেকেলে ট্যাবু।'

দয়া করে কেউ আবার বলে বসবেন না যে আমি ধর্ষণের পক্ষে ওকালতি করছি। আমি শুধু নাস্তিক ও সেক্যুলারদের বানানো নৈতিকতা আর যুক্তি-কাঠামো অনুসরণের চেষ্টা করছি। পারস্পরিক সম্মতিকে নাস্তিক আর সেক্যুলাররা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, প্রায় পবিত্র কিছু একটা মনে করে। কিন্তু এই 'মনে করা'র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? এর যৌক্তিক প্রমাণ কী?

এমন কোনো প্রমাণ কি আছে?

নেই।

আজকের অধিকাংশ নাস্তিকরা লিবারেল মতাদর্শে বিশ্বাসী। তারা লিবারেলরা উপযোগবাদী নৈতিকতার অনুসারী। সহজ ভাষায় উপযোগবাদের অবস্থান হলো– যা কিছু আনন্দ বৃদ্ধি (ম্যাক্সিমাইয) করে আর ক্ষতি হ্রাস (মিনিমাইয) করে, তা-ই নৈতিক।

যেমন তারা বলে, যা অন্যের ক্ষতি করে না তা নৈতিক। সমকামিতা, উভকামিতা, যিনা, ব্যভিচারসহ সব ধরনের যৌন বিকৃতির পক্ষে লিবারেলদের যুক্তির মূল ভিত্তি হলো 'লাভ-ক্ষতির' এই তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যৌন আচরণের ব্যাপারে কোনো ট্যাবু থাকা অর্থহীন। কারণ, নৈতিক-অনৈতিকের আসল মাপকাঠি হলো আনন্দ আর ক্ষতির হিসেব। কারও কাছে নোংরা কিংবা ঘৃণ্য লাগলো কি না, তার কোনো মূল্য এখানে নেই। এই যুক্তি ব্যবহার করে অনেক ধরনের যৌন আচরণের উদাহরণ দেয়া যায় যেখানে পারস্পরিক সম্মতি ছাড়াও আনন্দ বাড়ে আর ক্ষতি কমে।

যেমন ভয়ারিসম (voyeurism)। বিনা অনুমতিতে বা গোপনে কারও নগ্ন, অর্ধনগ্ন শরীর বা কারও যৌনকর্ম দেখে সুখ অনুভব করাকে বলা হয় ভয়ারিসম (ঈক্ষণকামিতা)। এটা একধরনের যৌন বিকৃতি। তো ধরুন, একজন পাক্কা উপযোগবাদী লোক মহিলাদের পাবলিক টয়লেটের ভেতরে গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে দিলো। তারপর সেই ক্যামেরার লাইভ ফিড ব্রডক্যাস্ট করা হলো সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন মানুষের কম্পিউটার কিংবা মোবাইলে। এতে মোট সামষ্টিক (নেট) আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে, তাই না? সেই তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু নগণ্য। মহিলারা তো ক্যামেরার কথা জানছেই না। আর পরিচয় গোপন রাখার জন্য তাদের চেহারা ঝাপসা

করে দেয়া হবে। তাহলে ক্ষতি কার হলো? মোটকথা, লাভ-লোকসানের নেট হিসেব করলে সব মিলিয়ে লাভের পাল্লা ভারী হবে।

তাহলে নাস্তিকদের লজিক অনুযায়ী বলা যায়, এ কাজটা নৈতিক। কারও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, অন্যদিকে যে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে তার মাত্রা আর পরিমাণ অনেক। এখানে পারস্পরিক সম্মতি নিয়ে ত্যানা প্যাঁচানোর কিছু নেই। এসব সেকেলে চিন্তা বাদ দিয়ে সবার উচিত মানবজাতির আনন্দ বৃদ্ধির এ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়া। নিদেনপক্ষে এর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকা।

লিবারেল-সেক্যুলারিস্ট আর নাস্তিকরা তাদের আদর্শে কনসিসটেন্ট হলে সমকামিতার মতো বিষয়ের পক্ষে তারা যেভাবে প্রচারণা চালায় ঠিক সেভাবে ভয়ারিসমের পক্ষেও প্রচারণা চালাত। আন্দোলন করত।

এ রকম আরও অনেক দিক থেকে প্রমাণ করা যায় নাস্তিকতা এবং সেক্যুলারিসম আসলে মোটাদাগে নায়ালিস্টিক। এই মতাদর্শগুলো তাদের যৌক্তিক উপসংহার এবং চূড়ান্ত অবস্থানে নিয়ে গেলে এগুলোর অর্থহীনতা এবং অযৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

লিবারেলিসমের মেকি সহিষ্ণুতা

লিবারেল বুলি: তোমরা অসহিষ্ণু!

তরজমা: আমি যা মানি তোমরা তা মানো না

সহিষ্ণুতার একটা সংজ্ঞা হলো—সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অনুমোদিত পার্থক্য।

ফ্যাক্টরিতে বানানো পণ্য কখনো ১০০% এক রকম হয় না। কিছুটা এদিক-সেদিক থাকে। কোনো ফ্যাক্টরিতে ১০০,০০০ পিস্টন তৈরি হলে ২টা হুবহু এক হবে না। কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকবেই। তবে সে পার্থক্য হবে এক নির্দিষ্ট সীমার ভেতর। এটাই হলো পার্থক্যের অনুমোদিত সীমা। কোনো পিস্টন পার্থক্য-সীমার বাইরে চলে গেলে সেটা বাতিল। অকেজো ধরে নিয়ে সেটাকে আর্বজনায় ফেলে দেয়া হবে।

লিবারেলরা দেখাতে চায় যে তাদের সহিষ্ণুতা সীমাহীন। আর বাকি সবাই অসহিষ্ণু। কিন্তু বাস্তবতা হলো লিবারেল সহিষ্ণুতারও একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। সীমাহীন সহিষ্ণুতা বলে কিছু নেই। এটা একটা অক্সিমোরন।[৭৯] নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সহিষ্ণুতা সব দর্শন এবং বিশ্বাসেই থাকে। ইসলামেও আছে। পার্থক্য হলো ইসলামে সহিষ্ণুতার ভিত্তি শরীয়াহ, হিকমাহ, ইসলামী হিদায়াহ। আর লিবারেলিসমের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার ভিত্তি হলো এলেমেলো, ক্রমাগত বদলাতে থাকা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি আর প্রথা।

ফ্যাক্টরির উদাহরণে ফেরত যাই। অনুমোদিত পার্থক্যের সঠিক মাত্রা ফ্যাক্টরির মেশিনগুলোতে ঠিক করে দেয়া না হলে উৎপাদিত পার্টসগুলো অকেজো এবং ত্রুটিপূর্ণ হবে। মানুষের ক্ষেত্রেও সঠিক মাপকাঠি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে পার্থক্য বা ভ্যারিয়েশান বা বৈচিত্র্য মেনে নেয়া যায়। কিন্তু সব ধরনের পার্থক্য মেনে নেয়া যায় না। সব ধরনের ভ্যারিয়েশন চলতে দিলে সেটা হবে মানুষের দেহ, মন এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আর মানুষ এবং মানবসমাজের জন্য কোনটা উত্তম, সেটা মানবজাতির স্রষ্টার চেয়ে আর কে বেশি ভালো জানবে?

---

[৭৯] দুটি পরস্পরবিরোধী শব্দ বা ধারণার একত্রীকরণ, যা কোনো যৌক্তিক অর্থ প্রকাশ করে না। যেমন—আলোকিত অন্ধকার, একসাথে একাকী, নীরব আওয়াজ ইত্যাদি। ~ অনুবাদক

লিবারেল-সেক্যুলারিসমের ভণ্ডামি

লিবারেল-সেক্যুলারিসম বলে—কী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন এটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই যুক্তি দিয়ে লিবারেল-সেক্যুলারিসম আসমানী দিকনির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে। সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাই যদি মুখ্য হয় তাহলে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে দিনশেষে সেটা মূল্যহীন। তাহলে আর আসমানী নির্দেশনার কী দরকার? হাতে ম্যাপ, কম্পাস, বাতি থাকার কী দরকার? সঠিক রাস্তা খুঁজে বের করার কী দরকার? গন্তব্য পৌঁছানোরও-বা কী দরকার? আমার এ পথ চলাতেই আনন্দ!

আর কোনো দর্শন, নৈতিকতার আর কোনো কাঠামো সম্ভবত লিবারেল-সেক্যুলারিসমের মতো এতটা অন্তঃসারশূন্য না। অন্যান্য মানবরচিত আদর্শ ও দর্শনগুলো আর কিছু না হোক, তাত্ত্বিকভাবে হলেও মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করে। এমন কিছু নির্দেশনা আর মূলনীতি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যেগুলো মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রশান্তির দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু লিবারেল-সেক্যুলারিসমের এসব নিয়ে মাথাব্যথাই নেই। লিবারেল-সেক্যুলারিসমের বক্তব্য হলো,

> সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই হলো, আর কিছু লাগবে না। কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা থাকাটাই মুখ্য। কেউ যদি স্বেচ্ছায় সবচেয়ে জঘন্য, বিপজ্জনক, কিংবা অর্থহীন সিদ্ধান্তও নেয়, তবে তা-ই সই। স্রষ্টা আমাকে বলে দেবে কী করবে হবে? ভুল সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষমা চাইতে হবে? অনুশোচনা বোধ করতে হবে? না, কক্ষনো না!

এর চেয়ে অসংলগ্ন কোনো দর্শন পৃথিবীতে আর আসেনি। তবু এই চিন্তা আধুনিক মানুষের মনে রাজত্ব করে।

নৈতিকতা ও প্রগতিবাদ

নৈতিক প্রগতির অসংলগ্নতা

লিবারেল-সেক্যুলার প্রগতিবাদীরা (নাস্তিক, হিউম্যানিস্ট এবং তথাকথিত সংস্কারপন্থী মুসলিমরাও এর অন্তর্ভুক্ত) মনে করে সময়ের সাথে নৈতিকতার পরিবর্তন হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তাদের চোখে এটা এক প্রাকৃতিক এবং অবধারিত প্রক্রিয়া, যা সবার মেনে নেয়া উচিত। আসলে তারা নৈতিকতার ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। সময়ের সাথে ধর্মীয় নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলার মধ্যে তারা কোনো সমস্যা দেখে না, কারণ ধর্মীয় বিধান এবং অবস্থানকে তারা কখনো নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক মনে করত না। যেমন তারা বলে–

> অতীতে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতাকে অনৈতিক মনে করা হতো ধর্মীয় অনুভূতির কারণে। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। এখন আর আমরা এটাকে খারাপ মনে করি না, কারণ আমাদের অগ্রগতি হয়েছে।

এ ধরনের চিন্তাধারা যে তালগোল পাকানো তা সহজেই দেখানো যায়।

এমন কোনো একটা মূল্যবোধ বা নৈতিক অবস্থানের কথা চিন্তা করুন যেটা মেনে চলাকে লিবারেল-সেক্যুলাররা বাধ্যতামূলক মনে করে। যেমন, জাতিগত বা বর্ণগত সমতা (racial equality)। এবার তাদের প্রশ্ন করুন–

> বর্ণগত সমতাকে আজ নৈতিক মনে করা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে এটা তো পাল্টাতে পারে, তাই না? একসময় হয়তো শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদকেও নৈতিক বা গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে। হয়তো নৈতিকতার বিবর্তনে একসময় শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ অনুসরণীয় মূল্যবোধ হবে। সবাই শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করবে। তখন কি তুমি সেটাকে নৈতিক বলে মেনে নেবে? হয়তো শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদে আসলে আপত্তি করার মতো কিছু নেই। আমাদের সীমিত জ্ঞানের কারণে এটা আমরা এখন বুঝতে পারছি না, কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ বুঝতে পারবে। যিনাকে একসময় খারাপ মনে করা হতো কিন্তু আধুনিক মানুষ 'আবিষ্কার' করল যিনার মধ্যে আসলে খারাপ

কিছু নেই। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের ক্ষেত্রেও তো এমন ঘটতে পারে, তাই না? পার্থক্য কোথায়? এভাবে কি নৈতিকতার অগ্রগতি, প্রগতি, বিবর্তন হতে পারে না?

এ প্রশ্নের জবাবে কেউ হয়তো বলতে পারে—নৈতিকতার বিবর্তন এলেমেলোভাবে হয় না। এর অগ্রগতি হয় একটা নির্দিষ্ট দিকে। সময়ের সাথে সাথে আমরা কুসংস্কার কাটিয়ে উঠি। ক্ষতিকর বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে শিখি। এভাবে আমাদের নৈতিকতা আরও নির্ভুল হয়ে ওঠে। আর সত্যিকার অর্থে একমাত্র অনৈতিক কাজ হলো অন্য কারও ক্ষতি করা। একে বলা হয় 'হার্ম প্রিন্সিপাল'।[৮০]

লিবারেল-সেক্যুলারিসমে দীক্ষিত মানুষদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। তারা বলে, যিনা আসলে মানুষের ক্ষতি করে না। এটা আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করেছে। কাজেই যিনাকে অনৈতিক মনে করার কোনো কারণ নেই (যদিও আসলে এর বিপরীত অনেক প্রমাণ ও উদাহরণ আছে)। একইভাবে আমরা আবিষ্কার করেছি শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী মতাদর্শ ক্ষতিকর, অতএব তা অনৈতিক।

কিন্তু এখানে একটা ঘাপলা আছে। একটু পিছিয়ে আসলে বিষয়টা ধরা পড়ে। হার্ম প্রিন্সিপাল যদি সকল নৈতিকতার মাপকাঠি হয় তাহলে হার্ম প্রিন্সিপালেরও তো বিবর্তন হতে পারে। এই নীতির মধ্যেও তো পরিবর্তন আসতে পারে, তাই না? ভেবে দেখুন, যদি নৈতিকতা পরিবর্তনশীল হয় এবং নৈতিকতার একমাত্র মূলনীতি হয় হার্ম প্রিন্সিপাল, তাহলে হার্ম প্রিন্সিপালের মধ্যেও তো পরিবর্তন আসার কথা।

কিন্তু লিবারেল সেক্যুলারিস্টরা কি এ কথা মেনে নেবে?

হয়তো একসময় আমরা আবিষ্কার করব অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতি করাও নৈতিকভাবে বৈধ হতে পারে, এবং হার্ম প্রিন্সিপাল আসলে অতীতের সেকেলে, অচল রদ্দি মাল ছাড়া আর কিছু না।

লিবারেল-সেক্যুলারিস্টরা যদি বলে এমন হওয়া সম্ভব না, হার্ম প্রিন্সিপাল সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে বৈধ এবং বাধ্যতামূলক—অর্থাৎ ধ্রুব সত্য—তাহলে তারা আসলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল না; বরং তারা মনে করে তাদের নৈতিকতাই পরম সত্য এবং ধ্রুব। তাহলে প্রশ্ন হবে—মুসলিমরাও নৈতিকতার এক পরম, ধ্রুব মানদণ্ডে বিশ্বাস করে। পরম নৈতিকতায় বিশ্বাস করার কারণে মুসলিমদের কেন সমালোচনা

[৮০] হার্ম প্রিন্সিপাল—মানুষের যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে যতক্ষণ না সেটা অন্য কারোর ক্ষতির কারণ হচ্ছে। যদি অন্য কারও ক্ষতি না হয়, তাহলে মানুষের কোনো কাজে বাধা দেয়ার অধিকার সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। বাধা কেবল তখনই দেয়া যাবে যখন ব্যক্তির কাজ অন্য কারোর ক্ষতি করবে। কোনো কাজ নৈতিকভাবে অননুমোদিত কিংবা অবৈধ হবে—যখন তা অন্যের ক্ষতি করবে। এর বাইরে বাকি সব বৈধ, বাকি সব অনুমোদিত। ~ অনুবাদক

করা হচ্ছে?

আসলে হার্ম প্রিন্সিপালের খণ্ডনও বেশ সোজা।

ক্ষতির সংজ্ঞা কী?

এই সংজ্ঞা কে নির্ধারণ করবে?

এই সংজ্ঞার ভিত্তি কী?

ক্ষতির ধারণা গড়ে ওঠে ব্যক্তির নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ভিতের ওপর। কোন জিনিসটাকে আপনি ক্ষতিকর মনে করেন সেটা নির্ভর করে আপনার নৈতিক এবং অন্টোলজিকাল কমিটমেন্টের ওপর।[৮১] তাই এ প্রশ্নগুলো আনলেই হার্ম প্রিন্সিপালের অসাড়তা স্পষ্ট হতে শুরু করে।

তবে আমি এখানে মনোযোগ দিতে চাই 'পরিবর্তনশীল নৈতিকতা'-র ধারণার ওপর। হার্ম প্রিন্সিপালকে চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা লোকেরা সময়ের সাথে নৈতিকতার পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে ক্ষতির ব্যাপারে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফাংশান হিসেবে। অর্থাৎ কোন জিনিস ক্ষতিকর আর কোন জিনিস ক্ষতিকর না, সেটা আমরা সময়ের সাথে সাথে আবিষ্কার করি। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে নৈতিকতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়।

এটা তাদের বক্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো 'আবিষ্কারের' এই প্রক্রিয়াটা কেমন?

ক্ষতি আবিষ্কার করার ব্যাপারটা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে আসলে কী রকম? এটা কি নতুন কোনো গ্রহ বা নতুন কোনো কেমিক্যাল আবিষ্কারের মতো? এটা কি গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে করা হচ্ছে? ক্ষতি কি দেখা যায়? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, এ ধরনের অগ্রগতি দেখার কিংবা বোঝার সক্ষমতা সময়ের সাথে বদলায় কীভাবে? সময়ের সাথে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে, বড় বড়, ভালো ভালো টেলিস্কোপ তৈরি হয়েছে, তাই আমরা নতুন নতুন গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ আবিষ্কার করতে পারছি। এটা বোঝা গেল। কিন্তু নতুন নতুন ক্ষতি কীভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে? এটা আমরা কীভাবে সনাক্ত করছি? কী দিয়ে দেখছি?

লিবারেল-সেক্যুলার প্রগতিশীলদের কাছে এই প্রশ্নের এমন কোনো জবাব নেই, যা আবেগপ্রসূত কিংবা ফাঁপা বুলিসর্বস্ব না। তাই সে শেষমেশ বলবে–

[৮১] অনটোলজি—অনটোলজি (Ontology)–বাংলায় পরাবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা। দর্শনের ওই শাখা, যা বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। কী আছে, কী নেই? কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব? অস্তিতশীল কী? অস্তিত্বশীল হবার অর্থ কী? বস্তু কী? সত্তা কী?– এ ধরনের প্রশ্নগুলো অনটোলজির আলোচনা। অর্থাৎ এখানে লেখক বলছেন–'ক্ষতির' ব্যাপারে একজন ব্যক্তির ধারণা নির্ভর করে অনটোলজির প্রশ্নগুলোর উত্তর সে কীভাবে দিচ্ছে তার ওপর। ~ অনুবাদক

আসলে ক্ষতিগুলো সব সময় জানা ছিল। কিন্তু ক্ষতিগুলো দূর করার জন্যে নৈতিকতার যে পরিবর্তনগুলো দরকার ছিল, দুষ্ট, স্বার্থপর লোকেরা তা করতে দেয়নি।

এ ধরনের উত্তরের ব্যাপারে দুটো বড় আপত্তি থাকে।

প্রথমত, যেগুলোকে আজ 'ক্ষতি' মনে করা হচ্ছে, মানুষ যে সব সময়ই সেগুলোকে 'ক্ষতিকর' মনে করত তার প্রমাণ কী? বরং ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আজ এমন অনেক বিষয়কে গুরুতর রকমের ক্ষতিকর মনে করা হচ্ছে, যেগুলোকে এর আগে কখনো এভাবে দেখা হয়নি। যেমন, সমকামিতার বিরোধিতাকে আজ ক্ষতিকর মনে করা হয়। আগে মনে করা হতো না। কেবল মনের খেয়াল বশে পুরুষ লিঙ্গ বদলে নারী হবে, নারী পুরুষ হবে, আর কেউ এটার বিরোধিতা করলে সেটাকে ক্ষতিকর বলা হবে–এমন কোনো অবস্থান ইতিহাসে এর আগে আমরা দেখি না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জেন্ডার স্টাডিসের অধীনে যেসব বিষয়কে অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ কিংবা যৌন বৈষম্য বলে শেখানো হচ্ছে, সেগুলো তো ইতিহাসের এর আগে কেউ শোনেইনি। যে ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে এসব ক্ষেত্রে ক্ষতি বা অন্যায়ের কথা বলে হচ্ছে, সেগুলোর জন্মই হয়েছে দুই থেকে তিন দশক আগে। কাজেই লিবারেল-সেক্যুলার প্রগতিবাদীরা যেসব জিনিসকে আজ 'ক্ষতিকর' মনে করে, সেগুলোকে সব সময় ক্ষতিকর মনে করা হতো, এই কথা সঠিক মনে করার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, 'ক্ষতিগুলো সব সময় জানা ছিল, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নৈতিকতার পরিবর্তনের পথ আটকে রেখেছিল'–এ উত্তর আসলে 'পরিবর্তনশীল নৈতিকতার' ধারণার বিরুদ্ধে যায়। ক্ষতি যদি সব সময় জানা থাকে তাহলে ক্ষতি আসলে পরিবর্তনশীল না। তাহলে নৈতিক অগ্রগতি কোথায় হলো?

লিবারেল-সেক্যুলাররা বলবে, দুষ্ট লোকেরা যখন পরাজিত হয় আর ভালো লোকেরা যখন সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তখন অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু এটা নৈতিক অগ্রগতির বেশ দুর্বল একটা ধারণা। এ ধরনের অগ্রগতিতে সবাই বিশ্বাস করে। সবাই মনে করে ভালো-মন্দের মধ্যে চিরন্তন লড়াই চলছে। এ লড়াইয়ে অনেক সময় সত্যের পক্ষ বিজয়ী হয়। অনেক সময় মিথ্যের পক্ষ বিজয়ী হয়। অ-লিবারেল, অ-সেক্যুলার আস্তিকরাও এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু এটাকে নৈতিকতার সেই ক্রমবিবর্তন বলা যায় না, যার কথা লিবারেল-সেক্যুলাররা বলে থাকে।

আসলে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে নৈতিক প্রগতির ধারণা ধোপে টিকে থাকে না। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেই তা ধসে পড়ে। এ ধারণা গড়ে উঠেছে বেশ গুরুতর কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক

ত্রুটির ওপর। আর এই ত্রুটিগুলোর অনেকগুলো এসেছে হার্ম প্রিন্সিপালের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি থেকে।

লিবারেল-সেক্যুলাররা যখন নৈতিক অগ্রগতির কথা বলে, তখন মুসলিমদের উচিত এর বিরোধিতা করা। মুসলিম হিসেবে আমরা নৈতিকতার অপরিবর্তনীয়, অমোঘ, পরম মানদণ্ডে বিশ্বাসী, যা ওয়াহি নাযিলের সময় থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাই আমাদের উচিত লিবারেল-সেক্যুলারদের এই কল্পকাহিনির ফাঁকফোকরগুলো তুলে ধরা এবং প্রতিপক্ষকে তাদের এসব জোড়াতালিগুলো নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করা।

আমরাই সর্বশেষ, আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ

নৈতিক প্রগতির ধারণার অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ওপর বিশ্বাস। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যেহেতু এত অগ্রগতি হয়েছে, তাই ধরে নেয়া যায় নৈতিকভাবেও অগ্রগতি হয়েছে। প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের মতোই, নৈতিক জ্ঞানের দিক থেকেও আমাদের সভ্যতা অতীতের সভ্যতাগুলোর চেয়ে অগ্রসর।

এ ধরনের চিন্তা আসলে নতুন না। যুগে যুগে সব বড় বড় সভ্যতা নিজেদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করে এসেছে। আল্লাহ কুরআনে সরাসরি এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বলেছেন। আল্লাহ আমাদের ওইসব সভ্যতার কথা চিন্তা করতে বলেছেন, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত অর্জন সত্ত্বেও ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহর ও তাঁর রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের আরও জানিয়েছেন, শক্তি, ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত অর্জনের বদৌলতে নিজেদের ন্যায়পরায়ণ এবং নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করা ভুল এবং ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। শুধু তা-ই না, নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর সভ্যতা মনে করাও সঠিক না। এমনও সভ্যতা ছিল যারা শক্তি আর সংখ্যায় আরও প্রভাবশালী ছিল। আল্লাহ বলেছেন,

> *আর তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম। অথচ তারা তো শক্তিতে ছিল এদের চেয়েও প্রবল। আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোনো কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [তরজমা, সূরা ফাতির, ৩৫]*
>
> *এরা কি যমীনে বিচরণ করে না? তাহলে দেখত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল। তারা এদের তুলনায় যমীনে শক্তিমত্তা ও প্রভাব বিস্তারে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন তাদের পাপাচারের কারণে। আর তাদের জন্য ছিল না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রক্ষাকারী। [তরজমা, সূরা গাফির, ২১]*
>
> *তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি, তা হলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম*

কেমন হয়েছিল? তারা যমীনে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক, আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। রক্ষাকারী। [তরজমা, সূরা গাফির, ৮২]

তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে তাদের চেয়েও প্রবল ছিল। আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশি আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি যুলম করত। [তরজমা, সূরা আর-রুম, ৯]

...আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা উঁচু করে দিই এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছে একজন মহাজ্ঞানী। [তরজমা, সূরা ইউসুফ, ৭৬]

অতীতে কি এমন কোনো সভ্যতা ছিল, যা ছিল প্রযুক্তিগতভাবে আজকের সভ্যতার চেয়েও অগ্রসর? আল্লাহই ভালো জানেন। এমন কোনো সভ্যতা ছিল না, এটা আমাদের ধরে নেয়া উচিত না। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষ কত 'আধুনিক' সেটা দিয়ে তাদের মূল্যবোধকে বিচার করা উচিত না; বরং মানুষের মূল্যবোধের বিচার করা উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত শরীয়াহর আলোকে।

প্রগতিবাদ এবং ফিরাউনের উত্তরসূরি

ইতিহাসের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিবাদী না। কুরআনে বর্ণিত মুসা, ইসা, ইউসুফ, ইব্রাহিম (আলাইহিমুস সালাম) এর মতো নবীদের ঘটনা জানার সময় আমাদের ভাবা উচিত না যে এগুলো কেবল অতীতের কাহিনি, আর আমরা হলাম আধুনিক সময়ের মানুষ। আমাদের পৃথিবী আলাদা। আমাদের সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সরকারগুলো অনেক বেশি উন্নত এবং সূক্ষ্ম।

না, এক মুহূর্তের জন্যও এভাবে চিন্তা করা যাবে না। কারণ, এটা কাফিরদের চিন্তা। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে এটা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ বলেছেন–

> *...যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনি ছাড়া কিছুই নয়।' [তরজমা, সূরা আল-আন'আম, ২৫]*

পূর্ববর্তী নবী এবং তাঁদের শত্রুদের মধ্যকার সংঘাতের বর্ণনা আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন। এর কারণ আছে। আমরাও সেই একই সংঘাতের মুখোমুখি। দুনিয়াতে যেমন 'নবীদের ওয়ারিশ'-রা আছে, তেমনিভাবে ইবলিশ, ফিরআউন, আবু জাহল এবং আবু লাহাবের উত্তরসূরিরাও আছে। এই বাস্তবতার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকলে, আমার রবের সতর্কতাবাণী অগ্রাহ্য করলে, আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের সম্মুখীন হব।

জ্ঞানের ধারণা–আধুনিকতা বনাম ট্র্যাডিশান

জ্ঞান হলো এমন কিছু যা বই, হার্ড ড্রাইভ কিংবা ডিজিটাল ক্লাউডে খুঁজে পাওয়া যায়–আধুনিক এই ধারণা একটা বিচ্ছিন্ন চিন্তা। ইসলামী ইলমের সিলসিলা এ ধরনের 'জ্ঞানের' ওপর গড়ে ওঠেনি। প্রকৃত জ্ঞান বিমূর্ত হয় না। সত্যিকারের জ্ঞান কখনো রক্তমাংসের মানুষ থেকে আলাদা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আল্লাহ ওয়াহি নাযিল করেছেন জিব্রিল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে। সেই জ্ঞান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন তাঁর সাহাবীগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। সাহাবাগণ শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা থেকে শিক্ষা নেননি। তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁর কাজ, তাঁর আচার-আচরণ, এমনকি তাঁর নীরবতা থেকেও। কাজেই জ্ঞানের প্রবাহের মাধ্যম হলো মানুষ। এ কারণেই ইসলামী জ্ঞানে ইসনাদ বা সনদের (বর্ণনাসূত্র) ধারণা এত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহর নাযিলকৃত ইলমের কিছু অংশ সত্যিকারভাবে জানার দাবি করতে হলে, যাদের মাধ্যমে এই ইলম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে–শেষ পর্যন্ত আপনার উস্তাদের মাধ্যমে আপনার কাছে এসে পৌঁছেছে–সেই ধারা সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। ইন্টারনেট থেকে কোনো বই নামিয়ে পড়ে ফেলা কখনোই এর বিকল্প হতে পারে না। এর মাধ্যমে বড়জোর কোনো রচনার সাথে পরিচিত হওয়া যায়, এর বেশি কিছু না।

আমাকে ভুল বুঝবেন না, যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানার অনেক উপকারিতা আছে। তবে আলিম হতে হলে, দ্বীনের বিষয়ে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলতে হলে অনেক ক্ষেত্রে ইসনাদ একটা শর্ত। এভাবেই আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'আল্লাহ তাআলা ইলমকে এমনভাবে তুলে নেবেন না যে বান্দাদের (অন্তর) থেকে তা তুলে নিলেন; বরং ইলমকে তুলে নেবেন আলিমদের তুলে নেওয়ার মাধ্যমে।

অবশেষে যখন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা বেইলম লোকদের নেতা বানাবে আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দেবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে।[৮২]

এর সাথে জ্ঞানের আধুনিক ধারণার তুলনা করে দেখুন। আধুনিক ধারণায় জ্ঞান বিমূর্ত। জনমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। আর এর কোনো নৈতিক অক্ষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিযিক্সের কোনো ক্লাসে যান। ফর্মূলাগুলো কীভাবে এল, কে কাকে শেখাল—এ ধরনের ইতিহাসের আলোচনা খুব কমই দেখবেন, বা একেবারেই দেখবেন না। হয়তো এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থাকতে পারে। হয়তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন হলে সমস্যা নেই। কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে না। দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানের সব উৎস আমাদের অতীতে। তাই অতীত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার অর্থ সেই জ্ঞান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। জ্ঞানের ব্যাপারে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আমরা যেন প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞান মনে করে না বসি।

---

[৮২] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সত্যিকারের মুক্তচিন্তক কে?

ওই নাস্তিক–

১) যে সেক্যুলার পৃথিবীতে বসবাস করে।

২) যে সেক্যুলার স্কুলে পড়াশোনা করে, যেসব স্কুলের কারিকুলাম গড়ে উঠেছে সেক্যুলার দর্শনের ভিত্তিতে। ক্রমাগত বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা আর সমালোচনার ভিত্তিতে

৩) যে এমন এক উন্নাসিক কালচারের অংশ, যা স্রষ্টা কিংবা ধর্মকে স্বীকার করে না।

৪) যে প্রতিদিন মিডিয়াতে এমন অগণিত সিনেমা, সিরিয, ডকুমেন্টারি কিংবা গান দেখছে যেগুলো হয় স্রষ্টাকে উপেক্ষা করে অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

৫) যে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে অবস্থান করে যেখানে ধার্মিক হবার মানে বোকাসোকা হাবাগোবা গণ্য হওয়া, আর ধর্মের ব্যাপারে সংশয়বাদী হবার মানে এনলাইটেন্ড বা আলোকিত হওয়া।

নাকি সত্যিকারের মুক্তচিন্তক ওই মুসলিম–

১) যে সেক্যুলার বিশ্বে বসবাস করে

২) সেক্যুলার স্কুলে পড়াশোনা করে। যেসব স্কুলের কারিকুলাম গড়ে উঠেছে সেক্যুলার দর্শনের ভিত্তিতে। ক্রমাগত বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা আর সমালোচনার ভিত্তিতে।

৩) যে এমন এক উন্নাসিক সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে থাকে, যা ইসলামকে সেকেলে, পশ্চাৎপদ এবং জঙ্গিবাদী মনে করে

৪) যে প্রতিদিন মিডিয়াতে এমন অগণিত সিনেমা, সিরিয, ডকুমেন্টারি কিংবা গানের মুখোমুখি হয়, যেগুলো হয় স্রষ্টাকে উপেক্ষা করে অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে

৫) যে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে অবস্থান করে যেখানে ধার্মিক হবার মানে বোকাসোকা হাবাগোবা গণ্য হওয়া, আর ধর্মের ব্যাপারে সংশয়বাদী হবার মানে

হলো এনলাইটেন্ড বা আলোকিত হওয়া। আর মুসলিম হবার অর্থ হলো বোকাসোকা হওয়া অথবা মধ্যযুগীয় বর্বর হওয়া।

এতকিছুর পরও সে ইসলামের ওপর অটল থাকে। শত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জ্বলন্ত কয়লার মতো করে সে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

কে আসলে স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে? দুর্বার প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে কে সত্যের অনুসরণ করছে?

নৈতিকতার যৌক্তিক গতিপথ

আমরা প্রায়ই কিছু মানুষকে বলতে শুনি—

> ইসলামী আইনকে যুগোপযোগী করে তোলা দরকার। আজকের পৃথিবী আর ১৪০০ বছর আগের আরবের বাস্তবতা এক না। যেহেতু সময় বদলেছে তাই ইসলামী আইন এবং নীতিও বদলানো দরকার।

প্রথমত, মানুষ যত বলে পরিবর্তন আসলে অত হয়নি। মানুষ এখনো মানুষই আছে। আমাদের মৌলিক প্রকৃতিতে এমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি, যার জন্য প্রগতিবাদী আর সংস্কারবাদী মুসলিমদের কথামতো ইসলামের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই পুরো বক্তব্য আসলে আইন এবং নৈতিকতার গতিপথের ব্যাপারে তাদের ভুল ধ্যানধারণা এবং বিভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবী কেমন, সেটা বর্ণনা করা নৈতিকতার কাজ না। নৈতিকতা আলোচনা করে, 'পৃথিবী কেমন হওয়া উচিত', তা নিয়ে। পৃথিবী যা ঘটছে তার ভিত্তিতে নৈতিক অবস্থান বদলে ফেলা তাই যুক্তির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। হ্যাঁ, সময়ের সাথে আমরা হয়তো এমন কোনো কিছু জানতে পারি, যা আমাদের নৈতিক অবস্থানের প্রয়োগকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এর ফলে মূলনীতি বদলাবে না।

উদাহরণ—আমরা জানি রিবা হারাম। সুদ অনৈতিক। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে সব জায়গাতে রিবা প্রচলিত। কেউ এখন বলে বসতে পারে, রিবার ব্যাপারে কতটা কঠোর হওয়া উচিত, সেটা এই 'নতুন বাস্তবতার' আলোকে পুনর্বিবেচনা করা দরকার। ইসলামের একধরনের অর্থনৈতিক 'সংস্কার' দরকার।

কিন্তু এই বাস্তবতা এমন নতুন কিছু না, যার জন্য এমন 'সংস্কার' করতে হবে। বেচাকেনা, লাভক্ষতির নীতি আজও একই আছে। মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এসব নীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে পরিবর্তন এসেছে এবং আলিমগণ এ ধরনের বাস্তবতাগুলো মাথায় রেখেই যুগে যুগে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু মূল নীতিমালাগুলো অপরিবর্তনীয়। ধ্রুব। পুরো পৃথিবীও

যদি রিবায় নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাহলে মুসলিমদের দায়িত্ব হবে এই বিদ্যমানতার প্রতি আরও তীব্রভাবে বিরোধী হওয়া। আরও সজাগ হওয়া।

আমারা চাই ইসলামী নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে পৃথিবীর উন্নতি করতে চাই। পৃথিবীর চাহিদা কিংবা রীতি অনুযায়ী আমরা আমাদের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ পালটে ফেলি না।

হ্যাঁ, কখনো কখনো পৃথিবীর অবস্থা বদলানো অসম্ভব মনে হতে পারে। কখনো কখনো সত্য ও ইনসাফ থেকে এত বেশি বিচ্যুতি দেখা যায়, যে একে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়। কিন্তু আমাদের কখনো আশা হারানো উচিত না। কখনো উচিত না সমগ্র মানবজাতির প্রতি নায়ালিস্টিক[৮৩] ঘৃণায় নিমজ্জিত হওয়া।

এ ব্যাপারে নিচের হাদীসটির কথা চিন্তা করে দেখুন–

> *'যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগমুহূর্তেও তোমাদের কারও হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তাহলে সে যেন তা রোপণ করে দেয়।'*[৮৪]

পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

---

[৮৩] নায়ালিসম (Nihilism)-বাংলায় ধ্বংসবাদ বা নিরর্থবাদ। নায়ালিসম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন–nihil–থেকে। যার অর্থে 'কিছুই না/nothing। নায়ালিসম একধরনের দার্শনিক অবস্থান, যা মনে করে সব মূল্যবোধ এবং নীতিনৈতিকতা দিনশেষে ভিত্তিহীন। মহাবিশ্ব এবং মানবঅস্তিত্ব উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন। সব অর্থ আর নৈতিকতার আলোচনা মানুষের বানানো, অর্থহীন এবং অকার্যকর। নায়ালিসম সব ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক রীতিনীতি অস্বীকার করে।
নায়ালিস্ট–নায়ালিসমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। – অনুবাদক

[৮৪] মুসনাদ আহমাদ

ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কি ধার্মিক হওয়া প্রয়োজন?

ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কি ধর্ম দরকার?

না। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ইসলাম দরকার।

হ্যাঁ, অন্য ধর্মের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন ভালো কাজ করে। কিন্তু 'ভালো' শব্দটা আমি এখানে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করছি। ভালো বলতে আমি বোঝাচ্ছি, এমন মানুষ যে তার মৌলিক নৈতিক দায়িত্বগুলো পালন করে। আর সেগুলো পালন না করতে পারলে কমসেকম অনুশোচনা বোধ করে।

মুসলিমরাই কেবল মৌলিক নৈতিক দায়িত্বগুলো পালন করার অবস্থানে আছে, এই কথা আজ হজম করা কঠিন। মানুষের মধ্যে আজ ব্যাপকভাবে সর্বজনীনতাবাদের যেসব ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, এ কথা সরাসরি তার বিরুদ্ধে যায়। 'ধর্ম পালন না করেও ন্যায়পরায়ণ হওয়া যায়', এ কথাকে আজকাল অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আসলে কি তা সত্য?

এ ধরনের দাবি যারা করেন তারা সীমিত কিছু নৈতিক সত্যের ওপর ফোকাস করে থাকেন। যেমন–

> খুন করা খারাপ, এটা জানার জন্য স্রষ্টাকে লাগে না
>
> ধর্ষণ খারাপ, এটা বোঝার জন্য স্রষ্টাকে লাগে না
>
> কেবল স্রষ্টার আদেশের কারণে যদি তুমি ধর্ষণ আর খুন থেকে বিরত থাকো, তাহলে এটা প্রমাণ করে তুমি আসলে কত অনৈতিক...ইত্যাদি।

আরও বলা হয়–

> আমি কারও ক্ষতি করছি না। এটাই আমার নীতি। এই নীতি মেনে চলার জন্য আমার আল্লাহকে দরকার নেই। ইসলামেরও দরকার নেই।

আসলে এটা খুব অস্পষ্ট একটা কথা। ক্ষতির অর্থ এখানে স্পষ্ট না। ক্ষতির সংজ্ঞা অনেক সময় প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে। সময়, সংস্কৃতি এমনকি ব্যক্তিভেদে ক্ষতির ধারণা আলাদা হতে পারে। কাজেই সবাই যদি মেনেও নেয় যে, নৈতিকতার মানে

কেবল ক্ষতি প্রতিরোধ করা, তবুও ক্ষতির সংজ্ঞা আর অর্থ নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য থেকে যাচ্ছে। কিসে ক্ষতি হচ্ছে কিংবা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন জিনিসে ক্ষতি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হচ্ছে, সেটা হিসেব করাও সহজ না। তা ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ড দেখেও এটা মনে হয় না যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে মানুষ লাভক্ষতির জটিল অংশ কষে সিদ্ধান্ত নেয়; বরং অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময় বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, প্রথা এবং গ্রহণযোগ্য আচরণের সীমার ভিত্তিতে কাজ করে। আর যা কিছু এর বাইরে পড়ে সেটাকে 'ক্ষতিকর' ধরে নেয়া হয়।

এগুলো 'হার্ম প্রিন্সিপাল' নামে পরিচিত নীতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি। আদতে হার্ম প্রিন্সিপাল হলো নৈতিকতার মোড়কে ক্ষণস্থায়ী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার প্রকাশ। ইসলামী নৈতিকতা অনেক সমৃদ্ধ, অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং লিবারেলদের প্রচার করা এই ভাসাভাসা হার্ম প্রিন্সিপালের চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

ইসলামী নৈতিকতার কেন্দ্রে আছে আদাব এবং আখলাকের ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।'[৮৫]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন–

আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত [তরজমা, সূরা আল-কলম, ৪]

ইসলামী আদাব এবং আখলাকের এমন অনেক দিক আছে, পশ্চিমা লিবারেল সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে যেগুলোকে একেবারেই সহজাত মনে হয় না। কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক–

১। পিতামাতার সম্মান করা এবং দেখাশোনা করার গুরুত্ব

২। প্রতিবেশীকে সাহায্য করা নৈতিক দায়িত্ব

৩। অনাথ এবং গরিবদের সাহায্য করার গুরুত্ব

৪। পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা নৈতিক দায়িত্ব

এই মূল্যবোধগুলোর জীর্ণশীর্ণ কিছু রূপ অন্য ধর্মে এবং সংস্কৃতিতে এখনো দেখা যায়। কিন্তু ইসলামে এগুলো নিছক 'ভালোমানুষী' না; বরং দায়িত্ব। এগুলো পালন করলে আপনাকে নৈতিকভাবে অনুসরণীয় মানুষ ধরা হবে না। এটুকু করার অর্থ আপনি প্রাথমিক নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দায়িত্বগুলো পালনে আপনি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। এটা একটা বড় পার্থক্য।

---

[৮৫] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতার আরও নানা দিক আছে।

১। কেউ যদি হিংসায় পরিপূর্ণ হয় তাহলে কি সে নৈতিক, ন্যায়পরায়ণ মানুষ বলে গণ্য হবে?

২। কেউ গীবতে অভ্যস্ত হলে তাকে কি ন্যায়পরায়ণ এবং নীতিবান বলা যাবে?

৩। কেউ যদি মানুষের ব্যাপারে সুধারণা না রাখে, তাহলে কি তাকে ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে?

৪। কেউ সত্যমিথ্যা যাচাই না করে, যা শোনে তা-ই প্রচার করে বেড়ালে, তাকে কি ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে?

৫। কেউ সুদি লেনদেনে যুক্ত। তাকে কি ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে?

ওপরের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর হলো, না। এ বৈশিষ্ট্যগুলো যদি একজন মানুষের মধ্যে থাকে, এবং সে যদি এ কারণে লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ না করে, নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করে, তাহলে তাকে ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান ব্যক্তি বলা যাবে না। তাহলে যে মানুষ এই দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে জানেই না, সে কীভাবে এগুলো মেনে চলবে? গীবত, ঈর্ষা কিংবা পিতামাতার সেবার মতো বিষয়গুলো নিয়ে নাস্তিকদের আপনি কথা বলতে দেখবেন না। তাদের নৈতিকতার আলাপ শুধু খুন আর ধর্ষণে সীমাবদ্ধ।

আসলে ওপরে বলা সবগুলো পয়েন্টের ফোকাস হলো অপরের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। আর অপরের প্রতি দায়িত্বের আগে আসে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব। কাজেই স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব যারা অস্বীকার করে তারা নৈতিক হতে পারে না। তবু তর্কের খাতিরে অপরের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলেও লিবারেল-সেক্যুলারদের নৈতিকতার বুঝ অত্যন্ত সংকীর্ণ, সীমিত এবং ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।

কেউ হয়তো বলতে পারে, ওপরের এ বিষয়গুলো সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নেই। যেমন, পিতামাতাকে সম্মান করা আসলে নৈতিক দায়িত্ব না।

তাহলে প্রশ্ন আসবে, কোনো কিছু নৈতিক কি না, সেটা কীভাবে ঠিক করা হবে? অর্থাৎ আমাদের তখন মেটা-এথিক্সের[৮৬] আলোচনার গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য অবস্থান হলো, সব ধরনের নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে

---

[৮৬] মেটা-এথিক্স–বাংলায় পরা-নীতিবিদ্যা। নীতিশাস্ত্রের ওই শাখা, যা নৈতিক ধারণা উৎস, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য, প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র প্রশ্ন করে 'মানুষের কী করা উচিত?' পরানীতিবিদ্যা প্রশ্ন করে, 'ভালো হবার অর্থ কী?', 'মন্দ হবার অর্থ কী?', ইত্যাদি। ~ অনুবাদক

সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। এটা মরাল নায়ালিস্টদের[৮৭] অবস্থান। 'পিতামাতাকে সম্মান করাকে কেন নৈতিক দায়িত্ব মনে করতে হবে'—এই প্রশ্ন করা গেলে—'অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকাকে কেন নৈতিক দায়িত্ব মনে করতে হবে'—সেটাও প্রশ্নও করা যায়। এই প্রশ্নের জবাবে সেক্যুলার এবং নাস্তিকদের কাছে কোনো সন্তোষজনক উত্তর তো দূরে থাক সংগতিপূর্ণ উত্তরও নেই।

নৈতিকতার দর্শন নিয়ে পশ্চিমা অ্যাকাডিমিয়ার আলোচনার দিকে তাকান। একদম প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য সেখানে নেই। প্রতিটা বিষয়ে মতপার্থক্য। তাদের বিভ্রান্তি স্পষ্ট। আসলে নৈতিকতার আলোচনায় নাস্তিক এবং সেক্যুলাররা হিসেবের মধ্যে আসার অবস্থাতেই নেই। সে তুলনায় অন্য আস্তিকদের অবস্থা কিছুটা ভালো। ইসলামের মতোই খ্রিষ্টান এবং ইহুদী ধর্মেও স্রষ্টা, মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির ব্যাপারে একটা সার্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়। নৈতিকতা আর দায়িত্বের ভিত্তি এবং তাৎপর্য গড়ে ওঠে এই ব্যাখ্যা এবং বিশ্বাসের ওপর। এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক সেটা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

ইহুদী এবং খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেগুলো বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশেষ করে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে। যেমন সমকামী আচরণ তারা একরকম মেনে নিয়েছে। এ ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের বিভিন্ন শাখাকে এখন তেমন একটা আপত্তি করতে দেখা যায় না। সেক্যুলারিসম, লিবারেলিসম এবং ক্যাপিটালিসমের মতো প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিগুলোর অনুকরণে, সেগুলোকে জায়গা করে দিতে গিয়ে, পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপারেও তাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থানে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

এই পরিবর্তনকে কীভাবে বৈধতা দেয়া যায়? নৈতিক অগ্রগতির যুক্তিতে? সভ্যতার যত অগ্রগতি হবে নৈতিকতারও তত পরিবর্তন হবে? এমন কিছু?

আচ্ছা, সভ্যতার অগ্রগতির মানে কী? যে আচরণকে আজ থেকে ১০০ বছর আগে ঘৃণ্য, জঘন্য মনে করা হতো, আজ সেটাকে গ্রহণযোগ্য কিংবা অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মনে করা হচ্ছে—নৈতিকতার এমন 'অগ্রগতি'র মানেই-বা কী?

---

[৮৭] নায়ালিসম (Nihilism)—বাংলায় ধ্বংসবাদ বা নিরর্থবাদ। নায়ালিসম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন –nihil–থেকে। যার অর্থে 'কিছুই না/nothing'। নায়ালিসম একধরনের দার্শনিক অবস্থান, যা মনে করে সব মূল্যবোধ এবং নীতিনৈতিকতা দিনশেষে ভিত্তিহীন। মহাবিশ্ব এবং মানবঅস্তিত্ব উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন। সব অর্থ আর নৈতিকতার আলোচনা মানুষের বানানো, অর্থহীন এবং অকার্যকর। নায়ালিসম সব ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক রীতিনীতি অস্বীকার করে।
নায়ালিস্ট—নায়ালিসমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। ~ অনুবাদক

এসব প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানের কাছে নেই। আধুনিকতার সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কাছে তারা নতি স্বীকার করেছে। ইসলামই কেবল এই চাপ প্রতিরোধ করে আজও নিজের আদি ও অকৃত্রিম অবস্থান বজায় রেখেছে। এ কারণেই ইসলামকে নৈতিকভাবে সেকেলে এবং পশ্চাৎপদ মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামকে পশ্চাৎপদ কেবল তখনই মনে হবে যখন আপনি মাপকাঠি হিসেবে নেবেন গত ১০ কিংবা ২০ বছরের পশ্চিমা সংস্কৃতিকে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী ৯০০০ বছর থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের আগের পুরো ইতিহাসকেই অনৈতিকতার অন্ধকারের নিমজ্জিত মনে হবে। ইতিহাসের ব্যাপারে এটা অত্যন্ত উদ্ভট এবং উদ্ধত দৃষ্টিভঙ্গি।

স্রষ্টা, মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির ব্যাপারে ইহুদী এবং খ্রিষ্ট ধর্মের দেয়া সার্বিক ব্যাখ্যা নিয়েও পর্যালোচনা করা যায়। সেই বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত লেখাতে করা সম্ভব না। তবে কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। যেমন খ্রিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে ট্রিনিটির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যায়। অন্যদিকে ইহুদী ধর্মের থিওলজির বড় একটা অংশ বারো শ শতাব্দীর ইসলামী কালামী চিন্তাধারা থেকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। ইসলামী স্পেনে যেসব ইহুদী ধর্মতাত্ত্বিক কালামী চিন্তা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো মুসা বিন মাইমুন বা মায়মোনিডস।

ইসলাম নিয়ে আজকের মূল আপত্তি কী? মূল আপত্তি হলো, কুরআন আর সুন্নাহতে এমন অনেক কিছু আছে, যা পশ্চিমা লিবারেল-সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে সমস্যাজনক। আপত্তি হিসেবে এটা বেশ দুর্বল। ইসলামী আইনের যে দিকগুলো আজকে আপত্তিকর মনে হচ্ছে, আজ থেকে ১০, ২০ কিংবা ১০০ বছর আগে তার অনেকগুলোকে সমস্যাজনক মনে করা হতো না। একমাত্র নৈতিক অগ্রগতির ভাসাভাসা ধারণার অজুহাত ছাড়া আর কোনো যুক্তি লিবারেল-সেক্যুলার কিংবা নাস্তিকদের কাছে নেই। নৈতিক অগ্রগতি মানে আসলে কী, সময়ের সাথে কীভাবে মানবীয় প্রকৃতির ব্যাপারে নৈতিক সত্য বদলায়—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তরও তাদের কাছে নেই।

দিনশেষে স্রষ্টা, মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির ব্যাপারে দেয়া ইসলামের ব্যাখ্যা সবচেয়ে সন্তোষজনক। সুস্থ বিবেক এবং আক্কলের অধিকারীরা ইসলামী নৈতিকতার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করে দেখতে পারে। এই পরিপূর্ণ দ্বীন অনুসরণের সুফল মুসলিমরা এ দুনিয়াতে উপভোগ করে এবং আখিরাতেও করবে বিইযনিল্লাহ। এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে অমুসলিমরা ইসলামে আমন্ত্রিত। আর তারা যদি এতে আগ্রহী না হয় তাহলে আমরা বলব—লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।

মডার্নিটি

মডার্নিটি ও ইসলামের সংঘাত

আধুনিকতা শব্দটাকে প্রায় সর্বজনীনভাবে ইতিবাচক ধরা হয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় আধুনিকতাবাদের অনেক দিক ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সমস্যা হলো, আধুনিকতাবাদ বলতে আসলে ঠিক কী বোঝানো হয় সেটাই আমরা জানি না। শত্রুকে না চিনলে শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করা যায় না।

আধুনিকতাবাদ আসলে একটা ধর্মের মতো। 'ধর্ম' শব্দটা শুনলে আমরা সাধারণত এক বা একাধিক স্রষ্টা, কোনো পবিত্র গ্রন্থ কিংবা ধর্ম প্রচারকের ওপর বিশ্বাসের কথা ভাবি। কেউ যখন 'ধর্ম' শব্দটা উচ্চারণ করে আমাদের মাথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসলাম, খ্রিষ্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদির কথা চলে আসে। কিন্তু আমি ধর্মের ধারণাকে আরও ব্যাপক অর্থে দেখতে চাই কিংবা বলা ভালো পুনর্বিবেচনা করতে চাই। আমার মতে ধর্ম হলো এমন কিছু, যা ভালোমন্দ, নৈতিকতা, কল্যাণ-অকল্যাণের সংজ্ঞা দেয়। ধর্ম হলো এমন কিছু, যা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে। ধর্ম বলে দেয়, কীভাবে পৃথিবী চলে এবং কীভাবে মানুষের চলা উচিত।

এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্ম কোনটা হয় বলুন তো?

প্রশ্নটা মুসলিমদের করা হলে তারা সাধারণত খ্রিষ্ট ধর্মের কথা বলে। কিন্তু এই উত্তর আসলে ঠিক না। ইউরোপ কিংবা অ্যামেরিকার কোনো সাধারণ খ্রিষ্টানকে যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের উৎস কী, মানুষ কোথা থেকে এল? তাহলে সে বাইবেলের কথা বলবে না। সে হয়তো বায়োলোজির কথা বলবে অথবা ডারউইনের বির্বতনবাদের কথা বলবে। হয়তো বলবে, দেখো আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তবে বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে গেলে জবাব পাওয়া যাবে।

যদি বলেন, 'তুমি না খ্রিষ্টান? বাইবেলে কি এ ব্যাপারে কিছু বলা নেই?'

সে বলবে, বাইবেল আমার ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু মানুষ কোথা থেকে এল সেটা জানার উৎস

বাইবেল না। এটা জানতে হলে সেক্যুলার বিজ্ঞান এবং বায়োলজির কাছে যেতে হবে। একইভাবে কোনো ইহুদীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, সমাজ-ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কী? তাহলে সে তাওরাত কিংবা তালমুদের কথা বলবে না। সে কোনো র‍্যাবাইয়ের কাছে যাবে না। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বক্তব্যের কথা বলবে। হয়তো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিংবা নির্জলা পুঁজিবাদের কথা বলবে।

কাজেই সেও তার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে জবাব দিচ্ছে না। তার জবাবের ভিত্তি অন্য কিছু। এসব মানুষ নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিলেও ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ, পৃথিবী, মহাবিশ্ব, মানুষের অস্তিত্ব, ভালো-মন্দসহ অধিকাংশ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অবস্থানের উৎস ধর্ম না। তারা এগুলো নিচ্ছে অন্য কোনো উৎস থেকে। সেই উৎসটা কী? সেটা কোন ধর্ম? তারা আসলে কিসের অনুসরণ করছে?

তারা অনুসরণ করছে আধুনিকতাবাদের। আধুনিকতাবাদ এমন এক ধর্ম, যাকে ধর্ম নামে ডাকা হয় না। আধুনিকতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাসের কাঠামো, যার জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে, প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশানের সময়।[৮৮]

ধর্ম শব্দটা বেশ সংকীর্ণ, এটা আমরা একটু আগেই বলেছি। এই সংকীর্ণ শব্দ থেকে সরে এসে আরও উপযুক্ত কোনো শব্দ আমাদের ব্যবহার করতে হবে। সেই শব্দটা হতে পারে দ্বীন। যেমন আমরা বলি ইসলাম হলো একটি দ্বীন—একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটা কেবল কিছু বিশ্বাস আর আমলের নাম না; বরং ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা জীবনের প্রতিটি অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম যেমন একটি দ্বীন, ঠিক তেমনিভাবে আধুনিকতাবাদও একটি দ্বীন এবং এটি আজকের বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দ্বীন। আরেকটা উপযুক্ত শব্দ হলো 'প্যারাডাইম'। মডার্নিস্ট প্যারাডাইম এবং ইসলামী প্যারাডাইম আলাদা। কিছু কিছু মিল থাকলেও অনেক মৌলিক জায়গাতে এই দুই প্যারাডাইমের মধ্যে সংঘর্ষ আছে। আধুনিকতাবাদকে আমাদের এভাবে বোঝা এবং চিনতে শেখা উচিত।

আজকের পৃথিবীতে আধুনিকতার কোনো সমালোচনা সহ্য করা হয় না। পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলো দাবি করে সব ধর্মের ব্যাপারে তারা সহনশীল। স্বাধীনভাবে সব ধর্ম পালনের অধিকার দেয়ার কথাও তারা বলে। কিন্তু পরিপূর্ণ

---

[৮৮] প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশান—ষোড়শ শতকে ইউরোপে শুরু হওয়া খ্রিষ্ট ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন। জার্মান ধর্মযাজক মার্টিন লুথার এই আন্দোলনের সূচনা করে। এর মাধ্যমে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রটেস্ট্যান্ট (Protestant) ধারার সূচনা হয়। রিফর্মেশন ইউরোপ এবং আধুনিক পশ্চিমের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ~ অনুবাদক

সহিষ্ণুতা বলে আসলে কিছু নেই। একজন মুসলিম মসজিদের ভেতরে তার ধর্ম পালন করতে পারবে। খ্রিষ্টান গির্জার ভেতরে তার ধর্ম পালন করতে পারবে। আল্লাহ, নবী, আখিরাত—ইত্যাদি নিয়ে নিজস্ব কিছু বিশ্বাস রাখা যাবে। কিন্তু এমন কিছু সীমারেখা আছে যেগুলো মেনে চলতেই হবে।

ধরুন কেউ বিশ্বাস করে নারী ও পুরুষ আলাদা, তারা সমান না। পরিবার, সমাজে তাদের ভূমিকাও আলাদা। তার এই বিশ্বাসকে কি সম্মান করা হবে? নাকি তাকে নারীবিদ্বেষী আর সেকেলে বলা হবে?

কেউ বিশ্বাস করে কিছু কিছু যৌন আচরণ ঘৃণ্য, বিকৃত, অবৈধ এবং অনৈতিক। এসব আচরণকে নির্বিঘ্নে চলতে দেয়া হলে একসময় সমাজ কলুষিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিশ্বাসকে কি সম্মান করা হবে? নাকি সমকামবিদ্বেষ বলা হবে?

কাজেই মুখে সহিষ্ণুতার কথা বললে আধুনিকতাবাদের 'পবিত্র' বিশ্বাসগুলোর সমালোচনা আসলে সহ্য করা হয় না। নিজের বিশ্বাস আর আদর্শ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে থাকতে হয়, এর বাইরে যাওয়া যায় না।

ইতিহাস

আসুন আধুনিকতাবাদ বা মডার্নিসমের ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। মডার্নিসমের শুরু ইউরোপে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশানের সময়। এ সময় ক্যাথলিক চার্চ আর প্রটেসট্যান্টদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। প্রটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়ে যাবার ঘোষণা দেয়। তাদের বক্তব্য ছিল ক্যাথলিক চার্চ খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসকে নিজস্ব স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। বাইবেলকে কীভাবে বুঝতে হবে, খ্রিষ্টান হিসেবে কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে তা বোঝার নিজস্ব পদ্ধতি আমাদের আছে। ক্যাথলিক চার্চকে আমাদের দরকার নেই। দুর্নীতিগ্রস্ত, অনৈতিক এবং খ্রিষ্টের শিক্ষাকে বিকৃত করা ক্যাথলিক চার্চের সাথে আমরা থাকব না।

এই বিভাজনের ফলে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে অনেকগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসের প্রচলিত বয়ান অনুযায়ী, এই যুদ্ধ একপর্যায়ে এমন অবস্থায় পৌঁছল যে বাইবেলের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের মোহভঙ্গ ঘটল। তারা ভাবল, এত সংঘাত আর রক্তপাত হচ্ছে বাইবেলের জন্য। বাইবেলের ব্যাখ্যা নিয়েও কেউ একমত হতে পারছে না। ক্যাথলিকদের ব্যাখ্যা প্রটেস্ট্যান্টরা গ্রহণ করে না। প্রটেসট্যান্টদের ব্যাখ্যা ক্যাথলিকরা গ্রহণ করে না। একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করছে। আর এগুলোকে কেন্দ্র করে চলছে অরাজকতা আর খুনোখুনি। তাহলে বাইবেল তো হিদায়াত আর শান্তির উৎস হতে পারে না; বরং বাইবেল হলো দ্বন্দ্ব, হত্যা আর ধ্বংসের উৎস।

ইউরোপের মানুষ তখন প্রশ্ন করল—মানব অস্তিত্ব, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়কে বোঝার জন্য তাহলে আমরা কোথায় যাব? কিসের দ্বারস্থ হব?

উত্তর এল, মানবীয় বুদ্ধিমত্তা। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে মানুষের মন, বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি আর বিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সাজাতে হবে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির ভিত্তিতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তারা আবিষ্কার করল, এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ব্যাপারে কেউ একমত হতে পারছে না। দার্শনিক আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দেখা দিচ্ছে গভীর এবং তীব্র মতপার্থক্য। বিভিন্ন মতবাদ আর তত্ত্বগুলো একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক। একদিন এক জিনিসকে সত্য বলা হচ্ছে, পরেরদিন সেটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় নিজের সাথে সৎ থেকে ইউরোপের আর দাবি করার উপায় থাকল না যে তাদের বিশ্বাসের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো আছে; বরং তাদের কাছে আছে বিভিন্ন মত, ধ্যানধারণা, তত্ত্ব আর দর্শনের এক জগাখিচুড়ি। একে সুনির্দিষ্ট, সুসংহত জীবনব্যবস্থা বলা যায় না। জীবনদর্শন বলা যায় না।

তবে এখানে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাইয়ের সুযোগ থাকে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ, বিশ্বাস এবং অবস্থান ঠিক করা যাচ্ছে না, তাই বলা যায়—

> কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর দরকার নেই। মানুষ তার বিবেকবুদ্ধি খাটাবে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে, আর খোলা মন রাখবে। ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা কিংবা জীবনবিধানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না। এভাবে কোনো কিছু আঁকড়ে থাকা পশ্চাৎপদতা। এর বদলে পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে হবে। ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে হবে, আপডেট করতে হবে। এটাই অগ্রগতি, এটাই প্রগতি। আর প্রগতিই মুখ্য।

আর এটাই হলো মডার্নিসমের ভিত্তি। এভাবেই পশ্চিমা বিশ্ব দুনিয়া ও বাস্তবতার ব্যাপারে তাদের অসংলগ্ন অবস্থানকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে।

আধুনিকতাবাদের প্রধান দুই শাখা

আধুনিকতাবাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের সম্পর্ক আছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নারীবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদসহ বিভিন্ন মতবাদ আধুনিকতাবাদের ছাতার নিচে জড়ো হয়েছে। কিন্তু মডার্নিসমের প্রধান শাখা দুটি—

- লিবারেলিসম
- সায়েন্টিসম (বিজ্ঞানবাদ)

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, রাজনীতি, শাসন, মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলোর আলোচনা হয় লিবারেলিসমের অধীনে। আর মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি, কীভাবে কাজ করে, মহাবিশ্বকে আমরা কীভাবে বুঝব, মহাবিশ্বে কী আছে—এই প্রশ্নগুলোর আলোচনা হয় সায়েন্টিসমের অধীনে।

সায়েন্টিসম ফোকাস করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর। সায়েন্টিসমের অধীনে আবার বিভিন্ন মতবাদ পাবেন। যেমন—বস্তুবাদ, ন্যাচারালিসম, বিবর্তনবাদ, ডারউইনবাদ, এভ্যুলুশানারি বায়োলজি, এম্পিরিসিসমসহ আরও অনেক মতবাদ।

অন্যদিকে লিবারেলিসমের অধীনে আছে—ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নারীবাদ, সমাজতন্ত্র, ক্রিটিকাল রেইস থিওরিসহ বিভিন্ন মতবাদ। এই মতবাদগুলোর একটির সাথে আরেকটির অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে এদের অবস্থান লিবারেলিসমের ছাতার নিচে।

আধুনিকতাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

আধুনিকতাবাদের দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।

- ট্র্যাডিশান বিরোধিতা (Anti traditionalism)
- প্রগতিবাদ (Progressivism)

ট্র্যাডিশান বিরোধিতা

আধুনিকতাবাদ ট্র্যাডিশানের বিরোধিতা করে। আধুনিকতাবাদের বক্তব্য হলো—

ট্র্যাডিশন 'শেকলের মতো' মানুষকে আটকে রাখে। নতুন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে দেয় না। অগ্রগতি আর প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ট্র্যাডিশান থেকে মুক্ত হতে হবে, ট্র্যাডিশানকে ছুড়ে ফেলতে হবে। ধর্ম অনুসরণ করার অর্থ একধরনের ট্র্যাডিশান অনুসরণ করা। ইসলাম মেনে চলা, কুরআন-হাদীসের বক্তব্য গুরুত্বের সাথে নেয়া এবং এগুলোকে জীবনবিধানের উৎস বানানোর অর্থ অতীত আঁকড়ে থাকা। আপনি যখন কুরআন খুলছেন, হাদীস পড়ছেন তখন অতীতের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে তাকাতে হবে সামনের দিকে। এভাবে অতীত আঁকড়ে থাকলে আপনার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে আসবে। স্বাধীন বিকাশ ঘটবে না। পুরো পৃথিবী এগিয়ে যাবে আর আপনি আটকে থাকবেন ট্র্যাডিশানের শেকলে। তাই ট্র্যাডিশান বাদ দিতে হবে। অতীতের শেকল, অতীতের চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। নিজেকে বারবার বদলাতে হবে।

প্রগতিবাদ

প্রগতিবাদের বক্তব্য হলো সময়ের সাথে মানুষের অগ্রগতি হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো সেকেলে ধ্যানধারণা বাদ দিলে, পশ্চাৎপদ সাংস্কৃতিক প্রথাপ্রচলন থেকে বের হয়ে আসলে, যত সময় যাবে তত মানুষের অগ্রগতি হবে। সময় যত যাচ্ছে মানবজাতির তত অগ্রগতি এবং উন্নতি হচ্ছে।

মডার্নিসমের মতে এই অগ্রগতি আর উন্নতি মূলত দুটি দিক থেকে হচ্ছে। একদিকে যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে অগ্রগতি হচ্ছে নৈতিকতার। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে একদিকে আমরা আরও বেশি বুদ্ধিমান আর যৌক্তিক হচ্ছি, অন্যদিকে আমরা আরও বেশি নৈতিক হচ্ছি।

বর্ণবাদ, দাসত্ব, বিয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য, নারীবিদ্বেষ, পুরুষতান্ত্রিকতার মতো জঘন্য-সব জিনিস অতীতে প্রচলিত ছিল। অতীতে অনেক বেশি অন্যায়, অবিচার ছিল। কিন্তু এখন আমাদের অগ্রগতি হয়েছে। ওসব অনৈতিক সময় আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। মডার্নিসম যে নিখুঁত কল্পজগতের কথা বলে–দুনিয়াতে জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়–সেটাতে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি। কিন্তু সেই পথে আমরা নিরন্তর এগিয়ে যাচ্ছি। যতদিন আমরা নিজেদের বদলাতে থাকব, নিজেদের আপডেট করতে থাকব ততদিন অগ্রগতি আর প্রগতি চলবে।

একইভাবে বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক থেকেও আমরা এগোচ্ছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে দুনিয়াকে এখন আমরা আরও ভালোভাবে বুঝি। মহাবিশ্ব কীভাবে কাজ করে, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে শিখেছি। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যত অগ্রগতি হবে, মানবসভ্যতার তত অগ্রগতি হবে। অগ্রগতির গ্রাফ একটা ঊর্ধ্বগামী রেখা। সময়ের সাথে সাথে এটা ওপরে উঠতে থাকবে।

কাজেই আজকের একজন মানুষ আজ থেকে ২০, ৫০, ১০০ কিংবা ১০০০ বছর আগেকার মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, যৌক্তিক, জ্ঞানসম্পন্ন এবং নৈতিক।

সংঘাত

মডার্নিসমের এই অবস্থানের সাথে ইসলামের গভীর দ্বন্দ্ব আছে। আমরা জানি জ্ঞান এবং নৈতিকতার চূড়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়। শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রজন্ম, তারপর তাবেঈদের প্রজন্ম, তারপর তাবে-তাবেঈনের প্রজন্ম[৮৯]। তার পর

---

[৮৯] "আমার যুগের লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের।" [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

থেকে জ্ঞান, নৈতিকতা, তাকওয়া সবকিছুর অবনতি হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে অবনতির পরিমাণ। নৈতিকতাবোধ, বুঝ, আকল–সময়ের সাথে অবনতি হয়েছে সবকিছুর। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। তার পর আর কোনো নবী আসবেন না, আর কোনো ওয়াহি আসবে না। তিনি যা এনেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আর এই শিক্ষা জানা, বোঝা, অনুধাবন করা এবং পালন করার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছিল সাহাবীগণের প্রজন্ম।

কাজেই ইসলাম আমাদের জানাচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময় ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়। তার পর থেকে গ্রাফ নিম্নমুখী। অন্যদিকে আধুনিকতাবাদ আমাদের বলছে গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। ইসলামের শিক্ষার সাথে তাই আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গির গভীর দ্বন্দ্ব আছে। একই সাথে ইতিহাসের বাস্তবতার সাথেও মৌলিক সংঘাত আছে মডার্নিসমের মিথের।

এ কারণে কোনো মুসলিম যখন আধুনিকতাবাদের ধ্যানধারণা বুঝে কিংবা না বুঝে গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যে ইসলাম নিয়ে নানা ধরনের সংশয় কাজ করবে। শাসন, নারী অধিকার, রিবা, অর্থনীতি, পরিবার, স্ত্রীর দায়িত্ব, স্বামীর দায়িত্ব, যৌনতাসহ অসংখ্য বিষয়ে ইসলামের অবস্থানের সাথে আধুনিকতার অবস্থান মেলে না। যে অবস্থানগুলোকে আজ নৈতিক এবং যৌক্তিক মনে করা হয়, ইসলাম সেগুলোর স্বীকৃতি দেয় না। যে মানুষ মনে করে আজ আমরা জ্ঞান এবং নৈতিকতার চূড়ায় অবস্থান করছি, ইসলামের সাথে আধুনিকতার এই সংঘাতের মীমাংসা সে কীভাবে করবে?

খোদ কুরআনের অনেক বক্তব্য মেনে নিতেও তার কষ্ট হবে। অল্প কিছু আয়াত ছাড়া কুরআনের প্রায় সব আয়াতেই এমন কিছু-না-কিছু সে খুঁজে পাবে, যা তার মডার্নিস্ট বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ কাফিরদের জাহান্নামে পাঠাবেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাও হয়তো সে মেনে নিতে পারবে না। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আজ এমন অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও, এ কথাটা মানতে পারে না।

ইসলাম এবং মডার্নিসমের এই দ্বন্দ্ব অনেক মুসলিমের মনে সংশয় ও সন্দেহের জন্ম দেয়। এ জন্যই মডার্নিসম ঈমানের জন্য বিপজ্জনক। ইন্টারনেট আর ম্যাস মিডিয়ার কল্যাণে মডার্নিসমের এই বিশ্বাস আর মতবাদগুলো আজ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীজুড়ে। এগুলোর কবল থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। যে বাতাসে আমরা শ্বাস নেই তার মাঝেই যেন এগুলো মিশে গেছে। সচেতনভাবে কেউ যদি এই ধরনের মতবাদগুলোর কবল থেকে বের হবার চেষ্টা না করে, তাহলে এগুলো ক্রমাগত তাকে

প্রভাবিত করতে থাকবে। তার চিন্তাকে সংক্রমিত করতে থাকবে।

এ জন্য দেখবেন, মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা নারীবাদ কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো মতবাদগুলো দ্বারা প্রভাবিত, তারা সব সময় ইসলামী ইলমের ধারাকে বাদ দেয়ার কথা বলে। অতীতের আলিমগণের বক্তব্য বাদ দিতে বলে। কেউ সরাসরি বলে, কেউ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে। যেমন অনেকে বলে, 'আমাদের ইসলামী জ্ঞানের সংস্কার করতে হবে', 'ইসলামী শরীয়াহর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তন আনতে হবে', 'মাকাসিদুশ শরীয়াহর আলোকে বিভিন্ন মাসায়েলকে নতুন করে পুনর্বিবেচনা করতে হবে', ইত্যাদি। যেভাবেই বলা হোক না কেন, কথগুলোর মূল অর্থ এক– ইসলামের ইলমী সিলসিলাকে প্রত্যাখ্যান করে আধুনিকতাবাদের সাথে মিলিয়ে নতুন করে কুরআন-সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এই মানুষগুলো সাগরে বুকে নোঙরহীন নৌকার মতো। মডার্নিসমের বাতাস যেদিকে বইবে, সেদিকেই এরা ছুটে চলবে। এ কারণেই হকপন্থী আলিমদের সাহচর্যে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপনার নোঙর লাগবে। সঠিক পরিবেশে থেকে নিজেকে এসব প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। যদি সচেতন ও সক্রিয়ভাবে এ মতবাদগুলোর মোকাবিলা না করা হয় তাহলে একসময় ইসলামের ব্যাপারে ধারণা বদলাতে শুরু করবে। একপর্যায়ে মানুষ ইসলামকে তাচ্ছিল্য করতে, নিচু করে দেখতে শুরু করবে। এ জন্যই মডার্নিসম সম্পর্কে জানা, বোঝা এবং এর মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি।

নববী যুগ কেন শ্রেষ্ঠ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় কেন জ্ঞান এবং নৈতিকতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ? নৈতিকতার দিক থেকে কেন শ্রেষ্ঠ সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে কেন সেই সময়টা শ্রেষ্ঠ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় তো এত প্রযুক্তি ছিল না। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি তখনো হয়নি। তাহলে কীভাবে আমরা সেই সময়কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করব?

এই প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আগে আমাদের বুঝতে হবে, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা আসলে কী। এই শব্দগুলোকে ইসলামের অবস্থান থেকে বুঝতে হবে। আল্লাহ কী বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন, সেটা দেখতে হবে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া সংজ্ঞা ফেলে অন্যদের বানানো সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা কিংবা অন্যদের ভাষা আর পরিভাষা আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

তাহলে জ্ঞান কী? বুদ্ধিমত্তা কী?

সত্যকে চেনা। হক্ককে চেনা। হক্ক আর বাতিলের পার্থক্য করতে পারা। এটা হলো জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার সত্যিকারের কেন্দ্র।

জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার যে ব্যাখ্যা বস্তুবাদ দেবে তা বিকৃত, সংকীর্ণ এবং নড়বড়ে। বস্তুবাদ বলবে, বুদ্ধিমান হবার অর্থ দৃশ্যমান পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু কীভাবে একে অপরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে সেটা জানা। যেমনটা পদার্থবিজ্ঞান কিংবা রসায়নে শেখানো হয়। অর্থাৎ বস্তুবাদের মতে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হবার অর্থ নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা। যেমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কীভাবে আরও দ্রুত গতিতে যাওয়া যায় তা বের করা।

অবশ্যই এসব প্রযুক্তির উপকারিতা আছে, কিন্তু এটাই কি সব? বাস্তবতা কি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ? অবশ্যই না।

সবচেয়ে বড় সত্য কী? সবচেয়ে বড় বাস্তবতা কী?

সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, আল্লাহ আমাদের রব এবং তাঁর ইবাদাত করতে হবে। যে আল্লাহকে চেনে না, যে তাঁর রাসূলকে চেনে না, তাকে কীভাবে জ্ঞানসম্পন্ন বলা যায়? তাকে কীভাবে বুদ্ধিমান বলা যায়? সবচেয়ে স্পষ্ট বাস্তবতাকে চিনতে সে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের একজন রব আছেন এবং তাঁর ইবাদত করতে হবে, এই অবিসংবাদিত সত্যকে সে গ্রহণ করতে পারেনি। কীভাবে সে নৈতিকতা আর বুদ্ধিমত্তার শিখরে থাকার কথা দাবি করে যখন মৌলিক এই বাস্তবতাকে সে চিনতে পারেনি?

মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তার ভেতরে কী আছে, সেটাও সে জানে না। সে তার নিজের রূহ, ক্বলব, নাফসকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সে টিস্যু, সেল, শিরা, উপশিরা, ধমনি চিনতে শিখেছে, কিন্তু এর বাইরে আর কিছু সে বোঝে না। এমন সীমিত জ্ঞানের মানুষ কীভাবে নৈতিকতা আর বুদ্ধিমত্তার চূড়ায় থাকার দাবি করে? এ দাবি আমরা প্রত্যাখ্যান করি। নৈতিকতা, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার শিখর হলো আল্লাহর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসা দিকনির্দেশনা। যা জিব্রিল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

মডার্নিসমের মৌলিক সমস্যা হলো, মর্ডানিসম মানুষের খেয়ালখুশি আর কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। মডার্নিসম মনে করে মানুষের বুদ্ধিমত্তা এই কামনা-বাসনা, খেয়ালখুশি, পূর্বধারণা, আর বায়াস ভেদ করে সত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন মানুষ কতটা অযৌক্তিক, কতটা নির্বোধ। মানুষ একদিন একটা কথা বিশ্বাস করে, পরের দিন

অন্য কিছু। একদিন একটা জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়ায় পরের দিন ছোটে অন্য কিছুর পেছনে। সংস্কৃতি বদলায় প্রতিনিয়ত। মানুষের বানানো যেসব ধ্যানধারণা গতকাল সমাধান দিতে পারেনি, আজ সেগুলো সমাধান দিতে পারবে, এমন মনে করার কারণ কী? বরং এগুলো মানুষকে আরও দুর্দশা আর অবনতির দিকে নিয়ে যাবে।

যে আসলেই বুদ্ধিমান, যে আসলেই জ্ঞানসম্পন্ন, সে মানুষের বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতাকে চিনতে পারে। সে বোঝে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ভেদ করে মানুষের বুদ্ধিমত্তা দেখতে পারে না। তাই স্রষ্টার কাছ থেকে আসা আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। এই সত্য একজন অমুসলিমও চিনতে পারার কথা। সত্যিকারের নির্দেশনা আসতে হবে পার্থিব সীমার অতীত কোনো উৎস থেকে, ওপর থেকে। আর সেই উৎস হলেন আমাদের রব, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনিই জানেন কোনটা আমাদের জন্য উত্তম। কোনটা কল্যাণকর। তিনিই বাস্তবতার এবং মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বাধিক অবগত। তাই আমাদের উচিত জ্ঞানের মূল উৎসের কাছে যাওয়া। মানুষের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর না করে মূল উৎস থেকে নির্দেশনা নেয়া।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়, মানুষের খেয়ালখুশির অনুসরণের পরিণতি ভালো হয় না। আর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা ত্যাগ করার ফলাফল কী, চোখের সামনেই আজ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানবজাতি পথ হারিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশনা ছাড়া মানুষ কতটা দিকভ্রান্ত হতে পারে, আজকের মতো আর কখনো হয়তো তা এতটা স্পষ্ট ছিল না।

সংস্কারপন্থী ও মডার্নিস্ট মুসলিম

'ট্র্যাডিশানাল' মুসলিম বনাম মডার্নিস্ট 'মুসলিম'

'ট্র্যাডিশানালিস্ট' মুসলিম একটা প্রতিক্রিয়াশীল শব্দ। মডার্নিস্ট এবং সংস্কারবাদী মুসলিমদের সাথে পার্থক্য বোঝাতে জন্য কোনো-না-কোনো শব্দ ব্যবহার করা দরকার ছিল, তাই ট্র্যাডিশানালিস্ট শব্দটা ব্যবহার করা।

ট্র্যাডিশানালিস্ট মুসলিমের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আধুনিকতাকে বিশেষ ও অনন্য মনে করার ব্যাপারে সংশয়বাদী অবস্থান। এর বিপরীতে একজন মডার্নিস্টের অবস্থান হলো, সে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে সংশয়বাদী আর মডার্ন এক্সসেপশানালিসমে ঘোরতর বিশ্বাসী।

মডার্ন এক্সসেপশানালিসম কী? মডার্নিস্টরা মনে করে আমরা ইউনিক এক সময়ে বসবাস করছি। আগেকার যুগে যেভাবে ইসলাম পালিত হয়েছে, সেভাবে আর এখন পালন করা যাবে না। মডার্নিস্টরা আরও বিশ্বাস করে, আধুনিক যুগে আমাদের কাছে এমন-সব অনন্য জ্ঞান আছে, যেগুলো অতীতের মুসলিমদের কাছে ছিল না। এই জ্ঞান, আমাদের নতুনভাবে ইসলাম পালন করার লাইসেন্স দেয়।

এই অবস্থানের সাথে ট্র্যাডিশানালিস্টরা শুধু দ্বিমত পোষণ করে না; বরং একে অযৌক্তিকও মনে করে। আধুনিক সময়ের এমন কী অনন্যতা আছে, যার কারণে মুসলিমদের বিশ্বাস ও আচরণে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে হবে? গত ১৪০০ বছর ধরে আমরা সেই একই প্রজাতি। আমাদের মানসিক গঠনও সেই একই। সেই একই প্রবণতা আর দুর্বলতাগুলো আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। স্থান-কাল-পাত্রভেদে নির্দিষ্ট সীমার ভেতর কিছু পরিবর্তনের সুযোগ শরীয়াহতে আছে। কিন্তু আমাদের সময়ের এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, যার কারণে মর্ডানিস্টদের প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোকে বৈধতা দেয়া যায়।

গত ১৪০০ বছরের আলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক অর্জন ও অবদানকে ট্র্যাডিশানালিস্টরা সম্মান করা। যদি উম্মাহর সকল যুগের ব্যাপকসংখ্যক আলিম

কোনো কাজ বা বিশ্বাসকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে থাকেন, তাহলে সেটা ওই বিশ্বাস অথবা কাজের বৈধতার প্রমাণ। মুসলিম উম্মাহ বাতিলের ওপর একমত হবে না।[৯০]

আমাদের সময় আর আমাদের মাঝে এমন কী বিশেষত্ব আছে, কী এমন অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা আছে, যার কারণে মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যেতে হবে?

---

[৯০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে (অথবা তিনি বলেন,) উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রষ্টতার ওপর একত্র করবেন না'। তিরমিযী।

মুসলিম-বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের পশ্চিমা কৌশল

ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি সরকারি নথি থেকে জানা গেছে, মুসলিম-বিশ্বে 'ইসলামী সংস্কার' প্রচার করার জন্য মুসলিম নারী ও তরুণদের ব্যবহারের ব্যাপারে মার্কিন স্টেইট ডিপার্টমেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনকে পরামর্শ দিয়েছিল। তাদের মতে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর ফোকাস করা মুসলিম-বিশ্বে অ্যামেরিকান শক্তি আর মুক্তির বয়ানকে টিকিয়ে রাখার সুযোগ করে দেবে।[১১]

১। ইসলামকে বিকৃত করা এবং মুসলিম উম্মাহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নারী আর তরুণদের ব্যবহারের কৌশল নতুন না। বরাবরই এটা ছিল ঔপনিবেশিক দখলদারদের মূল কৌশল। শুধু মুসলিম-বিশ্বে না, গত কয়েক শ বছর ধরে অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন—এই কৌশল তারা প্রয়োগ করেছে সব জায়গাতেই।

লর্ড ক্রোমারসহ অন্যান্য দখলদাররা সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করত, মুসলিম পুরুষরা নারীদের বন্দী এবং পরাধীন করে রেখেছে। ইউরোপীয় পুরুষ মুসলিম-বিশ্বে ইউরোপীয় মূল্যবোধ নিয়ে এসেছে মুসলিম নারীকে মুক্ত করার জন্য। ক্রোমাররা বলত, নারী অধিকারকে জায়গা করে দেয়ার জন্য ইসলামী আইনের (শরীয়াহর) সংস্কার করা জরুরি।

'মুক্ত' হবার জন্য মুসলিম নারীর প্রথম করণীয় হলো, হিজাব খুলে ফেলে পশ্চিমা নারীদর মতো পোশাক পরা। পাশাপাশি মুসলিম নারীকে সব ধরনের পুরুষের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে হবে। সেটা বাবা হোক, স্বামী হোক, কিংবা পুরুষ আলিম হোক। সেই সাথে বিলুপ্ত করতে হবে বহুবিবাহের 'বর্বর' বিধান। ঘরের ভেতর 'ধুঁকে-ধুঁকে মরা'র জীবন ছেড়ে যেকোনো মূল্যে বেরিয়ে এসে নারীকে যোগ দিতে হবে কাজে। এসব কথাবার্তার সুবাদে দখলদাররা পেল সস্তা আর সহজে প্রতিস্থাপনযোগ্য অনেক শ্রমিক। আর মুসলিম সমাজে পড়ল সুদূরপ্রসারী প্রভাব। মুসলিম বিশ্বে চালানো এসব ঔপনিবেশিক প্রকল্পের আলোচনা বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কাজে উঠে এসেছে।

---

[১১] **Leaked State Department Memo Advised Trump Administration To Push For "Islamic Reformation", The Intercept, June ১৯, ২০১৮**

ঔপনিবেশিক দখলদারদের এই কৌশলের মূল লক্ষ্য ছিল, প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম পরিবারকে ভেঙে দেয়া। মজবুত, সুসংহত পরিবার উম্মাহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী, পিতার বিরুদ্ধে কন্যা, ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোনকে উস্কে দিয়ে খুব সহজেই এই প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলিম জনগণের ওপর বাড়ে ঔপনিবেশিক দখলদারের নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব। শত শত বছর ধরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে ওরা। আর এসব করা হয়েছে নারী ক্ষমতায়নের স্লোগানের আড়ালে। দুই শতাব্দী ধরে এভাবেই হয়েছে এই পরিকল্পনার মার্কেটিং। মুসলিম ফেমিনিস্টরা যখন ইসলামের ইলমী সিলসিলাকে অস্বীকার করে শরীয়াহ সংস্কারের আহ্বান করে, তারা তখন মূলত ঔপনিবেশিক আর সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এ কারণেই একইসাথে ফেমিনিস্ট আর 'ডিকলোনিয়াল' অথবা ফেমিনিস্ট আর 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' হওয়ার দাবি পরস্পরবিরোধী এবং সাংঘর্ষিক।

২। আমার বিরোধিতাকারীরা বলেন, নারীবাদ আর নারীবাদীদের নিয়ে আমি অনেক বেশি মাথা ঘামাই। কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন, যখন খোদ মার্কিন স্টেইট ডিপার্টমেন্ট বলছে, ইসলামকে আক্রমণ করার মূল পথ হলো 'নারী অধিকার' সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুকে পুঁজি করে আগানো? ইসলামের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে জেনেও শত্রুদের নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করতে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনার পক্ষে কি সম্ভব?

৩। বিভিন্ন সময়ে কিছু অ্যামেরিকান মুসলিম সংস্থার অসাধু কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি লিখেছি। এসব সংস্থা, যারা নিজেদের 'সংস্কারপন্থী' বলে থাকে। 'নারীর ক্ষমতায়ন' নিয়ে কাজ করার জন্য মার্কিন সরকারের কাছ থেকে এসব সংস্থা হাজার হাজার ডলার পায়। মার্কিন সরকার কেন ছোট ছোট মুসলিম সংস্থাগুলোকে এত টাকা দিয়ে সাহায্য করবে? কোন স্বার্থে?

এ প্রশ্নের উত্তর এ নথিতেই দেয়া আছে। এ সবকিছু হলো সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছেমতো ইসলামের সংস্কার করার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ। এসব সংস্কারবাদী আর নারীবাদী সংগঠনগুলো মার্কিন সরকারের অতিউৎসাহী এজেন্ট, যারা আগ্রাসীভাবে আমাদের মসজিদ, এবং দ্বীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হাদীস এবং জ্ঞানতত্ত্ব : আদম (আলাইহিস সালাম)-এর উচ্চতা

নিচের হাদীসটি দেখে অনেক মুসলিম সংশয়ে পড়ে যায়–

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ওই ফিরিশতা দলের প্রতি সালাম করো এবং তাঁরা তোমার সালামের জবাব কীরূপে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কেননা, এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম (আলাইহিস সালাম) (ফিরিশতাদের) বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম।" ফিরিশতাগণ তার উত্তরে "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বললেন। ফিরিশতারা সালামের জবাবে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম (আলাইহিস সালাম) এর আকৃতি-বিশিষ্ট হবেন। তবে আদমসন্তানদের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১২]

সংশয়ে পড়ে যাওয়া অনেকে প্রশ্ন করে, 'আদম আলাইহিস সালাম এবং অতীতের মানুষরা যে আসলেই এত লম্বা ছিল তার প্রমাণ কী?'

প্রশ্নটা আসলে মজার। কারণ, মুসলিমের জন্য সহীহ হাদীসই প্রমাণ। কুরআন এবং সুন্নাহই তো প্রমাণ। সহীহ হাদীসের বক্তব্য দেখারও পর কারও মধ্যে সংশয় বা সন্দেহ বা সংশয় কাজ করতে পারে দুটি কারণে :

১) সে ঢালাওভাবে সব হাদীসের ব্যাপারে সন্দিহান,

২) আদম আলাইহিস সালাম-এর উচ্চতার ব্যাপারে জ্ঞানের উৎস হিসেবে সহীহ হাদীসের তুলনায় বর্তমান বিজ্ঞানের বক্তব্যকে সে বেশি সঠিক মনে করে।

যদি ১ হয়, তাহলে আদম আলাইহিস সালাম-এর উচ্চতার হাদীসের চেয়ে আরও গুরুতর বিষয় নিয়ে তার দুশ্চিন্তা করা উচিত।

---

[১২] সহীহ বুখারী

যদি ২ হয়, তাহলে এই ব্যক্তি আসলে মনে করছে আদম আলাইহিস সালাম-এর দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেছেন অথবা হাদীস বর্ণনাকারীরা ভুল করেছেন। মনে রাখবেন, আদম আলাইহিস সালাম-এর উচ্চতার কথা একাধিক সহীহ হাদীসে কথা এসেছে। এটা যদি বর্ণনাকারীর ভুল হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে বেশ ক'জন বর্ণনাকারী এখানে ভুল করেছেন।

কিন্তু এ হাদীস নিয়ে সংশয় তৈরি হবার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রথমত, বিজ্ঞানের বর্তমান ঐকমত্যকে হাদীসে বর্ণিত অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রাসঙ্গিক মনে করি না। আল ইসরা ওয়াল মি'রাজের কথা চিন্তা করুন। নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) যেকোনো মু'জিযার কথা চিন্তা করুন। কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত যেমন, ইয়া'জুজ-মা'জুজের কথা চিন্তা করুন। এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বক্তব্যকে আমরা প্রাসঙ্গিক মনে করি না।

আর আপনার যদি হাদীস নিয়ে সমস্যা থাকে, তাহলে কুরআনেও এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে মেলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য যদি এসব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক না হয়, তাহলে হঠাৎ করে আদম আলাইহিস সালাম-এর উচ্চতার ব্যাপারে কেন বিজ্ঞানই সত্যমিথ্যার চূড়ান্ত মাপকাঠি হয়ে গেল?

তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য-কে যারা এত গুরুত্বের সাথে নেন, আমার মনে হয় তারা আসলে বিজ্ঞানের ধরন এবং ইতিহাস নিয়ে জানেন না। আমার এ বিষয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে। আমি হার্ভাডে ফিযিক্স নিয়ে পড়েছি। দর্শন আর বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে পড়েছি হার্ভার্ড এবং টাফটসে। আমি এমন প্রফেসরদের কাছে পড়েছি, যারা নোবেল বিজয়ী ছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা ছিল অবাক হবার মতো। বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে জানার আদৌ কোনো দরকার আছে বলেও তারা মনে করেন না। জ্ঞান এবং জানার ইচ্ছার অভাবের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ এবং মায়োপিক। এত বড় বড় বিজ্ঞানীর মধ্যে এমন ব্যাপার দেখাটা বেশ অদ্ভুত।

আমাদের এই আলোচনার সাথে বিজ্ঞানের ইতিহাসের ব্যাপারে একটি তথ্য প্রাসঙ্গিক। অতীতের প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিশালাকায় মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এ ধারণার ভিত্তি ছিল মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন ফসিল এবং হাড়। যেমন মেগানথ্রোপাস (Meganthropus) নামের একটি প্রজাতির ফসিল। তবে অধিকাংশ আধুনিক বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে জানে না। কিন্তু তাদের এই না জানার কারণে পূর্ববর্তী কাজ এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড মুছে যায় না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর অনুমানকে প্রাধান্য দিই না, কারণ

আমি একজন মুসলিম। সহীহ হাদীস বিনাবাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিতে এবং এতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সন্তুষ্ট আমার কোনো সমস্যা হয় না; বরং কুরআন ও হাদীসের যে বক্তব্যগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায়, সেগুলো আমার প্রিয়। কারণ, এ আয়াত এবং হাদীসগুলো মহাবিশ্ব এবং ইতিহাসের ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য আমাকে জানাচ্ছে যেগুলো অন্য কোনোভাবে জানার উপায় আমার ছিল না।

***

বি.দ্র. ১—উচ্চতা আর হাড়ের শক্তির কথা এনে অনেকে এই হাদীসগুলোর ব্যাপারে আপত্তি করতে চায়। এটা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। পর্যাপ্ত ঘনত্ব থাকলে হাড় যেকোনো উচ্চতার প্রাণীকে ধরে রাখতে পারে। হাড়ের গঠনের কথা বলে এই হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হলো অ্যারোডায়নামিক হবার কথা বলে বুরাকের গতির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার মতো।

বি.দ্র. ২—এই হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এর দেয়া একটি ব্যাখ্যার কথা মুফতী তাকী উসমানী উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতে অনেক লম্বা ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর তার উচ্চতা কমে আসে।[১৩] এ ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেছেন হাদীসের ভাষা বিশ্লেষণ করে। এ বিশ্লেষণ ঠিক নাকি ভুল, তা আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু মনে রাখার বিষয় হলো, এই ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে দেয়া না।

[১৩] Usmani, Muhammad Taqi, Takmila Fath al-Mulhim, Vol. 6, p.15 As cited by Waqar Akbar Cheema: Hadith about height of Adam and later generations explained

'কমিউনিস্ট ইসলামের' ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা

বিংশ শতাব্দীর অনেক অ্যাকাডেমিক মুসলিমদের মধ্যে সমাজতন্ত্র একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। এসব মুসলিমদের চোখে কমিউনিসম ছিল ন্যায়বিচার আর পার্থিব সভ্যতার শিখর। সোভিয়েত ইউনিয়নও এ সময় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। মুসলিমদের কেন কমিউনিসমের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে অ্যাকাডেমিক মুসলিমরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে লেখালেখি শুরু করল। ইসলামের মূল শিক্ষা যে আসলে সমাজতান্ত্রিক, তা প্রমাণে উঠেপড়ে লেগে গেল। কুরআন-হাদীসের মধ্যেও তারা কমিউনিসম খুঁজে পেল। যাকাত, আর সাদাকাহর বিধান দেখিয়ে বলল, 'এই যে দেখো প্রমাণ! ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার বিরোধী!'

ইসলামী আইনের এমন অনেক দিক আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তি-মালিকানার ধারণা মেনে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো কমিউনিসমের সাথে সাংঘর্ষিক হবার কারণে মুসলিম কমিউনিস্টরা ফিকহশাস্ত্রকে আক্রমণ করে বসল। বলল–

> ফিকহ সেকেলে, ফিকহের অবস্থান অন্যায্য এবং ফিকহ আসলে আল্লাহর দেয়া দ্বীনের পুঁজিবাদী বিকৃতি। ক্লাসিকাল আলিমরা সবাই সম্পদের মালিক ছিল। নিজেদের বুর্জোয়া এজেন্ডা রক্ষার জন্যে আর শ্রমিক-শ্রেণিকে শোষণের লক্ষ্যে তারা ফিকহের আইন-কানুন বানিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই সে সময়কার অনেক মুসলিম এসব কথাবার্তার বিরোধিতা করল। মুসলিম কমিউনিস্টদের যুক্তির নানা ফাঁকফোকর তুলে ধরল। প্রতিবাদ করল আলিমগণের ওপর দেয়া অপবাদের বিরুদ্ধে। এভাবে বারবার বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হতে এই মুসলিম কমিউনিস্টরা আরও উগ্র হতে থাকল। একসময় তারা ইসলাম থেকে বেরই হয়ে গেল।

> মার্ক্স কি বলেননি, ধর্ম জনগণের আফিম? আর এই ট্র্যাডিশানাল মুসলিমরাই না কমিউনিসমের সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার আর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে অস্বীকার করছে! মূল সমস্যা তাহলে ইসলামেই!

তাদের চোখে মুসলিমরা ছিল ধর্মান্ধ ভেড়া। তাই ইসলাম ত্যাগ করে তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তাদের আশা ছিল, অদূর ভবিষ্যতে কমিউনিসমের উজ্জ্বল আলো ইসলামী ট্র্যাডিশানের গাঢ় অন্ধকারকে দূর করে দেবে। পুরো মুসলিম-বিশ্ব তাদের অনুসরণ করে তখন প্রবেশ করবে এনলাইটেনমেন্টের এক নতুন পর্যায়ে।

কিন্তু তারপর কী হলো? সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটল। কমিউনিসমের বাজার পড়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে দেখা গেল, এই অ্যাকাডেমিকদের লেখাজোখা আর বক্তব্য, কারও মনে নেই। তারা এবং তাদের কাজ বিস্মৃত। তাদের পুরো আন্দোলনের স্থান হলো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

আজ যারা অশালীনতা আর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করছে, যারা আলিমদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে এবং তাদের ওপর অপবাদ দিচ্ছে, যারা মুসলিমদের অন্তরে বিভ্রান্তি আর সংশয় তৈরি করছে, যারা শরীয়াহ পরিবর্তনের দাবি আর চক্রান্ত করছে সেই মডার্নিস্ট লিবারেল মুসলিমরা, নিকট অতীতের কমিউনিস্ট মুসলিমদের মতো ঠিক সেই একই পথে, একই পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

আল্লাহ তাদের পরিণতিকে ত্বরান্বিত করুন।

'ইসলামী সংস্কার' নামক হাইড্রা

তথাকথিত প্রগতিশীল কিংবা সংস্কারবাদী মুসলিমদের ধ্যানধারণার খণ্ডন করা কি জরুরি?

না। এদের সাথে বিতর্ক করা অর্থহীন, কারণ তাদের কোনো উসুল নেই। কোনো স্থায়ী মূলনীতি নেই। তারা যেসব বিচিত্র, আজগুবি মত নিয়ে হাজির হয়, সেগুলোর পেছনে কোনো স্পষ্ট কাঠামো নেই। তাদের অবস্থানকে যখন একদিক থেকে আক্রমণ করবেন সাথে সাথে তারা সুর পাল্টে অন্য দিকে চলে যাবে। ক্রমাগত গোলপোস্ট সরাবে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা কোনোদিকেই আগাবে না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বলছি।

এসব প্রগতিশীল কিংবা সংস্কারবাদীদের অবস্থানকে পুরোপুরি ভুল প্রমাণের জন্য তাদের সাথে বিতর্ক করা জরুরি না; বরং ওই আদর্শগুলোকে আক্রমণ করুন, যেগুলো তাদের অবস্থানের মূল ভিত্তি—অর্থাৎ লিবারেল-মডার্নিস্ট চিন্তা।

নিচের উদাহরণটা দেখুন,

হিজাব আর পাবলিক প্লেইসে নারী-পুরুষের পৃথক অবস্থান নিয়ে কথিত মুসলিম সংস্কারবাদীরা অনেক চেঁচামেচি করে। এসব বিধান পুরুষতান্ত্রিক, এগুলো যুলুম, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের মধ্যে যারা একটু সূক্ষ্মবুদ্ধির, তারা ইসলামী ইতিহাস থেকে বেছে বেছে এমন কিছু উদাহরণ বের করে নিয়ে আসে, যেগুলো তাদের বক্তব্যের পক্ষে যায়। তারপর এর সাথে 'মাকাসিদ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ' এর খিচুড়ি বানিয়ে উপস্থাপন করে।

অনেকে এদের সবগুলো ভুল ধরে ধরে দেখাতে চান। কুরআন, সুন্নাহ, মাকাসিদুশ শরীয়াহ, মাসলাহাসহ ফিকহের বিভিন্ন নীতির বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ—প্রতিটা পয়েন্ট তারা দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করে দেখান। নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু দিনশেষে এটাতে তেমন একটা কাজ হয় না, কারণ ভুল ধরিয়ে দেয়া মাত্র সংস্কারবাদী তার বক্তব্য বদলে ফেলে। একইরকমের জোড়াতালি দিয়ে অন্য যুক্তি

নিয়ে আসে। এদের অবস্থা গ্রীক পুরানের হাইড্রা দানবের মতো।[১৪] একটা মাথা কাটা হলে সেই জায়গায় নতুন দুটো মাথা উদিত হয়।

এ দানবকে মারার কার্যকরী উপায় হলো সোজা এর হৃৎপিণ্ডে আঘাত করা। সংস্কারবাদীদের পালের হাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে যখন পোশাক, অত্যাচার, শোষণ, পুরুষতন্ত্র, নারী-পুরুষের ভূমিকার মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে মডার্নিস্ট, লিবারেল ধারণাগুলোকে আক্রমণ করা হবে এবং এগুলোকে ভুল প্রমাণ করা হবে। সংস্কারবাদীদের অধিকাংশই আসলে ভাসাভাসা চিন্তা করতে অভ্যস্ত। নিজেদের আদর্শের শেকড় নিয়ে এরা কখনো গভীরভাবে চিন্তা করেনি। কখনো ক্রিটিক করার চেষ্টা করেনি। কাজেই মূলে আঘাত করলে এদের বালুর প্রাসাদ খুব দ্রুত ধসে পড়ে।

ব্যাপারটা আসলে একদিক থেকে দুঃখজনক। নিজেদের ঈমানকে এরা এত নড়বড়ে কিছু ধারণার ওপর ভিত্তি করে ধ্বংস করছে যেগুলোর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক শক্তি নেই। এগুলো প্রাসঙ্গিক হবার একমাত্র কারণ হলো এগুলো সময়ের ট্রেন্ড হওয়া।

[১৪] হাইড্রা—গ্রিক পুরাণে বর্ণিত জলদানবী। গ্রিক পুরাণ অনুসারে : হাইড্রা দানবীর ৯টি মাথা ছিল, যার মধ্যে একটি ছিল অমর। বাকি মাথাগুলোর একটিকে কেটে ফেলা হলে কাটা জায়গা থেকে দুটো নতুন মাথা গজাত। হারকিউলিস হাইড্রাকে হত্যা করে। - অনুবাদক

মডার্নিস্ট গাইডবুক

লিবারেল মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক এমন যেকোনো ইসলামী অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য নিচের গাইডটি ব্যবহার করুন! আমাদের শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে তর্ক করে আপনি জায়েজ বানাতে পারবেন যেকোনো কিছু। একইসাথে প্রমাণ করতে পারবেন ইসলামী ইতিহাসের আলিমরা আপনার পক্ষেই আছেন।

আমাদের এই গাইড আপনাকে শেখাবে কিংবা বিরক্তিকর ট্র্যাডিশানাল মুসলিমদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হয়। সেই সাথে আপনি শিখবেন কীভাবে সূক্ষ্মদর্শী, মনীষী, আলিম এবং সংস্কারবাদী ইসলামের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। আমাদের এই গাইড একবার ব্যবহার করেই দেখুন না, বিফলে মূল্য ফেরত!

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই ব্যাপারে ইজমা আছে।

মডার্নিস্ট যুক্তি—আসলে ইজমার ধারণা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই বর্ণনাগুলো মুতওয়াতির।

মডার্নিস্ট যুক্তি—আসলে তাওয়াতুর নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এটা চার মাযহাবের মত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—চার মাযহাবের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখা উচিত না, কারণ আজ আমরা এক ভিন্ন বাস্তবতায়, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বেঁচে আছি।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এটা অমুক মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—হ্যাঁ, কিন্তু জুমহুর আলিম এখানে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাই সংখ্যালঘু অবস্থান বাদ দাও।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এটা জুমহুরের মত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—হ্যাঁ, কিন্তু অল্প কিছু আলিম এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাই আমরা অধিকাংশের মত বাদ দিতে পারি।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই আয়াত ক্বাত'ই।

মডার্নিস্ট যুক্তি—না।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই হাদীসের বক্তব্য স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন।

মডার্নিস্ট যুক্তি—কিন্তু এটা আহাদ হাদীস। আমরা এটা বাদ দিতে পারি।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এটা এই মাযহাবের সবচেয়ে শক্তিশালী মত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—কিন্তু একজন বর্ণনাকারীর সূত্রে একজন সাহাবী থেকে একটা বর্ণনা আছে, যা এই মতের বিরুদ্ধে যায়। তাই আমরা এই মত বাদ দিতে পারি।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—অধিকাংশ তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাপারে একই ব্যাখ্যা এসেছে।

মডার্নিস্ট যুক্তি—হ্যাঁ, কিন্তু একটা তাফসিরে একটু আলাদা ব্যাখ্যা এসেছে, যা প্রমাণ করে বাকি সব তাফসির আসলে মুফাসসিরদের কালচারাল বায়াসের ফল।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই ব্যাপারে ফকীহগণ একমত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—ফকীহদের হাদীসের জ্ঞান সীমিত। এই ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনের বক্তব্য কী, সেটা দেখতে হবে।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—এই ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—কিন্তু মুহাদ্দিসদের ফিকহের জ্ঞান সীমিত। তাই ফকীহগণ কী বলেছেন সেটা দেখতে হবে।

ট্র্যাডিশানালিস্ট—ফকীহগণ এবং মুহাদ্দিসগণ এই ব্যাপারে একমত।

মডার্নিস্ট যুক্তি—কিন্তু আমরা একটা ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন বাস্তবতায় বসবাস করি। তাই আমাদের ইজতিহাদ করতে হবে। ইসলাম জীবন্ত, ইসলাম সব যুগে আধুনিক, ইসলাম...।

দেখলেন তো! কত সহজে যেকোনো চিপা থেকে বের হওয়া সম্ভব? যখন আপনার বিন্দুমাত্র সততা থাকবে না, কনসিসটেন্সির কোনো স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না, তখন যেকোনো কিছুকে জায়েজ বানানো সম্ভব।

তাহলে আর দেরি কেন? আজই কিনুন এবং যাচাই করে দেখুন আমাদের মডার্নিস্ট গাইডবুক। বিফলে মূল্য ফেরত!!

জ্ঞান বনাম জ্ঞানের ভান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

> *আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে?' জেনে রাখো, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। [তরজমা, সূরা আল-বাকারাহ, ১৩]*

আজও এমন মানুষ আছে, যারা মুমিনদের নির্বোধ বলে। নিশ্চিতভাবে এই লোকগুলোই হলো প্রকৃত নির্বোধ। তারা সত্য জানে না এবং তারা যে জানে না সেটাও তারা জানে না।

আফসোসের বিষয় হলো, অনেক মুসলিমও এ ব্যাপারটা জানে না। সত্য প্রত্যাখ্যান করা লোকদের নির্বোধ হিসেবে দেখার বদলে তাদের দেখা হয় বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী হিসেবে। তাদের ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, দর্শন মুসলিমদের মধ্যে এমনভাবে প্রচার করা হয় যে একসময় এসব চিন্তা আর তত্ত্বের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মুসলিমরা নিজেদের বিশ্বাসকে বদলাতে শুরু করে। অথচ এগুলো আসছে এমন মানুষদের কাছ থেকে যারা কঠোরভাবে ঈমানকে অস্বীকার করে। এমন আচরণের পরস্পরবিরোধিতা মুসলিমদের চোখে ধরা পড়ে না।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এসব লোকদের মুসলিমরা সম্মানের এমন আসনে বসায়, তাদের প্রতি এতই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস মুসলিমদের মধ্যে কাজ করে, যে তারা আলিমদের নিন্দা করা শুরু করে—আলিমরা কিছু জানে না, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৌড় সীমিত, তারা আসলে খেয়ালখুশি অনুযায়ী কথা বলে, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অর্থ তারা বোঝেনি, ইত্যাদি।

এমন হবার কারণ কী? অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মুসলিমরা এমন কিছু ধ্যানধারণা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছে, যেগুলো তারা পুরোপুরিভাবে বোঝে না। আপনি যখন কোনো কিছু ঠিকমতো বুঝবেন না তখন আপনার হাতে দুটো অপশান থাকে।

আপনি সেটা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করবেন (যদিও কেন প্রত্যাখ্যান করছেন সেটা

আপনি জানেন না)। অথবা আপনি বাহ্যিক অবস্থা থেকে সেই জিনিসের মূল্য বিচার করার চেষ্টা করবেন।

> এটা কি দেখে ঠিকঠাক মনে হচ্ছে? ভালো মনে হচ্ছে? কথাগুলো শুনতে কি জ্ঞানী জ্ঞানী মনে হচ্ছে? নামিদামি লোকেরা কি এই কথাকে সমর্থন করছে? জনগণ কি এটা গ্রহণ করেছে? এটা কি জনপ্রিয়?

অর্থাৎ, কোনো কিছু আপাতভাবে 'জ্ঞান' মনে হওয়াই যথেষ্ট। মুসলিমরা আজ যেসব মডার্নিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেছে, তার অধিকাংশই গ্রহণ করা হয়েছে এ মূলনীতির ভিত্তিতে।

খুব অল্প কিছু মানুষ পাবেন, যারা কোনো কিছু পুরোপুরি না বুঝতে পারলে, নিশ্চিত না হতে না পারলে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও এটা নিরাপদ রাস্তা কিন্তু এতে করে বৃহত্তর উম্মাহ লাভবান হয় না। তাই এই আদর্শগুলোকে আমাদের পুরোপুরি বুঝতে হবে। আমার অভিজ্ঞতা এবং দাবি হলো, এই আদর্শগুলো পুরোপুরি বুঝলে এগুলো আসলে কতটা ঘৃণ্য এবং মূর্খতাপূর্ণ তা মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবধারিতভাবে তখন অনুধাবন করবেন সত্যিকারের নির্বোধ কারা।

প্রগতিবাদী ও আধুনিক মুসলিম 'সংস্কারক'

ফিকহের মাযহাবগুলোর মধ্যে পর্যালোচনা করলে দেখবেন কোনো মাযহাবের অবস্থান যদি এক বিষয়ে কঠিন হয়, তাহলে অন্য কোনো দিকে সেই মাযহাবের অবস্থান অন্য মাযহাবগুলোর তুলনায় সহজ হয়। যেমন, ওযুর শর্তের ক্ষেত্রে 'ক' মাযহাবের অবস্থান হয়তো 'খ' মাযহাবের তুলনায় কঠোর। কিন্তু সফরের ক্ষেত্রে 'খ' মাযহাবের তুলনায় 'ক' মাযহাবের অবস্থায় নমনীয়। কিন্তু আধুনিক সংস্কারবাদীদের অবস্থানের দিকে তাকালে দেখবেন তাদের সব মত একমুখী। সবক্ষেত্রে তারা ওই অবস্থানটাই গ্রহণ করে, যা আধুনিক পশ্চিমা, বুর্জোয়া ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি আর রুচির সাথে খাপ খায়। যেকোনো বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝবে যে এটা কোনো কাকতাল না। দৈবক্রমে এমন হচ্ছে না; বরং এটা হলো স্পষ্ট প্রমাণ যে এই সংস্কারবাদীদের কোনো নির্দিষ্ট উসুল বা মূলনীতি নেই। তারা ওই মতটাই গ্রহণ করে, যা ওই সময়ের কর্তৃত্বশালী সমাজ-সংস্কৃতির প্রথাপ্রচলনের সাথে মেলে। প্রথমে তারা উপসংহার ঠিক করে নেয়, তারপর এর পক্ষে দলীল-প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে বেছে বেছে ওই আয়াত বা হাদীসগুলো বের করে যেটাকে কোনো-না-কোনোভাবে নিজের উপসংহারের পক্ষে উপস্থাপন করা যাবে। পাশাপাশি পূর্ববর্তী আলিমদের বিভিন্ন দুর্লভ, বিচ্ছিন্ন মত তারা নিয়ে আসে।

এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমী জোচ্চুরির পরও তারা আশা করে যে মুসলিমরা তাদের গুরুত্বের সাথে নেবে!

'সংস্কার'-এর নামে ভণ্ডামি

আধুনিক সংস্কারবাদী মুসলিমরা অনেক সময় তাদের অবস্থানের পক্ষে ক্লাসিকাল আলিমদের কিছু দুর্লভ, বিচ্ছিন্ন মত নিয়ে আসে। এটা বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। তারা যেটা করে তা সেটাকে বলা হয় 'পোস্ট হক জাস্টিফিকেশান' (post hoc justification)। অর্থাৎ তারা আগেই ঠিক করে রেখেছে তারা কী অর্জন করতে চায়। পরে সেটার একটা ব্যাখ্যা তারা তৈরি করেছে। প্রথমে তারা উত্তর ঠিক করে। তারপর ইসলামী জ্ঞানের সমুদ্র সেচে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওইসব জিনিস খুঁজে আনে, যেটা তাদের উপসংহারকে সমর্থন করে। আবার অধিকাংশ সময় ক্লাসিকাল টেক্সট বুঝতেও তারা ভুল করে। অথবা আলিমদের বক্তব্যকে তারা প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপন করে।

এসব সংস্কারবাদীদের মুখোমুখি হলে, আমাদের তাদের প্রশ্ন করা দরকার।

নিজেদের অবস্থানের সমর্থনে তারা যখন বলে—অমুক মাযহাবে এমন একটা মত আছে।

তখন আমাদের বলা দরকার—হ্যাঁ, এমন মত থাকতে পারে। কিন্তু তুমি কেন খুঁজে খুঁজে এই দুর্লভ এবং বিচ্ছিন্ন মতগুলো বের করছ? তোমার উদ্দেশ্য কী? তুমি কি লিবারেল মতাদর্শের প্রসার চাইছ, যা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ?

এভাবে খেয়ালখুশি মতো আলিমদের বক্তব্য বিকৃত করার বদলে, লিবারেলিসমের অবস্থানগুলো নিয়ে চিন্তা করা যায় না? লিবারেলিসমের পূর্বধারণাগুলোকে ক্রিটিক করা যায় না?

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক হবার একটি দিক হলো, উম্মাহর অধিকাংশ আলিমগণের মতকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা (যদিও কিছু ক্ষেত্রে দলীলের ভিত্তিতে ব্যক্তি ভিন্নমত অনুসরণ করতে পারে)। কারণ, শুধু সম্ভাব্যতার দিক থেকেই বলা যায়, অধিকাংশ বিষয়ে উম্মাহর ইতিহাসের জুমহুর আলিমগণের অবস্থান সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কারও মূল উদ্দেশ্যই যদি হয় যেকোনো মূল্যে নিজের অবস্থানকে বৈধতা দেয়া, তাহলে সে ওইসব মতই খুঁজে খুঁজে বের করবে, যেগুলো তার পক্ষে যায়। সেগুলো যত দুর্বলই হোক না কেন।

ইসলামই কি মুসলিম-বিশ্বের পশ্চাৎপদতার কারণ?

বহুদিনের পুরোনো প্রশ্ন, 'মুসলিম-বিশ্ব পিছিয়ে আছে কেন?'

বহুদিনের মুখস্থ উত্তর—ইসলামের কারণে।

এমন উত্তর প্রাচ্যবিদ, পশ্চিমা ইসলামবিদ্বেষী কিংবা ওবামার মতো লোকের কাছ থেকে আসলে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো অনেক মুসলিমদের মধ্যেও এমন চিন্তাভাবনা কাজ করে। নিজের মুসলিম পরিচয়কে ঘৃণা করা আর হীনম্মন্যতায় ভোগা মুসলিমদের অনেকেই ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকে এ প্রশ্নের জবাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে সুর মিলিয়ে বলে আসছে–'ইসলামই হলো মূল সমস্যা। অগ্রগতির একমাত্র উপায় ইসলামকে বাদ দেয়া।'

তবে পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা এ কথাটা সরাসরি বলে না। একটু ঘুরিয়ে বলে। যেমন এদের কেউ কেউ বলে, 'ইসলামের সংস্কার দরকার', অথবা বলে, 'আমাদের উচিত পুরোনো ফিকহগুলোকে আবার খতিয়ে দেখা, শরীয়াহর ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন মতো নতুন নতুন ইজতিহাদ করা', অথবা তারা বলে 'আগেকার আলিমদের মধ্যে নারীবিদ্বেষী প্রবণতা ছিল'।

কথাটা সরাসরি না বলে, মুসলিম মর্ডানিস্টরা এভাবে ঘুরিয়ে বলে। এদের অনেকে সনাতন পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করেছে। পোশাক-আশাকের দিক থেকেও বাহ্যিকভাবে এদের অনেককে দেখে আলিম মনে হয়, যেমন জামালুদ্দিন আফগানী, মুহাম্মাদ আবদুহ, আলি জুমা কিংবা আব্দুল্লাহ বিন বায়্যাহ। সব মর্ডানিস্ট কিন্তু আদনান ইব্রাহিমের মতো সুট-টাই পরে না।

ইসলাম, আলিম এবং ইলমের প্রতি সাধারণ মুসলিমদের মনে থাকা গভীর শ্রদ্ধাবোধকে কাজে লাগিয়ে–ধর্মীয় পোশাক, শিক্ষা এবং শব্দ ব্যবহার করে–এ মর্ডানিস্টরা খুব সহজে মানুষকে প্রভাবিত করে ফেলে। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়রা শুরু থেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ধরনের আলিমদের ব্যবহার করে আসছে। আজও করছে।

এবার আসুন 'পিছিয়ে পড়ার' প্রশ্নটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

নিজেদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য মুসলিমরা যখন ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্যকে দায়ী করে, তখন কে আসলে লাভবান হয় বলুন তো?

কী? প্রশ্নটা বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলোর দিকে একটু তাকানো যাক।

ভেনেজুয়েলার মতো ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলো কেন পিছিয়ে আছে? নিউইয়র্ক টাইমসের লিবারেল বিশ্লেষকরা এ প্রশ্নের উত্তর দেয় এভাবে–

'মি. মাদুরোকে (ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট) ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে, এটা বেশ কিছুদিন ধরেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। ২০১৩-তে বামপন্থী একনায়ক হুগো শাভেজের স্থলাভিষিক্ত হবার পর থেকে তার অব্যবস্থাপনা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং তেলের মূল্য হ্রাস (যেটা ভেনেজুয়েলার আয়ের মূল উৎস) দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলছে। মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণে বেতনের টাকা পরিণত হয়েছে একটা অর্থহীন জিনিসে। লোকজন ক্ষুধা আর চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে আশপাশের দেশগুলোতে।'[১৫]

দেখুন, দেখুন! ভেনেজুয়েলার লোকগুলোর জন্য পশ্চিমা দেশগুলো কী দরদটাই-না দেখাচ্ছে। তারা কত চিন্তিত! ভেনেজুয়েলার লোকগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে! তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই! তারা মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে! আমাদের কিছু একটা করা দরকার! আমাদের উচিত ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা সমর্থন করা!! আমাদের হয়তো ভেনেজুয়েলা আক্রমণও করা উচিত! এই পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করার এটাই একমাত্র মানবিক উপায়!!

কিন্তু তারা যা বলে না তা হলো–এই ক্ষুধা, ওষুধের অভাব আর মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হলো বছরের পর বছর ধরে ভেনেজুয়েলার ওপর চলা অর্থনৈতিক অবরোধ। বছরের পর বছর ধরে একটা দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হলে, সেই দেশের মানুষ তো অর্থনৈতিক সংকটে পড়বেই, তাই না? আপনি প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধ দেবেন। তারপর সংকট দেখা দিলে নিজের অপছন্দের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সরকার পরিবর্তন কিংবা সামরিক অভিযানের কথা বলবেন। খুব মজা, তাই না?! দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের চক্রাকার যুক্তি ব্যবহার করে নিউ ইয়র্ক টাইমসসহ অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সামরিক অভিযান

---

[১৫] Venezuela: Between Maduro and a Hard Place, The New York Times, January 24, 2019

আর সরকার পরিবর্তনের পলিসি সমর্থন করে আসছে।

ভেনেজুয়েলা এ কূটকৌশলের একমাত্র শিকার না। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশকে এভাবে অ্যামেরিকান 'মানবতার' মাধ্যমে নতজানু করা হয়েছে। বিশ্বের এই তথাকথিত ত্রাণকর্তা(!) অ্যামেরিকা, পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে এভাবেই রক্ষা করছে! এটাই নাকি একমাত্র উপায়!

TruthDig এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী,

'নিউইয়র্ক টাইমসের আর্কাইভের এক জরিপে দেখা গেছে, ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে হওয়া অ্যামেরিকা সমর্থিত ১২টা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ১০টাকেই সমর্থন দিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদনা পরিষদ। যে দুটো অভ্যুত্থানকে তারা সমর্থন দেয়নি, তার একটি হলো ১৯৮৩ সালের গ্র্যানাডা আক্রমণ আর ২০০৯ সালের হন্ডুরাস অভ্যুত্থান। এ দুটি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল অস্পষ্ট কিংবা অনিচ্ছুক বিরোধিতার।

সিআইএ, মার্কিন সেনাবাহিনী আর এদের সাথে যুক্ত কর্পোরেশানগুলো ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলোকে কেন বারবার টার্গেট করছে জানেন? কারণ, এ দেশগুলো অ্যামেরিকান পুঁজিবাদ আর তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্যের জন্য হুমকি। এ কারণেই দেশগুলোতে বারবার সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে, দেশগুলো অগণতান্ত্রিক হবার কারণে না। তাই নিউইয়র্ক টাইমসের কিছু কিছু কথা সত্য হলেও, বাস্তবে যা হচ্ছে তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এগুলো থেকে পাওয়া যায় না।'[৯৬]

সংক্ষেপে এটাই অ্যামেরিকার কৌশল। এভাবেই তারা কাজ করে। নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাকে দিয়ে অ্যামেরিকার স্বার্থ পূরণ হবে? কারা অ্যামেরিকা এবং অ্যামেরিকান কর্পোরেশানগুলোর কাছে সস্তায় প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রি করবে?

অধিকাংশ দেশের সরকার সোৎসাহে এবং সাগ্রহে অ্যামেরিকাকে স্বাগত জানায়। তবে মাঝেমধ্যে কিছু-না-কিছু লোক উদিত হয়, যারা ঝামেলা করে। এই ঝামেলার সমাধান অ্যামেরিকা কীভাবে করে? নিষ্ঠুর, কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর অবরোধের মাধ্যমে। যার কারণে জীবন দিতে হয় বিপুলসংখ্যক মানুষকে। মনে আছে ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেছিল, অ্যামেরিকার চাপানো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ৫ লক্ষ ইরাকী শিশুর মৃত্যু 'দরকারি' ছিল?

[৯৬] Your Complete Guide to the N.Y. Times' Support of U.S.-Backed Coups in Latin America, Truthdig, January 29, 2019

একদিকে অ্যামেরিকার সরকার এসব করে বেড়ায়, অন্যদিকে অ্যামেরিকান মিডিয়া রিপোর্ট করে, 'দেখুন, এই দুস্থ লোকগুলো মারা যাচ্ছে! ক্ষুধার্ত এই শিশুদের জন্য আমাদের কিছু একটা করা উচিত!'

তবে অ্যামেরিকার বন্ধুভাবাপন্ন কোনো স্বৈরশাসকের দুঃশাসনের কারণে যখন জনদুর্ভোগ তৈরি হয়, তখন আর তাদের মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো পদক্ষেপও নিতে দেখা যায় না।

অতএব, এই পিছিয়ে পড়াদের তালিকায় মুসলিম-বিশ্ব একা না। উত্তর অ্যামেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের বাইরে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলই একই রকম অর্থনৈতিক দুর্দশার শিকার। তাহলে ইসলামের দিকেই কেন বারবার অভিযোগের আঙুল? কেন ইসলামিক ঐতিহ্য এবং সোনালি যুগের আলিমদের দোষারোপ করা? এটার কোনো অর্থ হয়?

আসলে কী ঘটছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। অ্যামেরিকা পুরো পৃথিবীকে জিম্মি করে রেখেছে। দেশগুলোর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। আর কিছুদিন এ অবস্থায় থাকার পর জিম্মি তার অপহরণকারীকে ভালোবাসতে শুরু করছে।

যখন দেখবেন মুসলিম-বিশ্ব পিছিয়ে পড়ার জন্য কেউ ইসলামকে দায়ী করছে, চোখে ওদের আঙুল দিয়ে তখন পিছিয়ে পড়া কাফির দেশগুলোর অবস্থা দেখিয়ে দেবেন। সেই দেশগুলোর কেন এ অবস্থা? তারা তো মুসলিম না, তারা তো ইসলাম মানে না।

পুরো পৃথিবীর মধ্যে শুধু অল্প কিছু পশ্চিমা দেশই কেন অনাহার আর দারিদ্র্য থেকে বেঁচে থাকার ফর্মুলা আবিষ্কার করল? এই ম্যাজিক ফর্মুলা শুধু পশ্চিম ইউরোপই কেন আবিষ্কার করতে পারল? বাকি পৃথিবী কেন পারল না? বিশ্বের বাকি ৯০% মানুষ কি অথর্ব? ইউরোপীয়দের কি এমন কোনো জাতিগত কিংবা বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যার বদৌলতে শুধু তারাই এটা পারল? আর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই কি এই সফলতা?

নাকি অন্য কিছু ঘটছে মিডিয়ার টেনে দেয়া পর্দার আড়ালে?

যৌনতা ও যিনা

পশ্চিমা বিশ্বের যৌন দুর্দশা

ষাটের দশকে পশ্চিমে ঘটা 'যৌন বিপ্লব' অনেকের জন্য অনেক আশা আর উৎসাহ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু একসময় উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে। সময়ের পরিক্রমায় এই আন্দোলনকে আজ ত্রুটিপূর্ণ, এমনকি কুৎসিত মনে হচ্ছে। যৌনতার লক্ষ্য, তাৎপর্য এবং যৌনতার মাধ্যমে প্রকৃত সন্তুষ্টির প্রশ্নগুলোর মোকাবিলা করতে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। বিপ্লব মানেই অগ্রগতি না।

এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া প্রতি চার জন পশ্চিমা নারীর মধ্যে কমপক্ষে এক জন যৌন হয়রানি কিংবা নির্যাতনের শিকার। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমা নারীদের প্রতি চার জনে এক জন জীবনের কোনো-না-কোনো সময় পারিবারিক সহিংসতার শিকার হবে। এ দুটো তথ্য যেন একে অপরের প্রতিবিম্ব। এ পরিসংখ্যানগুলো বাস্তবতার প্রতিফলন। পশ্চিমের মানুষ আজ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে তাদের এবং লিবারেল সেক্যুলার বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যার একটি হলো নারী ও কন্যাশিশুদের ব্যাপারে তাদের অসুস্থ চিন্তা।

বিউটি কনটেস্টের নামে ৫ বছর বয়সেই কন্যাশিশুদের নামিয়ে দেয়া হচ্ছে শরীর দেখানোর নোংরা প্রতিযোগিতায়। অন্যদিকে, যুবতীরা কেন হাত-পা ছড়িয়ে, চোখ বন্ধ করে উদ্যম যৌনতায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, তা নিয়ে সমালোচনায় মুখর 'sex-positive' নারীবাদীরা। আর পশ্চিমা নারী যদি কোনোভাবে এসবের কবল থেকে বেঁচেও যায় তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করছে পারিবারিক নির্যাতন, যৌন সহিংসতা, আর তা না হলে একাকিত্ব আর ডিপ্রেশনে ভরা এক বিবর্ণ জীবন।

নারী নির্যাতন রোধে কর্মক্ষেত্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষদের জন্য বিস্তারিত গাইড বানানো হচ্ছে, যাতে তারা যথাযথ আচরণ শিখতে পারে। সেই সাথে গাইড বানিয়ে তাদের শেখানো হচ্ছে–পুরুষত্ব বিষাক্ত। পুরুষমাত্রই সম্ভাব্য ধর্ষক।

যৌনতা যখন পণ্য

যৌনতা আজ একটা পণ্য। লিবারেলিসম চরমভাবে যৌনায়িত এক সংস্কৃতি তৈরি করেছে। যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ, আর নারীদেহের পর্নোগ্রাফিক ছবিতে ভরপুর বিজ্ঞাপনের মিশেলে যৌনতার এই পণ্য তৈরি হচ্ছে নিউইয়র্ক, লন্ডন কিংবা অ্যামস্টারডামের মতো জায়গাগুলোতে। যৌনায়িত পরিবেশ ভোঁতা করে ফেলেছে মানুষের অনুভূতি আর সংবেদনশীলতাকে। এমন এক বিপজ্জনক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যেখানে নেশাখোরের মতো প্রতিনিয়ত আরও তীব্র উত্তেজনার খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ। যত দিন যাচ্ছে, একই মাত্রার উত্তেজনা আর সন্তুষ্টির জন্য ততই মানুষকে খুঁজতে হচ্ছে আরও চরম যৌনতা এবং বিকৃতির। দেখা দিয়েছে পশুকাম থেকে শুরু করে শিশুকামের মতো নানান যৌন বিকৃতি। সামাজিক ন্যায়বিচার আর অধিকার আদায়ের অজুহাতে প্রত্যেক বিকৃতিকে গ্রহণযোগ্য আর প্রশংসনীয় করে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গ্রুপ আর সামাজিক আন্দোলন।

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেই যৌনতা আজ একটা প্যারাডক্স। মানুষ এমনভাবে জীবন কাটায় যেন যৌনতাই সব। কিন্তু একইসাথে সাময়িক উত্তেজনার বাইরে যৌন সম্পর্কের আর কোনো অর্থ কিংবা তাৎপর্য তাদের জীবনে নেই। যৌনতা একইসাথে সবকিছু, আবার একেবারেই অর্থহীন।

একদিকে স্কুলের রাগবি টিমের খেলোয়াড় থেকে শুরু করে আপাত শ্রদ্ধাভাজন সংসদ সদস্যরা কিশোরী তরুণীদের কাছে অযাচিতভাবে নিজেদের যৌনাঙ্গের ছবি পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে কিশোরীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে ইন্সটাগ্রাম, কিংবা স্ন্যাপচ্যাটে শরীর প্রদর্শনে। নিজেদের 'অ্যাসেট' দেখাতে, কিংবা ইনবক্সে 'নুডস' পাঠাতে। সোশ্যাল মিডিয়া এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে মানুষ একইসাথে আত্মমুগ্ধ আবার অন্যের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য বেপরোয়া।

নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

পশ্চিমের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় নারীর আলোচনা প্রায় সব সময় উপস্থিত। পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ব, প্রগতি এবং অনন্যতার যে মিথগুলো আছে, সেগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য 'স্বাধীন পশ্চিমা নারী'র গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এদেশগুলোর অনেকগুলোতে জনপরিসরে অংশ নিতে হলে নারীকে কার্যত তার জরায়ুকে ত্যাজ্য করতে হয়। কারণ, মাতৃত্ব আর 'তুচ্ছ গৃহিণী'-র জীবনে নারী সন্তুষ্ট হয়ে গেলে সেটা প্রগতিশীলতা আর নারীবাদের ওই প্যারাডক্সকে প্রকাশ করে দেবে, যা পশ্চিমা বিশ্ব আজও অস্বীকার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে—হয়তো পশ্চিমা নারীর পক্ষে ঘরে-বাইরের সবকিছু একসাথে পাওয়া সম্ভব না।

মাতৃত্ব-কে ওখানে দেখা হয় অস্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে। অনেকে বলে লম্বা মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে প্রফিট কমে। মা-কে সম্মান করা হয় যখন দেখানোর মতো কোনো কর্পোরেট কৃতিত্ব তার থাকে। যেমন 'অমুক কোম্পানির সিনিয়র ভাইসপ্রেসিডেন্ট এবং সফল মা', অথবা 'অমুক কোম্পানির উদীয়মান ম্যানেজার এবং সফল মা'। এই বৈপরীত্যগুলো তৈরি করে এক অসহনীয় টেনশান। নারীত্বের কোনো পথ কিংবা প্রকাশভঙ্গি আর টিকে থাকে না। একসময় পরিবারকে মনে করা হতো ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও সহায়তার উৎস। কিন্তু এখন পরিবারকে দেখা হয় বোঝা হিসেবে। এমন বোঝা, যা থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে।

এ সবকিছুর ফলে তৈরি হওয়া যৌন এবং মনস্তাত্ত্বিক দুর্দশা অনেক সময় অস্বাভাবিকতা কিংবা উন্মাদনায় গিয়ে শেষ হয়। মানুষ পারিবারিক ভালোবাসা চায়। কিন্তু সেই ভালোবাসা পাওয়ার রাস্তাগুলো–বিয়ে, সন্তান, পারিবারিক স্থিতিশীলতা–আজ বন্ধ। পশ্চিমের অর্ধেকের বেশি শিশু জন্ম নেয় ডিভোর্সী, অবিবাহিত কিংবা সেপারেটেড মায়ের গর্ভে। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার। ভাঙা পরিবার আর অপরাধের হারের মধ্যে সম্পর্ক অনস্বীকার্য। পশ্চিমা দেশগুলোতে যে খুন এবং সহিংস অপরাধের মাত্রা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ, হয়তো এটা তার অন্যতম কারণ। হাতেগোনা যে ক'জন বিয়ে করে, তাদের পরিবারের ওপর অশরীরী প্রেতাত্মার মতো ঘুরতে থাকে পরকীয়ার ছায়া। ব্যভিচারেরও বাণিজ্যিকীকরণ করেছে পশ্চিম। অ্যাশলিম্যাডিসন এর মতো সাইটগুলো তাদের কোটি কোটি নিবন্ধিত সদস্যদের সাহায্য করছে ব্যভিচারের সঙ্গী বাছাই করতে।

কিছু কিছু পশ্চিমা দেশে নারীত্ব যেন প্রহসন। কসমেটিক আর পারফিউম বাবদ প্রতিবছর পশ্চিমা নারীর খরচ ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। কসমেটিক সার্জারি বাবদ খরচ হয় আরও ১২ বিলিয়ন ডলারের মতো। অথচ মাত্র ২২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে পুরো পৃথিবীর সব গরিব মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব! কর্পোরেশানগুলোর বেঁধে দেয়া সৌন্দর্য আর ফ্যাশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কসমেটিক আর কসমেটিক সার্জারির পেছনে টাকার পাহাড় খরচ করা হয়। পশ্চিমা নারীর নিজেকে যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করার বেপরোয়া প্রয়োজনকে ব্যবহার করে প্রফিট করে কর্পোরেশানগুলো।

যৌন আবেদনময়ী হবার এই অতৃপ্ত তাড়না তৈরি হয়, কারণ সমাজ আর সংস্কৃতি নারীকে তার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে শেখায়। নিজের শরীর আর চেহারা নিয়ে হীনম্মন্যতার কারণে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ নারী ইটিং ডিসঅর্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধিতে ভোগে। এদের অনেকের সমস্যা শুরু মাত্র ১১ বছর বয়স থেকে!

দুঃখজনভাবে, অপরের মন কাড়ার জন্য আক্ষরিকভাবে উপোস করা এই নারীরা, পশ্চিমা পুরুষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সেই মনোযোগ পায় না। পুরুষত্বের সংকটে ভোগা পশ্চিমা পুরুষকে রক্তমাংসের, অ-নিখুঁত নারী আকর্ষণ করে না। ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফির অসীম স্রোতে গা ভাসানো এই পুরুষ তার সংবেদনশীলতা হারিয়ে অবশ হয়ে গেছে বহু আগেই। নিরন্তর মনোযোগের ঘাটতি আর অস্থিরতায় ভোগা এই পুরুষের দিন কাটে পর্ন দেখে, হস্তমৈথুন করে, ভিডিও গেইম খেলে অথবা আত্মহত্যা করে। কিছু কিছু পশ্চিমা দেশে ২০-৪৯ বছর বয়েসি পুরুষদের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হলো আত্মহত্যা।

কল্পজগৎ নাকি বাস্তবতা?

এই অসহনীয় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অনেকে হারিয়ে যেতে চায় কল্পজগতে। ফ্যান্টাসির জগৎকে তারা বাস্তবে খুঁজে বেড়ায়। কেউ হলিউডের রোমান্টিক সিনেমা কিংবা ডিসনি কার্টুনে দেখা নিখুঁত সৌলমেইট আর 'ট্রু-লাভ' খুঁজে বেড়ায়। আবার কেউ গা ভাসিয়ে দেয় শর্তহীন বহুগামিতায়। বাস্তবতা যেন কোনো পর্নোগ্রাফিক সিনেমার সেট। কোনো সম্পর্ক, শর্ত, পরিণতি নেই–যে যত পারে তত মানুষের সাথে বিছানায় যাবে।

পশ্চিমা মিডিয়া মুন্সিয়ানার সাথে এই বাস্তবতা তুলে ধরে। মাইলি সাইরাসের মতো একসময়কার শিশু তারকাদের চরম কুৎসিতভাবে যৌনায়িত করে উপস্থাপন করা হয়। ছোট মেয়ে আর কিশোরীদের যৌনকরণকে দেখা হয় নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে। তারা নিজেদের 'যৌন স্বাধীনতা' প্রকাশ করে পর্ন তারকাদের মতো পোশাক আর আচরণে। বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছানোর আগেই তাদের শরীর আর যৌনতার প্রতিশ্রুতিকে নিলামে তোলা হয়।

পশ্চিমা নারী সরলমনে বিশ্বাস করে যে তার পোশাক তার মুক্তি আর স্বাধীনতার প্রতিফলন। কিন্তু দেখা যায়, অল্প কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য ছাড়া তাদের অধিকাংশ একইরকম পোশাক পরে।

পশ্চিমে সেক্স থেরাপিস্টদের সংখ্যা অগণিত। গোগ্রাসে তাদের 'পরামর্শ' গেলা হয়, তা যতই সাংঘর্ষিক, বিচিত্র, কিংবা বিকৃত হোক না কেন। শরীর, ভালোবাসা আর যৌনতা নিয়ে আলোচনার একচেটিয়া কর্তৃত্ব এই আত্মস্বীকৃত 'সেক্সগুরু'দের। তাদের বাতলে দেয়া বিভিন্ন 'টিপস' ইন্টারেনেট, টিভি এবং গসিপ ম্যাগাযিনের কল্যাণে দানবীয় রূপ ধারণ করে। তৈরি হয় একধরনের পর্নো-মনস্তত্ত্ব।

সর্বত্র বিরাজমান যৌনতা

যৌনতা এখানে সর্বত্র বিরাজমান। বিশেষ করে স্কুলগুলোতে। বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি আসলেই সহজপ্রাপ্য কোনো শরীরের ওম খুঁজে বের করতে হবে। যৌন 'অভিজ্ঞতা অর্জন' আবশ্যিক। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পৌঁছে যাবার পর যৌনতা থেকে বিরত থাকা অনেকটা সামাজিকভাবে অচ্ছুত হবার মতো। পারিপার্শ্বিক চাপ, মিডিয়ার প্রচার করা অন্তহীন যৌনতা আর যৌনায়িত সমাজের মিশেলে এক বিপজ্জনক মিশ্রণ তৈরি হয়। মেয়ে ক্লাসমেটকে গণধর্ষণ করেছে প্রাথমিক স্কুলের ছেলেরা, অনেক পশ্চিমা শহরে এমন ঘটনা দেখা যায়। আর এর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু ছোট্ট মেয়েদের দুশ্চিন্তা শুধু ক্লাসমেটদের নিয়ে না। সহিংস যৌন অপরাধীদের বিস্ময়কর রকমের হালকা শাস্তি দেয়া হয় পশ্চিমে। অপরাধ প্রমাণিত হবার পরও তুলনামূলক অল্প সময় জেলে কাটিয়ে 'পুনর্বাসিত' হয়ে তারা সমাজে ফিরে আসতে পারে। পশ্চিমের কিছু দেশে একই যৌন নির্যাতন প্রাপ্তবয়স্কের ওপর করলে যে শাস্তি, শিশুর ওপর করলে শাস্তি তার চেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ হওয়া ১০ দেশের লিস্টে ইন্ডিয়া আর জিম্বাবুয়ে ছাড়া বাকি নামগুলো পশ্চিমা দেশের।

শুধু যে অন্ধকার গলিতে ঘুরে বেড়ানো অপরাধীরা শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে, তা না। শিশু পর্নোগ্রাফি এবং যৌন দাসত্বের প্রযোজক, পরিবেশক এবং গ্রাহকের খাতায় নাম আছে বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা থেকে শুরু করে বিলিয়েনেয়ার হেজ-ফান্ড ম্যানেজার এবং অন্যান্য সেলিব্রিটিদের। এমনকি হার্ভাড ল স্কুলের অ্যালান ডারশোউইটযের মতো প্রভাবশালী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে শিশুকাম এবং সেক্স ট্রাফিকিংয়ের। নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা পশ্চিমের ধনী আর বিখ্যাতদের জন্য যেন অসম্ভব। যারা সফল হতে পারে, বিখ্যাত হতে পারে, ধনী আর ক্ষমতাবান হতে পারে, শিশু ধর্ষণের 'অতিপ্রাকৃত উত্তেজনা' তাদের জন্য বরাদ্দ।

এই অবিশ্বাস্য হৃদয়-বিদারক দুর্দশা সত্ত্বেও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের যৌন বিপ্লব বাকি পৃথিবীতে রপ্তানি করতে চায়। এটাকে পবিত্র কর্তব্য মনে করে। সামরিক দখলদারিত্ব আর এনজিও-র মাধ্যমে সুশীল সমাজ তৈরি করে, 'উন্নয়নশীল' বিশ্বের নারীদের তারা মুক্ত করতে চায়। তাদের শেখাতে চায় যৌনতার পশ্চিমা তরিকা।

দীর্ঘদিন ধরে যেটাকে দূরের কোনো জগতের দৃশ্য মনে হচ্ছিল, আজ সেটাকে মনে হচ্ছে বিশ্বজুড়ে চলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত। ভৌগোলিক দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতার কারণে গতকাল যা নিয়ে চিন্তা করা অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল, গ্লোবালাইযেইশানের কল্যাণে আজ সেটা পরিণত হয়েছে প্রত্যক্ষ হুমকিতে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট আর ধর্ষণের শিকার হওয়া বাকি পৃথিবীর মানুষ আজ ভয় আর দুশ্চিন্তার সাথে

আবিষ্কার করছে, পশ্চিমা বিশ্বের যৌনতা অসুস্থ। আর এই ব্যাধি অনেক দিন ধরেই সংক্রমিত করে চলেছে বাকি বিশ্বকে।

নিরাপদ যৌনতা = বিয়ে

আস্তিক হোন কিংবা নাস্তিক, বিয়ের বাইরে নিরাপদ যৌনতা বলে যে কিছু নেই, এ কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। যার সাথে শুচ্ছেন সে যদি আপনার স্বামী বা স্ত্রী না হন, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দুর্ঘটনাবশত যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতে হবে তার করুণার ওপর। নতুন কোনো জীবনের কথা বলুন, মারাত্মক যৌনতাবাহিত অসুখের কথা বলুন কিংবা শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের কথা বলুন—আক্ষরিকভাবেই এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

একসময় এটা ছিল কমন সেন্সের বিষয়। সবাই জানত, মানত। কিন্তু আজ এ কথা বললে আপনি হয়ে যাবেন ধর্মীয় মৌলবাদী—যে মানবাধিকার, যৌন স্বাধীনতা বোঝে না।

এই কথাটা বোঝা কি এতই কঠিন? মানুষ আসলে কতটা অন্ধ হতে পারে?

মুসলিম হিসেবে আমরা যিনা থেকে বিরত থাকি, কারণ এটা আল্লাহর আদেশ। তবে একইসাথে চারপাশের এই এলেমেলো বাস্তবতা থেকেও এই সত্যের উপকারিতা এবং এর পেছনের প্রজ্ঞাকে আমরা চিনতে পারি।

ভিকটিমবিহীন অপরাধ?

মানুষ অনেক সময় মজা করে বলে–গাড়ি চালাতে লাইসেন্স লাগে, কিন্তু সন্তানের অভিভাবক হতে লাইসেন্স লাগে না, এটা কেমন কথা?

হালকা চালে বলা হলেও কথাটার পেছনে যুক্তি আছে। ভেবে দেখুন, স্কুলে পড়ানো, ডাক্তার কিংবা আইনজীবী হওয়া, এমনকি মেকানিক হতে হলেও সার্টিফিকেট লাগে। এগুলোর তুলনায় একটা শিশুকে লালনপালন করা অনেক বেশি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এটার জন্য কোনো সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা প্রশিক্ষণ নেই কেন?

শিশুরা সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, চরিত্র আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। যেসব শিশু উপযুক্ত অভিভাবকত্ব পায় না, তাদের বেকারত্ব, মাদক এবং অপরাধে জড়ানোর আশঙ্কা বেশি থাকে। সমাজের কর্মক্ষম সদস্য এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হবার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে সাধারণের চেয়ে বেশি।

কাজেই শিশুর সঠিক পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা যেন যোগ্য অভিভাবক এবং যথাযথ পরিচর্যা পায় তা নিশ্চিত করার কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে থাকা উচিত। অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা যেন শিশুদের ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য করে যা ইচ্ছে তা-ই করতে না পারে, তাদের সন্তানেরা যেন সমাজের বোঝায় পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করা কি সামাজিক দায়িত্ব না?

এ ধরনের একটা লাইসেন্সের বিধান ইসলামে আছে–নিকাহ। যথাযথভাবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ পালন করে বাস্তবায়ন করা হলে নিকাহ একটি স্থিতিশীল পরিবারের নিশ্চয়তা দেয়, যেখানে পিতা ও মাতা সন্তানের লালনপালন করবে। আর তাদের সমর্থন দেয়ার জন্য থাকবে বৃহত্তর পরিবার এবং সার্বিক সমাজ। অথচ দশকের পর দশক ধরে লিবারেল এবং মডার্নিস্টরা ইসলামী মূল্যবোধের ওপর নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাদের মতে বিবাহ-পূর্ব যৌনতাকে নিষিদ্ধ করে ইসলাম যৌন স্বাধীনতার গলা চেপে ধরেছে। অথচ বাস্তবতা হলো যিনার নিষেধাজ্ঞার বিধান মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। কারণ, এই নিষেধাজ্ঞা ডিভোর্সি, অবিবাহিত নারী এবং সন্তান পালনের

অনুপযুক্ত নারী-পুরুষের সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখে। এতে করে শিশুর এবং সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। বিষয়টা এতই স্পষ্ট যে বিবাহ-পূর্ব যৌনতা নিষিদ্ধের যৌক্তিকতা বোঝার জন্য ধার্মিক হওয়াও জরুরি না। সব ধরনের সমাজ-বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই বিধানকে সমর্থন করে।

কাজেই বিবাহ-পূর্ব যৌনতায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এটা একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। বিবাহ-পূর্ব যৌনতাকে ভিকটিমহীন অপরাধ বলা যায় না।[১৭]

যিনা একটা বড় ধরনের অপরাধ। আধুনিক রাষ্ট্র এই অপরাধের লাগামহীন বৈধতা দিয়েছে। ফলে অপরাধের হার বেড়েছে। একইসাথে বেড়েছে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা। যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার আরেকটা দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল হলো, রাষ্ট্রের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা বাড়া। আর রাষ্ট্রের ওপর জনগণের নির্ভরতা যত বাড়ে ততই জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা। এতে দিনশেষে লাভ হয় রাষ্ট্র, ক্ষমতাসীন আর কর্পোরেশনগুলোর। এ কারণেই হাজার হাজার বছর ধরে যৌনতার ব্যাপারে চলে আসা অনুশাসন ও মূল্যবোধ নিয়ে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই।

যৌনতার ব্যাপার ইসলামী মূল্যবোধ কেন যৌক্তিক এবং সেক্যুলার লিবারেল অবস্থানের চেয়ে নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠতর তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। ডেইটিং কিংবা যিনার ব্যাপার ধর্মীয় যুক্তি কারও মনঃপূত না হলে, এই যৌক্তিক প্রমাণগুলো এই বিধানগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট।

---

[১৭] অবধারিতভাবে এখানে কেউ-না-কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা তুলবে—যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে গর্ভধারণই না হয়, তাহলে এখানে ভিকটিম কে?

এ প্রশ্নের জবাব দুইভাবে দেয়া যায়।

১। আমরা লাইসেন্সের কথা বলছিলাম। অন্যান্য লাইসেন্স এবং সার্টিফিকেটের সাথে বিষয়টার তুলনা করা যায়। অনেক বছর ধরে বিমানগুলোতে অটো-পাইলট সুবিধা আছে। কিন্তু তার মানে এই না যে বিমান চালাতে হলে পাইলটদের লাইসেন্স লাগবে না।

২। জন্মনিয়ন্ত্রণ আর যৌন শিক্ষা যদি অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ প্রতিরোধে সফল হতো, তাহলে গত ৫০ বছরে এমন গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতের হার কমার কথা। কিন্তু হয়েছে উল্টোটা। গত পঞ্চাশ বছরের প্রতি দশকে সিঙ্গেল মাদার-দের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে অ্যামেরিকার প্রায় অর্ধেক শিশু শুধু মায়ের কাছে বড় হচ্ছে। আর সব ধরনের পরিসংখ্যান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে এভাবে বড় হওয়া শিশুরা সুস্থ পরিবারে বড় হওয়া শিশুদের তুলনায় অনেক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে।

'যৌন শিক্ষা'র উদ্দেশ্য

যৌন শিক্ষা ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বয়স দিন দিন কমছে। আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন যৌন শিক্ষা শুরু হতো ক্লাস টেন থেকে। এখন শুরু হয় হাইস্কুল থেকে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলেও। শিশুর মানসিকতা এবং গঠনের ওপর এ ধরনের ক্লাসের প্রভাব কেমন হতে পারে? বৃহত্তর সমাজের ওপর এর কেমন প্রভাব পড়তে পারে?

মুসলিম সংস্কৃতিতে বয়ঃসন্ধির আগে বাবা-মা সন্তানের সাথে যৌনতার ব্যাপারে কথা বলে না। আর যখন বলে তখনো সেটা বলা হয় ইঙ্গিতে। কারণ, মানুষের কৌতূহলের ক্ষমতা অনেক। শিশুকে যখন এ ব্যাপারগুলো নিয়ে বলা হবে তখন সে কৌতূহলী হবে। তার নিজে নিজে অনুসন্ধানের সম্ভাবনা বাড়বে। আর আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের যতই 'সেক্স পসিটিভ' হবার কথা বলুক না কেন, এর ফলাফল নেতিবাচক।

যৌন শিক্ষা ক্লাসে কী পড়ানো হচ্ছে, তাও খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলের শিশুদের এখন সমকামিতা, সেক্সুয়াল ফ্লুয়িডিটি, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, জেন্ডার আইডেন্টিটির মতো বিষয়গুলো শেখানো হচ্ছে। শিশুদের প্রশ্ন করা হচ্ছে, তুমি ছেলেদের পছন্দ করো নাকি মেয়েদের? নাকি ছেলে-মেয়ে দুটোকেই? নাকি কোনোটাকেই না? তুমি কি নিজেকে ছেলে মনে করো নাকি মেয়ে? নাকি কোনোটাই না?

শিশুদের ওপর এবং আমাদের ভবিষ্যতের ওপর এ ধরনের শিক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনার প্রভাব কেমন হবে তা বোঝার জন্য জ্যোতিষী হতে হয় না।

তবে সবচেয়ে বিচিত্র জিনিস হলো যৌন শিক্ষার পেছনের লিবারেল দর্শন। লিবারেল দর্শন অনুযায়ী–

> যৌনতা আমাদের জীবনের একটা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক অংশ। তাই শিশুরা যৌনতা নিয়ে জানবে এটাই স্বাভাবিক। মানবদেহ নিয়ে জানতে লজ্জার কী আছে? শিশুদের এসব না জানানোর কারণ কী? তারা তো এমনিতেই টিভি থেকে কোনো-না-কোনো সময় এগুলো জানবে।

কথাগুলোর সাথে ইবলিসের কথাবার্তার মিল আছে। আদম আর হাওয়া (আলাইহিমুস সালাম)-কে প্রতারিত করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়েছিল ইবলিস। এই ফল খাবার

পর তাঁদের লজ্জাস্থান তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

শিশুরা কথা বলতে শেখামাত্র তাদের যৌনতা শেখানো—একে ইতিবাচক, স্বাস্থ্যকর, প্রগতিশীল কিছু একটা হিসেবে উপস্থাপন করার এই পুরো ব্যাপারটা ইবলিসের বেশ পছন্দ হবার কথা।

বাস্তবতা হলো যৌনতা মূলত লজ্জাজনক। এটা শুধু তখনই ইতিবাচক, স্বাস্থ্যকর এবং গ্রহণযোগ্য যখন এটা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সংঘটিত হয়। কিন্তু শিশুদের শেখানো হচ্ছে উল্টোটা। সমাজে যে ধর্মকে অপ্রাসঙ্গিক এবং সেকেলে মনে করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কাউকে যদি স্কুলে শেখানো হয়, যৌনতা সব সময় স্বাস্থ্যকর, তাহলে যে জিনিস যৌনতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা নিঃসন্দেহে অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং খারাপ বলেই মনে হবে।

ইখতিলাত

নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান নিয়ে আপাতভাবে দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিমদেরও অভিযোগ-অনুযোগ করতে দেখা দুঃখজনক। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অর্থাৎ ইখতিলাত থেকে বিরত থাকা ইসলামের প্রাথমিক একটি শিক্ষা। নারী ও পুরুষের মেলামেশা থেকে শুরু হয় ফ্লার্ট করা। ফ্লার্ট করা থেকে ব্যাপারটা গড়ায় একে অপরকে স্পর্শ করার দিকে। আর তারপর ব্যাপারটা যায় যিনায়। যিনা বিয়ে আর পরিবারকে ধ্বংস করে। আর পরিবারের ধ্বংস মানবতার পতন ডেকে আনে।

এটা কি অতিরঞ্জন? আমি কি বাড়িয়ে বলছি? একেবারেই না। যার চোখ আছে, বোধবুদ্ধি আছে, যে নিজের সাথে সৎ–সে জানে যে নারী-পুরুষের মেলামেশা শুধু এসব পরিণতি ডেকে আনে না; বরং মানুষকে এর চেয়েও খারাপ এক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়–জাহান্নাম।

লিবারেল-ফেমিনিস্টরা এসব কথা মানবে না, আমি জানি। কিন্তু আজ এমন অনেক লোক আছে, যারা বাহ্যিকভাবে আলিমের পোশাক পরলেও ভেতরে ভেতরে লিবারেল-ফেমিনিস্টদের মতো ধ্যানধারণা পোষণ করে। পাবলিক স্পেইসে নারী ও পুরুষের পৃথক অবস্থানের যে ইসলামী বিধান, তারা সেটার বিরোধিতা করে। এমন-সব নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে, যেগুলো তাদের অজ্ঞতা এবং চিন্তার সংকীর্ণতা প্রকাশ করে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিণতির ব্যাপারে আমার বক্তব্য নিয়ে যদি আপত্তি থাকে তাহলে দয়া করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

- বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নামে নারী-পুরুষের যে ধরনের অবাধ মেলামেশা আজ আমরা মুসলিম এবং অমুসলিম সমাজে দেখি, সেখানে কি ফ্লার্ট করা হয় নাকি হয় না?
- এ ধরনের মেলামেশা কি মানুষকে বিপরীত লিঙ্গের দিকে তাকানো এবং স্পর্শ করার মতো হারামের দিকে নিয়ে যায় না?
- সমাজে যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেলে বিয়ে কি কঠিন হয়ে যায় না?

- যিনা কি বিয়েকে ধ্বংস করে না?
- পশ্চিমা বিশ্বে ৫০% শিশুর জন্ম হয় ডিভোর্সী, অবিবাহিত কিংবা সেপারেটেড মায়ের গর্ভে। এ ধরনের শিশুদের বেকারত্ব, ডিপ্রেশনে ভোগা, অপরাধ কিংবা মাদকে জড়ানোর হার অনেক বেশি। এগুলোর জন্য কি যিনার ব্যাপক প্রচলন দায়ী না?
- ৫০% এর দম্পতির ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। ২৫% এর বেশি বিবাহিত পুরুষ, এবং ১৫% নারী পরকীয়া করার কথা স্বীকার করছে। অ্যাশলিম্যাডিসন এর মতো সাইটগুলো কোটি কোটি নিবন্ধিত সদস্যদের ব্যভিচারের সঙ্গী বেছে নিতে সাহায্য করছে। বিয়ে আর পরিবার কি পশ্চিমা সমাজে আজ ধ্বংসের মুখোমুখি না?

এত কিছু জানার পরও একজন মুসলিম কীভাবে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য না। আমরা জানি কিয়ামতের একটি লক্ষণ হলো যিনা বেড়ে যাওয়া। কিয়ামতের আগে রাস্তায় প্রকাশ্যে যিনা করা হবে। আজ আমরা চারপাশে কী দেখছি? তারপরও কীভাবে মুসলিম হিসেবে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? আধুনিক সমাজে যিনার এই বৃদ্ধির জন্য কি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা দায়ী না? যদি আপনি মনে করেন অবাধ মেলামেশার কোনো ভূমিকা এখানে নেই তাহলে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন, কেন আমরা এমন অবস্থা দেখছি?

এ বাস্তবতাগুলোকে উপেক্ষা করে অনেকে কেবল বলে, 'মুসলিমদের তাকওয়া থাকা দরকার।' দেখুন, নারী-পুরুষের মেলামেশার সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং সীমারেখা শরীয়াহতে ঠিক করা আছে। এই সীমারেখাগুলো মেনে চলাই হলো তাকওয়ার দাবি। তাকওয়ার কথা বলে এগুলো উঠিয়ে দেয়ার কথা কীভাবে বলা যায়? আপনার যত তাকওয়াই থাক না কেন, বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে একাকী অবস্থান করা হারাম। এটা নারী ও পুরুষ, উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। শুধু মজা করা, কিংবা সোশ্যালাইযিং এর জন্য বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে মেলামেশা করা জায়েজ না। নারীপুরুষের যে ধরনের মেলামেশাকে পশ্চিমা লিবারেল সমাজে স্বাভাবিক মনে করা হয় সেটা ইসলামে জায়েজ না।

মসজিদে নারী ও পুরুষের সালাত আদায়ের জায়গার মধ্যে পার্টিশন থাকা নিয়েও অনেকে আপত্তি তোলে। তারা জানে পার্টিশানকে হারাম বা বিদআত বলা সম্ভব না। তাই তারা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মাসজিদে নববীতে নারী ও পুরুষের সালাতের স্থানের মধ্যে কোনো পার্টিশান ছিল না। এটা তারা খুব জোর দিয়ে বলে। কিন্তু সাহাবিয়্যাতদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না) পোশাক কেমন ছিল, মসজিদে যাবার সময় তাঁরা কীভাবে যেতেন, মসজিদে কোথায় কীভাবে দাঁড়াতেন, কোন কোন

ক্ষেত্রে তাঁদের মাসজিদে যেতে মানা করা হয়েছিল–সেই হাদীসগুলো নিয়ে তারা কথা বলে না। সেগুলো তারা এড়িয়ে যায়।

নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হবার শর'ঈ বিধান নিয়ে মুসলিমদের হীনম্মন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই। নারী-পুরুষের মেলামেশাকে সীমিত করা শুধু তাকওয়া এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সচেতন হবার চিহ্ন না; বরং সভ্য এবং পরিশীলিত হবার বৈশিষ্ট্য হলো অবিবাহিত নারী ও পুরুষ অবাধে একে অপরের সাথে মেলামেশা করবে না। ফ্লার্ট করবে না, পশুর মতো একে অপরের সাথে গড়াগড়ি করবে না।

বি.দ্র.–ইমাম আল-গাযযালি বলেছেন–

'অন্তরের প্রথম ভাবনাকে দূর না করলে কামনা তৈরি হবে। কামনা থেকে তৈরি হবে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা থেকে নিয়্যাত আর নিয়ত থেকে কাজ। আর সেই কাজ বান্দাকে ধ্বংস করবে, আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করবে। তাই মন্দকে শেকড়েই কেটে ফেলতে হবে। যখন অন্তরে ভাবনা আসবে, তখনই থামিয়ে দিতে হবে। কারণ, বাকি সবকিছুর উৎপত্তি এই ভাবনা থেকেই'।[১৮]

---

[১৮] ইহইয়া উলুমুদ্দীন, ৬/১৭

Sex sells...

আজকের মিডিয়া যৌনতাকেন্দ্রিক কেন?

কারণ, যৌনতার মার্কেট আছে। জনগণ যৌনতা চায়। তারা যৌনতা দেখতে চায়, ভোগ করতে চায়। চাহিদা আছে, তাই ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেই চাহিদার যোগান দিচ্ছে। ব্যস। তবে জনগণের মধ্যে এ চাহিদা তৈরি করছে এই একই ইন্ডাস্ট্রিগুলো। মানুষের মাথার ভেতরে তারা ক্রমাগত বিষ ঢোকাচ্ছে। একসময় মানুষ বিষে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

ঠিক একই কারণে আজ পৃথিবীজুড়ে মাদকাসক্তি বাড়ছে। কোনো স্বাভাবিক মানুষ বুকের ভেতরে ধোঁয়া ঢোকাতে চায় না। কোনো স্বাভাবিক মানুষ ঘুম থেকে উঠে নিজের শিরার মধ্যে বিষাক্ত কেমিক্যাল প্রবেশ করাতে চায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ ভাত, ফল-সবজি পচানো, কড়া গন্ধের, গা গোলানো তরল গিলতে চায় না। এগুলোর চাহিদা তৈরি করতে হয়। মানুষের মধ্যে এসব চাহিদা তৈরির জন্য এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে। বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কারিগরির মাধ্যমে মানুষকে ভাবতে শেখায় যে চাহিদাগুলো সহজাতভাবে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে, আর তাই এগুলো পূরণ করতে হবে।

মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার আর প্রাকৃতিক চাহিদা অনুযায়ী কাজ করাই সবচেয়ে নৈতিক–লিবারেল মানবাধিকার এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই 'অধিকার' আর 'চাহিদা'-গুলো আসলে কতটা প্রাকৃতিক, সেটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। আর কোনো কিছু যদি প্রাকৃতিক হয়ও, তাহলে সেটা অনুযায়ী কাজ করতে আমরা নৈতিকভাবে কেন বাধ্য হব সেটাও প্রশ্ন।

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন যৌনতা ফেরি করে?

মানুষ অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে লাভ কার? যে অশ্লীলতা করছে তার কোনো লাভ নেই। সে নিজেকে ছোট করছে, অপমানিত করছে। এতে লাভ আছে শয়তানের। শয়তান চায় মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করুক, যাতে সে মানুষকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে।

আর কার লাভ?

অশ্লীলতা আর অবাধ যৌনতা ছড়িয়ে পড়লে সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে এক নম্বর হলো ভোগবাদ। কেউ যখন নিজের সব শারীরিক কামনাবাসনা, সব ফ্যান্টাসি চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে কোনো ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ আর কাজ করে না। এ ধরনের মানুষ খুব ভালো ভোক্তা আর ক্রেতা হয়। যতক্ষণ পকেটে টাকা থাকে ততক্ষণ যা ইচ্ছে তা-ই সে কেনে। যা ইচ্ছে তা-ই করে। এ ধরনের মানুষ সব সময় শরীরের তৃপ্তি আর আরাম খোঁজে। তার মধ্যে কাজ করে চাহিদা উদিত হওয়ামাত্র তা পূর্ণ করার তীব্র তাড়না। কারণ, তাৎক্ষণিকভাবে কামনাবাসনা তৃপ্ত করায় সে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। এ ধরনের মানুষ আসলে আদর্শ ভোক্তা। কাজেই অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রভাবে ভোগবাদ বাড়ে।

ভোগবাদ বাড়লে কাদের লাভ? বিভিন্ন কর্পোরেশান আর সরকারের লাভ, যারা এই নিরন্তর ভোগ থেকে মুনাফা অর্জন করে। আজ আমরা চারপাশে তীব্র বস্তুবাদী এবং ভোগবাদী একটা সমাজ কেন দেখি? কারণ নিজের কামনাবাসনাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে, যে নিজেকে সংযত করে, সে ভালো ভোক্তা না। কোনো শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মদের আসক্তি বাড়লে যেমন মদবিক্রেতার লাভ, তেমনি মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে কামনাবাসনা পূরণে অভ্যস্ত করে তুলতে পারায় কর্পোরেশানগুলোর লাভ।

তা ছাড়া এভাবে একটা আত্মকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে ওঠে। এমন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যে সমাজের মানুষ চরমভাবে আত্মকেন্দ্রিক, প্রত্যেকটা মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো—সেই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সোজা। অন্যদিকে যে সমাজে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় হয়, ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক থাকে,

মানুষ একে অপরের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকে—সেই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। বিচ্ছিন্ন, একাকী মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। সংঘবদ্ধ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

কিন্তু সংঘবদ্ধ সমাজের অংশ হতে হলে অনেক সময় নিজের কামনাবাসনা আর ইচ্ছের ওপর সমাজের স্বার্থকে স্থান দিতে হয়। কোনো পরিবার তখনই মজবুত হয় যখন পরিবারের সদস্যরা একে অপরের জন্য নিজ স্বার্থ আর চাহিদা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অন্যদিকে ব্যক্তিবাদ মানুষকে শেখায় শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে—নাফসি, নাফসি, নাফসি! মানুষ যখন এভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তখন ওই ক্ষমতাসীনরা লাভবান হয়, যারা মানুষকে শয়তানী পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে চায়। এটাই হলো ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত গন্তব্য।

সমাজে অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রসার ঘটানোর আরেকটা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ভালোমন্দ নির্ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। মানুষের যখন তাকওয়া থাকে না, তাকওয়া দূরের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের শালীনতাবোধও যখন থাকে না, তখন সত্যমিথ্যা আর ভালোমন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমতাসীনরা লাভবান হয়। মানুষ যদি মন্দকে চিনতেই না পারে তাহলে মন্দকে প্রতিরোধ করবে কীভাবে? ভালো কী, সেটাই যদি মানুষ না জানে তাহলে তারা কীভাবে খারাপ থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তন চাইবে? আজকের ক্ষমতাসীনরা জঘন্য ধরনের সব কাজ করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। কেন?

আমার বাবা বেড়ে উঠেছিলেন সিরাজে। সিরাজ ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সেখানে এক চালের আড়তদার ছিল। পুরো সিরাজে যত চাল বিক্রি হতো সব তার হাত ঘুরে আসত। এই আড়তদার একদিন চালের দাম ৫০% বাড়িয়ে দিলো। বেশি দাম মানে বেশি লাভ, তাই সে দাম বাড়িয়ে দিলো। ইরানের মানুষ দু-বেলা ভাত খায়। কাজেই চালের দাম বাড়িয়ে দিলে কিছু মানুষকে উপোস করত হবে। যারা আগে দারিদ্র্যসীমার ঠিক ওপরে ছিল তারা নিচে চলে যাবে। নিঃসন্দেহে এটা যুলুম।

তখন বিশাল প্রতিবাদ হলো। বিক্ষোভ-মিছিল হলো। সেই আড়ত ঘেরাও হলো। সবাই চালের দাম কমানোর দাবি জানাল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষ রাস্তায় নামল। মুক্তবাজার অর্থনীতি কিংবা অন্য কিছুর দোহাই দিয়ে আড়তদারের পক্ষে কেউ সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল না। কারণ, সবাই বুঝতে পেরেছিল যা হচ্ছে তা অন্যায়। এই যুলুম বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু মানুষের ভালো-মন্দ চেনার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষমতাসীন অপরাধীরা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ নিয়ে তাদের আর মাথা ঘামাতে

হয় না। কারণ, অন্যায় যে হচ্ছে সেটাই বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে পারে না।

সমাজে অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রসার ঘটানোর আরেকটা কারণ হলো, মানুষ যখন ইচ্ছেমতো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন অন্যায়কে চিনতে পারলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কথা বলতে চায় না। অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো ইচ্ছাশক্তি আর সাহস তার মধ্যে থাকে না। তার মধ্যে একধরনের অভ্যস্ত আলস্য কাজ করে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাঁর বেঁধে দেয়া সীমালঙ্ঘন করে ক্রমাগত নফসকে সন্তুষ্ট করার কারণে, তার মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো আত্মিক শক্তি আর থাকে না।

ভোগবাদ, আত্মতুষ্টির পেছনে ছোটার মানসিকতা, এবং গুনাহতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া সমাজকে এভাবে দুর্বল করে এবং একসময় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে। অল্প কিছু ক্ষমতাসীন মানুষ আজ খুব নিপুণভাবে মানবজাতির নফসকে উস্কে দিচ্ছে। মানুষকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করছে যেকোনো মূল্যে তার কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে। আর এই কাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈধতা দিচ্ছে লিবারেলিসমের দর্শন। তৈরি হচ্ছে চরম মাপের আত্মকেন্দ্রিক, বস্তুবাদী আর ভোগবাদী সমাজ। লিবারেলিসম মানুষকে শেখাচ্ছে–ভোগ করো। নিজেকে তৃপ্ত করো। নিজেকে সন্তুষ্ট করো–নাফসি নাফসি নাফসি।

আর এভাবেই ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতা।

অন্যান্য

ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে?

হ্যাঁ...আবার না-ও

ইসলাম প্রসার নানাভাবে হয়েছে। ব্যবসা, কূটনীতি, দাওয়াহ এবং অবশ্যই সামরিক অভিযান বা জিহাদ আত-তালাব-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) শাসনের এক শ বছরের মধ্যে। আর এই সম্প্রসারণ হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে।

তবে বিজয়ী হবার পর হিন্দু বা খ্রিষ্টানদের মতো ইসলামী শাসকরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেননি; বরং বিধর্মীরা ইসলামী শাসনের অধীনে আহলুয যিম্মা হিসেবে বসবাস করেছে। আহলুয যিম্মা বা যিম্মী অর্থ 'সংরক্ষিত মানুষ বা নাগরিক'। যিম্মীদের নিয়ে আলোচনা করার মতো অনেকগুলো বিষয় আছে, তবে সেই আলোচনা আমরা এখন যাব না। আমাদের আলোচনার বিষয় ইসলামের প্রসার।

কাজেই, হ্যাঁ ইসলাম তলোয়ার এবং সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। আর জিহাদ শুধু রক্ষণাত্মক না। ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদও আছে।

এটা শোনামাত্র কিছু প্রশ্ন আসতে পারে—

এটা কি অনৈতিক না?

এটা কি বর্বর না?

এটা কি ধর্মীয় স্বাধীনতাবিরোধী না?

এ প্রশ্নগুলো কমন। আমরা প্রায়ই শুনি। আচ্ছা, এবার আমি কিছু প্রশ্ন করি।

জেনেভা কনভেনশানের নাম শুনেছেন না? আপনি কি জেনেভা কনভেনশানে বিশ্বাস করেন? আপনি কি জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় বিশ্বাস করেন?

আপনি কি মনে করেন ন্যায়বিচারের কিছু আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড আছে, যেগুলো বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ করার অধিকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আছে?

আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনি আসলে ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। আপনি হয়তো মনে করেন আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু আপনার ধারণা ভুল। যখন 'ধর্ম' শব্দটা শুনছেন তখন আপনি ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের কথা ভাবছেন। কিন্তু ধর্মের এই সংজ্ঞা বেশ সংকীর্ণ। ধর্ম নিয়ে কি আরও বিস্তৃতভাবে চিন্তা করা যায় না?

মহাবিশ্ব, বাস্তবতা, মানবঅস্তিত্ব, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ই তো ধর্ম, তাই না? ধর্মকে যদি এভাবে সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে কিন্তু বলা যায় জেনেভা কনভেনশান এবং সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের মতো আধুনিক সেক্যুলার মানদণ্ডগুলো আসলে একটা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও এই ধর্ম নিজেকে 'ধর্ম' বলে দাবি করে না। আর এই আধুনিক সেক্যুলার মানদণ্ডগুলো বিশ্বজুড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই আধুনিক ধর্মের একটা নাম দেয়া যাক। ধরা যাক এই ধর্মের নাম 'প্রথম বিশ্ববাদ'। নাম হিসেবে এটা বেশ মানানসই। কারণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্বের এই শ্রেণিবিভাগ প্রথম বিশ্বের লোকেদেরই করা। প্রথম বিশ্ব মনে করে বাকি বিশ্বের তুলনায় তারা অনেক বেশি এনলাইটেন্ড ও সভ্য। বাকি পৃথিবীকে সভ্য এবং উন্নত করে তোলা তাদের পবিত্র দায়িত্ব। আর এটা করার উপায় হলো তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ আর ভালো-মন্দের মাপকাঠি বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। তাহলে আধুনিক এ ধর্মের নাম আমরা দিলাম, প্রথম বিশ্ববাদ। এবার সামনে আগানো যাক।

মনে আছে, আমরা জেনেভা কনভেনশান, সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার মতো জিনিসগুলোর কথা বলেছিলাম? এগুলো যে গ্রহণ করে নেয় সে প্রথম বিশ্ববাদে বিশ্বাসী। সে এই ধর্মের অনুসারী এবং সমর্থক। শুধু তা-ই না, সে মনে করে এই ধর্মের প্রসার তরবারির মাধ্যমে হওয়া উচিত। বিভিন্ন দেশ এসব স্ট্যান্ডার্ড মানছে কি না, সেটা বলপ্রয়োগ না করে জাতিসঙ্ঘ কীভাবে নিশ্চিত করবে? আইন প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

এই শক্তি প্রয়োগ আবার বিভিন্নভাবে হয়। কখনো কখনো এটা হয় অনাহারের মাধ্যমে। যারা প্রথম বিশ্ববাদে বিশ্বাস করে না, তাদের ওপর অবরোধ জারি করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে তারা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় খাবার এবং ওষুধ পায় না। একসময় অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে অবিশ্বাসীরা বাধ্য হয় আত্মসমর্পণ করে

প্রথম বিশ্ববাদ মেনে নিতে। এ ধরনের শক্তি প্রয়োগকে প্রথম বিশ্ববাদের পুরোহিতরা বলে 'কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা'।

উপোস করিয়ে প্রথম বিশ্ববাদ গ্রহণ করানো না গেলে আরও শক্ত ব্যবস্থা আছে। প্রথম বিশ্ববাদের পুরোহিত আর মোল্লারা একে বলে 'সামরিক হস্তক্ষেপ'। এটা হলো প্রথম বিশ্ববাদের পবিত্র যুদ্ধ। বাস্তবতা হলো, দিনশেষে বিধর্মীদের স্বেচ্ছায় অথবা অস্ত্রের মুখে প্রথম বিশ্ববাদ গ্রহণ করতেই হবে। এ কারণেই আজ এটা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশাল এবং কর্তৃত্বশালী ধর্ম। প্রথম বিশ্ববাদ পৃথিবীকে শাসন করে লৌহমুষ্টিতে। মিডিয়া, মিউসিক, সিনেমা, বই–নানাভাবে প্রথম বিশ্ববাদের মন্ত্র পৌঁছে যায় পৃথিবীর প্রতিটি কোনায়।

প্রথম বিশ্ববাদের মিশনারীও আছে। এদের বলা হয় এনজিও। এদের কাজ হলো দেশে দেশে মানুষের মধ্যে প্রথম বিশ্ববাদের আকীদাহ-বিশ্বাস প্রচার করা। অন্ধকারে আটকে থাকা মানুষকে আলোকিত করা। পৃথিবীর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ধর্ম হলো 'প্রথম বিশ্ববাদ'।

তবে এত নিয়ন্ত্রণ আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, প্রথম বিশ্ববাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো এই ধর্ম সারা বিশ্বকে বুঝিয়েছে যে তার আসলে অস্তিত্ব নেই। প্রথম বিশ্ববাদ নামে যে কোনো ধর্ম আছে, এটাই মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। প্রথম বিশ্ববাদের আকীদাহগুলোকে কল্যাণ, ন্যায়বিচার ইত্যাদির সমার্থক ধরা হয়। অনুসারীরা বুঝতেইও পারে না যে তারা একটা নির্দিষ্ট ধর্ম, আকীদাহ, নৈতিকতা এবং মানবচরিত্রের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অনুসরণ করছে। প্রথম বিশ্ববাদীরা মনে করে তাদের বিশ্বাস আর মূল্যবোধগুলো সর্বজনীন। পৃথিবীজুড়ে অনেক মানুষ প্রথম বিশ্ববাদের আকীদাহ, মূল্যবোধ ইত্যাদি গ্রহণ করে না–এটা তারা মানতেই চায় না।

প্রথম বিশ্ববাদীদের মতে বিধর্মীদের জন্য দুটো রাস্তা খোলা–আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু।

প্রথম বিশ্ববাদ অস্ত্রের জোরে সারা পৃথিবীজুড়ে নিজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রচার করে। তাহলে ইসলামের সাথে এর পার্থক্য কোথায়? জোরজবরদস্তি করে বিধিবিধান আর আইন প্রয়োগ নিয়েও তো প্রথম বিশ্ববাদীদের আপত্তি নেই। তারা নিজেরাই এটা করে। তাহলে তাদের আপত্তি কী নিয়ে?

তাদের আপত্তি ইসলাম নিয়ে। তাদের মূল বক্তব্য হলো, আমরা করলে ঠিক, কিন্তু ইসলাম করলে ভুল। এটা স্পষ্ট ভণ্ডামি, ডাবলস্ট্যান্ডার্ড।

কৃষ্ণ করলে লীলাখেলা, আমরা করলে দোষ?

প্রথম বিশ্ববাদের পুরোহিতরা মানুষকে বোকা বানিয়েছে। তারা মানুষকে বলেছে,

অস্ত্রের জোরে তারা মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু ইসলাম দেয়। অথচ দুটো মোটামুটি একই জিনিস। একমাত্র পার্থক্য হলো, প্রথম বিশ্ববাদীরা মনে করে তাদের ধর্ম এবং তাদের শরীয়াহ সত্য এবং ন্যায়বিচারের শিখর। আর মুসলিমরা জানে তাদের দ্বীন এবং শরীয়াহ হলো সত্য এবং ন্যায়বিচারের শিখর।

ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ, সেটা নিয়ে আলোচনায় আমরা এখন যাব না। তবে আমার মূল পয়েন্ট হলো, যে কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর সামরিক হস্তক্ষেপকে আজকের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে মেনে নেয়া হয়, সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে তার সাথে আক্রমণাত্মক জিহাদের কার্যত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য হলো আক্রমণাত্মকভাবে কোন ধর্ম প্রচার করা হচ্ছে, সেখানে।

অবশ্য একটা পার্থক্য আছে। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে যেসব জায়গাতে ইসলাম পৌঁছেছে সেই অঞ্চলগুলো এবং তাদের বাসিন্দারা সমৃদ্ধ হয়েছে। সেসব অঞ্চল একসময় ইসলামী চিন্তা, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মুসলিমরা ইরাক বিজয় করার পর বাগদাদ ইসলামী খিলাফাহর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মুসলিমরা পারস্য বিজয় করেছে, আর ইসলামী ইতিহাসের মহান আলিমদের অনেকেই এসেছেন পারস্য থেকে। মুসলিমরা মিসর জয় করেছে, মিসর ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে মুসলিমরা এখনো আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়।

অন্যদিকে প্রথম বিশ্ববাদ যেখানে গেছে, সে জায়গাগুলো সমৃদ্ধ হয়নি; বরং প্রথম বিশ্ববাদের 'মুক্তি' আর 'স্বাধীনতা' অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের যেখানেই গেছে সে জায়গাগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

এটা বেশ বড় একটা পার্থক্য।

আমার কথার ব্যাপারে একটা আপত্তি উঠতে পারে। কিছু আলাভোলা, স্বপ্নালু, কাব্যিক টাইপের লোকেরা হয়তো বলবে তারা জেনেভা কনভেনশান, সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র–এসবে বিশ্বাস করে না।

ঠিক আছে, ধরুন কোনো দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর গণহত্যা চালানো হচ্ছে অথবা অন্য কোনো যুলুম হচ্ছে। নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কি সামরিক হস্তক্ষেপ করা উচিত না? কোনো দেশে যদি নারী, শিশু কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা জাতির মানুষের বিরুদ্ধে সিস্টেম্যাটিক নির্যাতন চালানো হয়, তাহলে কি সেই দেশকে বাধা দেয়া উচিত না? অত্যাচার, নির্যাতন থামানো উচিত না?

যদি আপনার উত্তর 'না' হয়, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি মানুষ হিসেবে অনৈতিক। আপনার চিন্তা-ভাবনাও অযৌক্তিক। যদি আপনি সত্যে বিশ্বাসী হন, ন্যায়বিচার এবং কল্যাণে বিশ্বাসী হন, তাহলে আপনি চাইবেন সবাই সত্যের আলো

দেখুক। সবাই ন্যায়বিচার পাক। সবার কল্যাণ হোক।

সত্য কী, কল্যাণ কী, ন্যায়বিচার কী–এটা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তর্কবিতর্কও হতে পারে। কিন্তু এগুলোর প্রচার ও প্রসার হওয়া উচিত, এটা নিয়ে আপনি একমত। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োজন। আর আইন বাস্তবায়নের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

***

এভাবে আমরা ইসলামী বিশ্বাস এবং ইতিহাসের সাথে আপস না করে আত্মবিশ্বাসের সাথে ইসলাম এবং আক্রমণাত্মক জিহাদের ব্যাপারে তোলা অভিযোগের উত্তর দিতে পারি।

মুসলিম-বিশ্বে সমকামী এজেন্ডা বাস্তবায়নের নীলনকশা

পৃথিবীতে সমকামী এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথে শেষ বাধা হলো মুসলিম-বিশ্ব। কীভাবে মুসলিম-বিশ্বকে সমকামিতা আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নেয়ানো যায়, তা নিয়ে পশ্চিমা ক্ষমতাধররা এখন নিজেদের প্রশ্ন করছে। এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট। সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌনবিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের একটি কৌশল অত্যন্ত সফলতার সাথে ইউরোপ এবং অ্যামেরিকাতে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ একই কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে মুসলিম-বিশ্বেও।

সমকামিতার ব্যাপারে মার্কিন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য মার্শাল কার্ক এবং হান্টার ম্যাডসেন নামে দুজন সমকামী মিডিয়া স্ট্র্যাটিজিস্ট ছয় ধাপের এক পরিকল্পনা বানিয়েছিল। ১৯৮৭ সালে 'ওভারহলিং অফ স্ট্রেইট অ্যামেরিকা' নামের একটি প্রবন্ধে প্রথমবারের মতো তারা এই কৌশলগুলো তুলে ধরে। তারপর এটি প্রকাশিত হয় 'অ্যাফটার দা বল' নামে একটি বই হিসেবে।[১১]

এই কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো সমকামিতাকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা। সমাজে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা। এই কৌশল অত্যন্ত সফল হয়। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে অ্যামেরিকার মতো গভীরভাবে রক্ষণশীল খ্রিষ্টান সমাজে সমকামিতা চলে আসে সমাজের মূলধারার। শুধু তা-ই না, সমকামিতাকে এখন অ্যামেরিকান সমাজে সেলিব্রেটও করা হয়। এই কৌশলকে অল্প কিছু পরিবর্তন করে এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা যদি এ কৌশলকে নির্বিঘ্নে বাস্তবায়িত হতে দিই, তাহলে হয়তো খুব দ্রুত মুসলিম-বিশ্বেও সমকামিতা সমাজের মূলধারায় গ্রহণযোগ্যতা পাবে। পশ্চিমে যা অর্জন করতে ২০ বছর লেগেছে, হয়তো মুসলিম-বিশ্বে তা অর্জিত হবে আরও কম সময়ে।

---

[১১] Kirk, Marshall; Madsen, Hunter (November 1987), "The Overhauling of Straight America", Guide
Kirk, Marshall; Madsen, Hunter (November 1989), After the Ball: How America Will Conquer its Fear and Hatred of Gays in the 90s, Doubleday

আসুন দেখা যাক এই ছয়টি ধাপ কী কী?

প্রথম ধাপ—সমকামিতা নিয়ে যত বেশি সম্ভব এবং যত জোরে সম্ভব কথা বলা। এর উদ্দেশ্য সমকামিতার ব্যাপারে মানুষের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দেয়া। মানুষ যাতে একসময় সমকামিতাকে স্বাভাবিক কিছু একটা হিসেবে দেখতে শুরু করে। সমকামিতা নিয়ে বারবার কথা বলা হলে মানুষের মনে আর আগের মতো ধাক্কা লাগবে না। সমকামী এজেন্ডার পেছনের লোকেরা চায় মুসলিমরা সমকামিতাকে আইসক্রিমের ফ্লেভার কিংবা পছন্দের খেলার মতো আরেকটা অর্থহীন 'চয়েস' হিসেবে দেখুক। কেউ ভ্যানিলা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে, কেউ চকোলেট। কেউ ক্রিকেট পছন্দ করে, কেউ ফুটবল। ঠিক একইভাবে, কেউ সমকামী আর কেউ সমকামী না। এভাবে তারা সমাজের মূলধারায় সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ চায়।

মানুষের সংবেদনশীলতা নষ্ট করার মূল চাবিকাঠি মিডিয়া। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম, যেমন টিভি সিনেমা, গান, নাটক, বই ইত্যাদি মাধ্যমে সমকামিতাকে উপস্থাপন করতে হবে। এভাবে পুরো প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে।

দ্বিতীয় ধাপ—সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে দেখাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সমকামীদের আগ্রাসী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো যাবে না। মানুষকে বোঝাতে হবে সমকামীরা আসলে ভিকটিম, তাদের সুরক্ষা প্রয়োজন। এতে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি তৈরি হবে। সবচেয়ে ভালো হয় সমকামিতার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তরুণ এবং আকর্ষণীয় চেহারার কাউকে বেছে নিতে পারলে। এমন কেউ, বাহ্যিকভাবে দেখতে যে বাকি দশটা সাধারণ মানুষের মতোই। তারপর তাকে ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। এভাবে সমকামিতার ব্যাপারে মুসলিমদের চিন্তা বদলাতে শুরু করবে।

একজন মুসলিম এখন যখন সমকামিতার কথা ভাবে তখন সে কওম লূতের কথা চিন্তা করে। কওম লূত কোনো অর্থেই নিষ্পাপ ছিল না। ভিকটিম ছিল না; বরং কওম লূত ছিল আগ্রাসী, অপরাধী, ঘৃণ্য। কিন্তু অ্যান্টি-বুলিয়িং মেসেজের মাধ্যমে সমকামীদের অপরাধীর বদলে এমন নিষ্পাপ ভিকটিম হিসেবে দেখানো হবে যাদের সুরক্ষা আর সাহায্য প্রয়োজন।

তৃতীয় ধাপ—যারা সমকামীদের পক্ষে অবস্থান নেয় তাদের একটা আদর্শিক ভিত্তি দিতে হবে। যেমন বৈচিত্র্য। সমকামিতা ভালো-মন্দের প্রশ্ন না; বরং বৈচিত্র্যের প্রশ্ন। বৈচিত্র্য ভালো জিনিস। মুসলিমরা বৈচিত্র্য পছন্দ করে, কারণ ইসলাম বলে সাদা-কালো, আরব-অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই সমকামিতাকে বৈচিত্র্যের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

সমকামিতার সমর্থনকে অধিকারের প্রশ্ন হিসেবেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ইনসাফের পক্ষে দাঁড়ানো আর যুলুমের বিরোধিতা করা ইসলামের শিক্ষা। কাজেই এই সেন্টিমেন্টকেও কাজে লাগাতে হবে। মুসলিমরা সরাসরি সমকামী যৌন আচরণকে সমর্থন করবে না। তাই ফোকাসটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে অধিকারের প্রশ্নে।

তুমি কি নিষ্পাপ, অসহায় ভিকটিমদের নির্যাতন আর বুলিয়িং এর পক্ষে? নাকি তুমি সমকামী অধিকারের পক্ষে? সমকামিতা নিয়ে আলোচনাকে এভাবে ফ্রেইম করা হবে।

দুজন পুরুষ পায়ুসংগম করছে–এমন জঘন্য বিকৃত আচরণ মুসলিমরা মেনে নেবে না। কোনো স্বাভাবিক মানুষই মেনে নেবে না। কিন্তু আলোচনা যদি অধিকারের হয়, ব্যাপারটাকে যদি মানবাধিকার আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার লড়াই হিসেবে দেখানো হয় তাহলে অনেক মুসলিম বিষয়টার ব্যাপারে ইতিবাচক বোধ করবে এবং সমর্থনের সম্ভাবনা থাকবে।

চতুর্থ ধাপ–এই পয়েন্টের কারচুপিটা সূক্ষ্ম। বলতে হবে, সমকামী আচরণ হারাম। প্রথম শোনায় এটা বেশ অদ্ভুত লাগতে পারে। সমকামী আচরণ হারাম বলা হলে মানুষ সমকামিতা মেনে নেয়া থেকে পিছিয়ে যাবে না?

আসলে এখানে একধরনের রিভার্স সাইকোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। সমকামী আচরণ হারাম বলার মাধ্যমে একজন লোক প্রথমে নিজেকে ইসলামী মূল্যবোধের সমর্থক আর অনুসারী হিসেবে উপস্থাপন করবে। তারপর সেই একই লোক, অধিকারে আর নির্যাতিতকে সহায়তা করার অজুহাত দেখিয়ে সমকামী অধিকারের কথা বলবে।

এখানে যুক্তি হবে এমন–

> হ্যাঁ, সমকামী আচরণ তো অবশ্যই হারাম। এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সমকামীরা ভিকটিম। তারা নির্যাতিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, তাই তাদের অধিকারের দাবি আমাদের সমর্থন করত হবে।

এভাবে মুখে হারামের কথা বলে আড়ালে সমকামিতার পক্ষে ক্যাম্পেইন চলবে। এটা একধরনের ট্রোজান হর্সের মতো। মুসলিমদের বোঝানো হবে, সমকামী আচরণ হারাম কিন্তু সমকামী অধিকারকে সমর্থন করা হালাল। শুধু হালাল না; বরং প্রশংসনীয়! অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। সমকামী আচরণে লিপ্ত হওয়া যেমন হারাম তেমনিভাবে সমকামী আচরণকে সমর্থন করাও হারাম। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে যারা ভালোভাবে জানে না, এ ধরনের সূক্ষ্ম জালিয়াতির মাধ্যমে তাদের বোকা বানিয়ে, সমকামী অধিকার মেনে নেয়ানো হবে।

গত প্রায় দশ বছর ধরে পশ্চিমের বিভিন্ন সেলিব্রিটি বক্তা এবং অ্যাকাডেমিক এই কৌশল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বে থাকা মুসলিমদের মধ্যে, বিশেষ করে অ্যামেরিকান মুসলিমদের অনেকে মনে করছে সমকামী অধিকার সমর্থন করা এবং সমকামী অধিকার আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য করা জায়েজ। এই একই কৌশল এখন পশ্চিম থেকে রপ্তানি করা হচ্ছে পূর্বে। মধ্যপ্রাচ্য, ভারতসহ মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে আগে সমকামিতার ব্যাপারে আলিমদের ক্লিয়ার-কাট শক্ত অবস্থান ছিল। ধীরে ধীরে এই অবস্থান বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সমকামী আচরণ হারাম, কিন্তু সমকামী অধিকারকে সমর্থন দিতে হবে—এই ধরনের ধ্যানধারণা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

পঞ্চম ধাপ—সমকামী এজেন্ডার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের আক্রমণ করতে হবে। তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করতে দিতে হবে।

> ওরা সেকেলে, বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন, ওরা অসহিষ্ণু, কাঠমোল্লা—ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়া মানুষ।

এভাবে একদিকে সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে দেখানো হবে, অন্যদিকে যারা সমকামী এজেন্ডার বিরোধিতা করছে তাদের দেখানো হবে আগ্রাসী, অপরাধী, অত্যাচারী হিসেবে। সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য পুরো ব্যাপারটাকে এভাবে ফ্রেইম করা অত্যন্ত জরুরি। তাদের এই চেষ্টা সফল হলে সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলা মানুষদের সাধারণ মুসলিমরা এড়িয়ে চলতে শুরু করবে। ফলে প্রথম প্রথম একটা নীরবতার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সাধারণ মুসলিমরা সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইবে না। কারণ, কেউই চায় না যে, তাকে অসহিষ্ণু, সেকেল, বর্বর, কাঠমোল্লা বলা হক। নীরবতার কারণে পুরোদমে সমকামী প্রপাগান্ডা চালানো একসময় সহজ হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ ধাপ—পর্যায়ক্রমিক আইনি সংস্কার। সমকামিতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে আইন আছে, যেগুলো অনুযায়ী সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের আইন একসময় পশ্চিমা বিশ্বেও ছিল। ধাপে ধাপে এসব আইন বাতিল করা হয়েছে। তারপর পুরো আইনি কাঠামোকে বদলানো হয়েছে। ফলে সমকামিতা এখন শুধু বৈধ না; বরং এর বিরুদ্ধে কথা বলাও বেআইনি। এ একই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে মুসলিম-বিশ্বে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে।

আমরা এটাকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের সাথে তুলনা করতে পারি। অনেক মুসলিম দেশে এখনো কাগজে-কলমে সমকামিতার ব্যাপারে হদ্দ বা শর'ঈ শাস্তির বিধান আছে। এটা রাতারাতি বদলানো যাবে না। ধাপে ধাপে আগাতে হবে। শুরু

করতে হবে কম বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে।

প্রথম পর্যায়, যেসব মুসলিম দেশে হুদুদ আছে, সেগুলো বাতিল করা। এ ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তি এবং এনজিওগুলো এরইমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দশকের পর দশক ধরে চলা লিবারেল আর সেক্যুলার মগজধোলাইয়ের কল্যাণে অনেক মুসলিমই আজ হুদুদের ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করে। তারা পশ্চিমা লেন্সের ভেতর দিয়ে হুদুদকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হুদুদ তাদের কাছে বর্বর মনে হয়ে। হুদুদ বাতিল করার পদক্ষেপের জন্য সাধারণ মানুষ এক অর্থে প্রস্তুত। আর অনেক মুসলিম দেশে হুদুদ বাতিল অনেকে আগেই হয়ে গেছে। সেসব দেশ আগাগোড়া সেক্যুলার আইনে চলে। যেসব দেশে সেক্যুলার আইনে সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়, সেসব দেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে এই আইনগুলো বাতিল করা।

সমকামিতার হদ্দ বাতিল করার পরের পর্যায় হলো সমকামী আচরণকে বৈধতা দেয়া। এই পর্যায়ে, যেসব দেশ সমকামিতাকে বৈধতা দেবে না তাদের ওপর অ্যামেরিকা এবং ইউরোপের সরকারগুলো চাপ প্রয়োগ করবে।

তৃতীয় পর্যায় হবে সমকামী ক্লাব আর বারের মতো জায়গাগুলোকে বৈধতা দেয়া। আইনিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হলে সরকার আর এগুলো বন্ধ করতে পারবে না।

চতুর্থ পর্যায় হবে, সমকামীদের জন্য 'সংরক্ষিত স্ট্যাটাস' তৈরি করা। অর্থাৎ যে নিজেকে সমকামী হিসেবে যে পরিচয় দেবে সে আইন অনুসারে বিশেষ কিছু সুরক্ষা পাবে। যেমন তাকে সমকামিতার বিরুদ্ধে কিছু বলা হলে সেটা হয়রানি বা নিগ্রহ হিসেবে দেখানো যাবে।

পঞ্চম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো সমকামী বিয়েকে আইনি বৈধতা দেয়া। এটা করার জন্য আইনি কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু এরই মধ্যে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের কাজ অ্যাক্টিভিস্টরা অনেক দূর এগিয়ে নেবে। ততদিনে একধরনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে যাবে। যুক্তি দেয়া হবে–

> সমকামী আচরণ হারাম। কিন্তু ইচ্ছেমতো বিয়ে করার অধিকার মানুষের থাকা উচিত। এই অধিকার কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া একধরনের বৈষম্য।

এ ধরনের কথা একেবারেই অযৌক্তিক, এর কোনো আইনি ভিত্তিও নেই। তবু মুসলিম-বিশ্বে সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেয়ার জন্য এটা প্রচার করা হবে। পশ্চিমা দেশগুলোকে আবারও মুসলিম দেশের সরকারগুলোর ওপর চাপ দেবে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে 'হেইট স্পিচ' আইন বানানো হবে। সমকামী এজেন্ডার বিরুদ্ধে কথা বলাকে বেআইনি করা হবে। ইতিমধ্যে ক্যানাডা, ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ

অনেক দেশে এ ধরনের আইন হয়েছে। যেসব দেশে এ ধরনের আইন পাশ হয়েছে, সেখানে সমকামিতা বা সমকামী এজেন্ডার বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা কিছু শেখানো বেআইনি।

এভাবে আইনি কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন চলে আসবে। তারপর সমকামিতার কথা ঢোকানো হবে পাঠ্যসূচিতে। প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের শেখানো হবে সমকামিতা একদম স্বাভাবিক। একজন ছেলে চাইলে মেয়ে হতে পারে, মেয়ে চাইলে ছেলে হতে পারে ইত্যাদি। তারপর অভিভাবকদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হবে। স্কুলে সমকামিতাকে স্বাভাবিক শেখানো হচ্ছে কিন্তু অভিভাবক চাইলে বাচ্চাকে ক্লাস থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। যৌন শিক্ষা ক্লাসের মগজধোলাইয়ের কারণে কোনো শিশু যদি তার লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায় তাহলে অভিভাবক বাধা দিতে পারবে না। অভিভাবক বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে সেটাকে শিশু নির্যাতন বলা হবে।

এভাবে একসময় সব আইনি বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোনোভাবেই আর সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না। অফিস, স্কুল কিংবা মসজিদে সমকামী কর্মচারীকে রাখতে না চাইলে সেটা আইনের চোখে 'অপরাধ' হবে। এভাবে সম্পন্ন হবে আইনি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন।

এই ছয়টি ধাপ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করা হলে সর্বোচ্চ ১০-২০ বছরের মধ্যে মুসলিম-বিশ্বকে বদলে ফেলা যাবে।

আপনার দেশেও এমন হচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন তো কোন কোন রাজনীতিবিদ সমকামিতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বা বক্তব্য দিয়েছে? কোন প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে সমকামিতাকে প্রমোট করেছে? কোন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কোন পত্রিকা, কোন অভিনেতা, আর তারকারা সমকামী এজেন্ডাকে সমর্থন দিচ্ছে? কোন ধর্মীয় নেতারা একে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে?

সমকামী এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা জানা সমকামী এজেন্ডা মোকাবিলার প্রথম ধাপ হলো।

তারা চক্রান্ত করে এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করেন এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

সংশয়বাদী

ধ্বংসের গুরুত্ব

যখন আমি ছোট ছিলাম বাসায় বিভিন্ন হোম প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হতো। ঘর রং করা, নতুন করে মেঝে বসানো, ঘরের টুকটাক মেরামত, এসব আরকি। বাবা এসব করতে খুব ভালোবাসতেন, আর অবধারিতভাবে আমারও হাত লাগাতে হতো। কাজগুলো যে খুব একটা উপভোগ করতাম তা না, তবে এগুলো করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি।

একদম প্রথম দিকে বাবা একটা জিনিস শিখিয়েছিলেন। নতুন যেকোনো প্রজেক্ট শুরু করতে হয় পরিষ্কার, খালি জায়গা থেকে। ধরুন, বাসার কোনো একটা দেয়ালে নতুন করে রং করবেন। প্রথমে ঘষে ঘষে পুরোনো রং তুলে ফেলতে হবে। দেয়ালের ফুটো, ভাঙাচোরা, এসব ঠিক করতে হবে। তারপর নতুন রং লাগাতে পারবেন। এই কাজগুলো না করে পুরোনো রঙের ওপর নতুন করে রং চড়িয়ে দিলে অল্প ক'দিন পরই তা খসে পড়তে শুরু করবে। জায়গায় জায়গায় চলটা উঠবে। দেখবেন দেয়ালটা দেখতে আগের চেয়েও বাজে দেখাচ্ছে।

অ্যামেরিকা অনেক বাসাতে মেঝে হয় কাঠের। এগুলোকে 'ডেক' বলা হয়। রং করার মতো নতুন ডেক বসানোর সময়ও একই নিয়ম। প্রথম কাজ হলো পুরোনো কাঠামো ভেঙেচুরে, টুকরো টুকরো করে, প্রয়োজনে ধ্বংস করে জায়গাটা পরিষ্কার করা। সমান করে নেয়া। তারপরই কেবল নতুন করে শক্তপোক্ত, দীর্ঘস্থায়ী কিছু বানাতে পারবেন। আগের নড়বড়ে কাঠামো রেখে দিয়ে সেটার ওপর নতুন কিছু তৈরির যৌক্তিকতা নেই। এতে তেমন কোনো লাভও হবে না। পুরোনো কাঠামোর ওপর নতুন করে যা বানাবেন তা আগের মতোই নড়বড়ে হবে। যেকোনো সময় ধসে পড়া আশঙ্কা থাকবে।

পুরোনো কাঠামোর ওপর নতুন করে কিছু বানানোর আরও ঝামেলা আছে। যা-ই বানাবেন, পুরোনো কাঠামোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, মাপ ইত্যাদি মাথায় রেখে বানাতে হবে। নিজের পছন্দ আর প্রয়োজনের চেয়ে আগের কাঠামোর সীমানাগুলোকে প্রাধান্য দিতে

হবে। কারণ, আপনাকে এমন কিছু একটা বানাতে হবে, যা আগের কাঠামোর সাথে খাপ খাবে। কাজেই আগের কাঠামোর সীমানার মধ্যেই আপনাকে থাকতে হবে।

আধুনিক সময়ের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় বর্তমানের আলিমদের যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও ওপরের কথাগুলো খাটে। পুরোনো, রংওঠা, জীর্ণশীর্ণ কাঠামো হলো মডার্নিসম এবং এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন মতবাদ–লিবারেলিসম, সায়েন্টিসম, নারীবাদ, সেক্যুলারিসম ইত্যাদি। এ মতবাদগুলোকে ভেঙেচুরে ঝেটিয়ে বিদায় করে তারপর পরিষ্কার, সমান মাটিতে নতুন কাঠামো বানাতে হবে। এগুলোর ওপর নতুন কিছু বানালে, সেই কাঠামো যতই মুনশিয়ানার সাথে তৈরি করা হোক না কেন, দিনশেষে সেটা হবে নড়বড়ে এবং পতনোন্মুখ। কিন্তু পচন ধরা, পুরোনো কাঠামো বাদ দিয়ে নতুন করে যদি শুরু করা হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী, সত্যিকারের মাস্টারপিস বানানো সম্ভব, বিইযনিল্লাহ।

এ জন্যই পূর্ববর্তী আলিমদের কাজে এত বারাকাহ ছিল। তারা নির্মাণ করেছিলেন শক্ত মাটির ওপর। তাদের ভিত্তি ছিল সালাফুস সালেহিনের রেখে যাওয়া জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। যা অটল, অবিচল, নিখুঁত, পরিপূর্ণ। এ জন্যই তারা তৈরি করতে পেরেছিলেন ইসলামী জ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক আর আত্মিক অর্জনের তুলনাহীন মনুমেন্ট।

আধুনিক যুগের শুরুর দিকে মুসলিমরা রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। ইউরোপীয় মডার্নিস্ট দর্শনের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকে বিশ্বজুড়ে। মুসলিম-বিশ্বেও এর প্রভাব পড়ে। মুসলিম আলিমদের আলোচনা এবং কাজ এ সময় থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল হতে শুরু করে। একদিকে এসব মতবাদের জবাব দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক চাপ, কিংবা দখলদার ইউরোপিয়ান আর তাদের এজেন্টদের জবরদস্তির কারণে এসব মতবাদের আলোকে অনেকে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে শুরু করেন। এভাবে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে, একসময় এই মতবাদগুলো প্রভাবিত করতে শুরু করে ইসলামী স্কলারশিপকে। ফলে এই পচন ধরা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ইসলাম আর মুসলিম-বিশ্বের পুনরুত্থানের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে অনেক চিন্তাধারা।

এই পচন ধরা ক্ষয়ে যাওয়া কাঠামোকে ভেঙেচুরে, টুকরো টুকরো করতে হবে। ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে আবর্জনা। তারপর আমরা নতুন করে আত্মবিশ্বাসের সাথে তৈরি করতে পারব। বিশ্বকে দেখাতে পারব, কোনো কিছুই দ্বীন ইসলামের রাজকীয় সৌন্দর্য আর বিস্ময়কর দীপ্তির সমকক্ষ হতে পারে না।

পরিশুদ্ধি

অন্তরের অসুখের মতো চিন্তার অসুখও মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধে। ইসলামী চিন্তায় অন্তর এবং আক্বল অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে। যেমন, ঔদ্ধত্য আর অহংকারকে সাধারণভাবে অন্তরের অসুখ মনে করা হয়। কিন্তু অহংকার মানুষের চিন্তাকেও প্রভাবিত করতে পারে। ঔদ্ধত্য আর অহংকার সত্য চেনা এবং অনুধাবনের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দেখার সক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে। সত্য একদম সামনে থাকার পরও মানুষ অনেক সময় তা চিনতে পারে না। ঔদ্ধত্য আর অহংকার তার দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয়। আমাদের চারপাশের অনেক মানুষ এ কারণেই মৌলিক কিছু সত্যকে চিনতে পারে না।

একই কথা প্রযোজ্য হিংসা, লোভ এবং ঘৃণার ক্ষেত্রেও। এ অসুখগুলো শুধু মানুষের মনকে দূষিত করে না; বরং গ্রাস করে ফেলে মানুষের পুরো সত্তাকে। একসময় দূষিত করে ফেলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাকে। অনেক কথিত মুসলিম 'সংস্কারক' এর কথা আর কাজে এই অসুখগুলোর স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের এই অসুখ থেকে হেফাযত করুন।

বিশুদ্ধ অন্তর মানুষকে প্রস্তুত করে সত্য এবং হিদায়াতের আলো ধারণ করার জন্যে। কিন্তু অন্তরের মতো আক্বলও অসুস্থ হতে পারে। তাই সত্য এবং হিদায়াতের আলোকে পুরোপুরিভাবে ধারণ করার জন্য অন্তরের মতো আক্বলকেও পরিশুদ্ধ করা জরুরি।

আধুনিকতার মাঝে ইসলামকে বোঝার মূলনীতি

আধুনিকতার মাঝে ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে একটা মূলনীতি বোঝা জরুরি। বিস্তর সেক্যুলার জ্ঞান এবং অনেক সময় ইসলামী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও খুব কম মানুষ এই নীতিটা ঠিক মতো বোঝেন। এই নীতি হলো—

> মানুষ যা কিছুকে সত্য আর বাস্তব বলে দাবি করে, তার সবকিছু আসলে সত্য বা বাস্তব না।

অনেক মানুষ মিলে কোনো বিষয়কে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। সেটা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। নিজেরাও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অথচ আদতে সেটা সত্য না; বরং তাদের কল্পনাজাত সৃষ্টি।

এটা কীভাবে ঘটে?

ইতিহাসে আসলে অনেকবার অনেকভাবে এ ব্যাপারটা ঘটেছে। অসংখ্য উদাহরণ আছে। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো ধর্ম। অনেক সমাজ, জাতি এবং সভ্যতা মিথ্যা উপাস্যদের ওপর ঈমান এনেছে। মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর বিভিন্ন ধর্ম গড়ে উঠেছে। অথচ এই বিশ্বাসগুলোর পেছনে কুসংস্কার আর খেয়ালখুশি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

তবে এ ধরনের ভুল বিশ্বাস শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন ঘটে। একটা উদাহরণ দেখা যাক, যা ধর্মের বলয়ের বাইরে। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের কথা চিন্তা করুন। এমন অনেক তত্ত্ব আছে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যেগুলো একসময় সত্য মনে করা হতো। কিন্তু কিছুদিন পর সেগুলো বাদ দেয়া হয়। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফিযিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজির ক্ষেত্রে এমন অনেক উদাহরণ আছে।

ইথারের কথা শুনেছেন? কিংবা ফ্লোজিস্টন? অথবা করপাস্কলস[১০০]?

---

[১০০] ইথার (aether)–একসময় ধারণা করা হতো সমগ্র মহাবিশ্বজুড়ে ইথার নামক একটি পদার্থ আছে। ইথার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল ভূগোলকের বাইরে সমগ্র মহাবিশ্ব ইথারে পরিপূর্ণ। আলো যাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় চলাফেরা করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, আলো যেহেতু একধরনের তরঙ্গ, তাই আলো নিশ্চয় কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছোয়। এই মাধ্যম হলো ইথার।

এগুলোর অস্তিত্ব কিন্তু একসময় 'পরীক্ষালব্ধ'ভাবে প্রমাণিত ছিল। অর্থাৎ এ ধরনের কিছু আছে বলে থিওরি কিংবা হাইপোথিসিস তৈরি হয়েছিল। তারপর সেই থিওরি বা হাইপোথিসিসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফল দেখে উপসংহার টানা হয়েছিল, এই এনটিটিগুলোর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরে একসময় এগুলোকে অস্তিত্বহীন বলে বাদ দেয়া হয়। তত্ত্ব দেয়া, পরীক্ষা করা, উপসংহার টানা, আবার তত্ত্ব-উপসংহার বাদ দেয়া, সবকিছু করেছিল বিজ্ঞানীরাই।

গবেষণা আর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সামষ্টিকভাবে উপসংহার টানল– ইথারের কিংবা ফ্লোজিস্টনের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু একসময় দেখা গেল, এ রকম কিছু আসলে নেই। এগুলো আসলে কিছু মানুষের কল্পনাজাত সৃষ্টি কেবল।

এটা কীভাবে ঘটল?

এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে ঐতিহাসিক এ বাস্তবতা থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে কোনো ভুলকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা মানব-ইতিহাসে নিয়মিত ঘটে। বিস্ময়কর রকমের ধারাবাহিকতার সাথে ঘটে। আর বিজ্ঞান আর গবেষণার 'যৌক্তিক' ও 'পরীক্ষালব্ধ' জগতেও ঘটে।

আসুন এ শিক্ষাটা অন্য কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাক। রাজনীতি, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারের আলোচনায় কিছু মূল্যবোধকে বাস্তব ও সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের মতো নিরেট জায়গাতেও যেখানে সামষ্টিকভাবে ভুল হতে পারে সেখানে নৈতিকতার মতো বিমূর্ত বিষয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা কি আরও বেশি না?

আজ ইসলামকে আক্রমণ করা হয় কারণ ইসলামের শিক্ষা আর বিধান এমন কিছু

যেভাবে বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারিত হয় ঠিক তেমনিভাবে ইথারের মধ্য দিয়ে আলো সঞ্চারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইথার তত্ত্ব অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম থম্পসন (কেলভিন) ১৮৮৪ সালে মন্তব্য করেন, 'ইথার হলো একমাত্র পদার্থ, যার ব্যাপারে গতিবিদ্যায় আমরা নিসংশয়। আমরা আলোকবাহী ইথারের বাস্তবতা এবং প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত।' বলা হয়ে থাকে ১৯৮৭ সালের মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষার মাধ্যমে ইথার তত্ত্বের অবসান ঘটে।

ফ্লোজিস্টন (Phlogiston)–প্রাচীন গ্রিকদের ধারণা ছিল সব বস্তু ৪টি মূল উপাদান দিয়ে গঠিত : মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন। দীর্ঘদিন এ ধারণা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ধারণা করা হতো দাহ্য বস্তুতে পঞ্চম একটি উপাদান থাকে, ফ্লোজিস্টন। দহনের সময় দাহ্য বস্তু থেকে ফ্লোজিস্টন বেরিয়ে যায়। বিজ্ঞানী অ্যান্টন ল্যাভয়সিয়ে ফ্লোজিস্টন তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করেন।

করপাস্কলস (Corpuscles)–অষ্টাদশ শতাব্দীতে আইযাক নিউটন আলোর করপাসকুলার তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। নিউটনের বক্তব্য ছিল আলো ছোট ছোট কণা বা করপাসকল দিয়ে তৈরি। এই করপাসকলের বা কনার ভর আছে। পরবর্তী ১০০ বছর আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সরল পথে গমন, রংধনু সৃষ্টিসহ বেশ কয়েকটি আলোকীয় ঘটনাকে এ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণার সাথে খাপ খায় না, যেগুলোকে আধুনিক মানুষ চিরাচরিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

- ইসলাম বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না।
- ইসলাম মুক্তচিন্তার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম গণতন্ত্রের স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম যৌন স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম লিঙ্গ পরিবর্তন আর লৈঙ্গিক পরিচয় বদলানোর সুযোগ দেয় না!

এ রকম অনেক অভিযোগ আমরা শুনি।

কিন্তু এই ধ্যানধারণাগুলো যে সঠিক, এগুলোর যে বাস্তব ভিত্তি আছে তার প্রমাণ কী? এগুলোর যদি কোনো নৈতিক বৈধতা না থাকে, তাহলে কী হবে? হয়তো এ ধারণাগুলোও পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়া আর বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যের অধীনে থাকা আধুনিক মানুষের সামষ্টিক কল্পনার ফসল মাত্র?

এই প্রশ্ন করতে শেখা এবং এসব ধারণার ব্যাপারে সংশয়বাদিতার অবস্থান গ্রহণ করা হলো সন্দেহ এবং সংশয় সমাধানের প্রথম ধাপ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক মুসলিম আলিম এবং বুদ্ধিজীবী সংশয়বাদিতার এই অবস্থান একবারেই উপেক্ষা করে যান। তারা আলোচনা শুরু করেন আসা এসব ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে। আর এটা একটা চরম পর্যায়ের বিপর্যয়।

কেন?

কারণ, তখন অবধারিতভাবে কিছু প্রশ্ন চলে আসবে। যেমন—মুক্তচিন্তা যদি সত্য, সঠিক হয়, এত ভালো কিছু হয়, তাহলে কুরআন এবং সুন্নাহতে কেন আমরা মুক্তচিন্তার কথা পাই না?

এ প্রশ্নের জবাবে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলবে—হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহয় মুক্তচিন্তার কথা আছে তো!

তারপর কুরআন, হাদীস এবং ক্ল্যাসিকাল আলিমদের রচনাবলি চষে ছোটবড় এমন সবকিছু তারা একসাথে করবে, যেগুলোকে কোনো-না-কোনোভাবে ব্যাখ্যা করে মুক্তচিন্তার পক্ষে দলীল হিসেবে দেখানো যায়। অথবা মুক্তচিন্তার উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

কিন্তু তাদের এ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। তারা বেছে-বেছে শুধু ওই জিনিসগুলো আনছেন যেগুলো তাদের উপসংহারকে সমর্থন করে। কিন্তু তাদের আনা প্রত্যেকটা উদাহরণের বিপরীতে এমন দশটা উদাহরণ দেখানো যাবে যেখানে মুক্তচিন্তার ধ্যানধারণাকে নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু সেই দশটা উদাহরণকে বাদ দিয়ে তারা ওই একটা উদাহরণকেই তুলে ধরবেন।

এটা যে সব সময় ইচ্ছাকৃতভাবে, কোনো নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে করা হয়, তা না। অনেক সময় হয়তো ওই আলিম বা বুদ্ধিজীবীর চোখে বিপরীত উদাহরণগুলো আসলেই ধরা পড়ে না। কারণ, তারা একটা নির্দিষ্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে পড়তে এবং ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এমন এক লেন্স চোখে দিয়ে তারা পড়ছেন যেটা ওইসব ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধেরই রঙে রাঙানো, যেগুলো তারা কুরআন-সুন্নাহতে খুঁজছেন। ফলে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হচ্ছে যেখান থেকে বের হয়ে আসা বেশ কঠিন। লেখা শেষ করার আগে শেষ একটা পয়েন্ট নিয়ে কিছু কথা বলি।

ওপরে আমি যা বলেছি তার বিপরীতে একটা কাউন্টার আরগুমেন্ট আসতে পারে।

> একই ধরনের সংশয়বাদী অবস্থান তো ইসলাম আর ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারেও নেয়া যেতে পারে। ইসলাম আর ইসলামী মূল্যবোধ যে সত্য, সঠিক, এগুলো যে বাস্তবতার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সেটা কেন আমরা ধরে নেব?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো—আমরা আপনা-আপনি এটা ধরে নেব না। আমরা অনুসন্ধান করব। বিশ্লেষণ করব। চিন্তা করব। তবে আমাদের চিন্তার ভিত্তি হবে বৈধ বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসগুলো। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আলিমদের অবস্থান। আমরা সতর্ক থাকব, যাতে ত্রুটিপূর্ণ কোনো ধ্যানধারণা বা বায়াস আমাদের চিন্তার জগতে ঢুকে না পড়ে। এটা হলো একদম প্রাথমিক ধাপ। এর সাথে অনুভব এবং অনুধাবন করারও প্রয়োজন আছে। এই অনুভূতি এবং অনুধাবন অর্জিত হয় ইবাদাত, যিকর, তিলাওয়াতের মতো ওই আমলগুলোর মাধ্যমে যেগুলো ইসলাম আমাদের পালন করতে বলে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যা যৌক্তিকভাবে, আত্মিকভাবে এবং প্রামাণিকভাবে সত্য। পাশাপাশি যা বাস্তবতাকে চেনার সুযোগ দেয়। কারণ, জ্ঞানের এই তিনটি উৎস পরস্পর-সংযুক্ত।

তবে এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আছে। আধুনিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করে তারাও নিজেদের ধ্যানধারণার সত্যতা অনুধাবন আর অনুভব করার দাবি করে। প্রগাঢ় আবেগ নিয়ে তারা তাদের মূল্যবোধগুলো প্রচার করে। যেহেতু তারাও সত্যের স্বাদ পাবার দাবি করছে, তাহলে তাদের দাবিকে আমরা কীভাবে নাকচ করব?

ব্যাপারটা আসলে খুব সহজ।

আমরা তাদের সযত্নে লালিত মূল্যবোধগুলোর ব্যবচ্ছেদ করব। এগুলোর অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, দ্বিমুখিতা তুলে ধরব। ধাপে ধাপে এগুলোর বাস্তবতা খুলে খুলে দেখাব, যাতে একসময় সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই ধ্যানধারণাগুলো আসলে অন্তঃসারশূন্য। এসব ধারণা এবং মূল্যবোধ কোনো ধরনের সম্মান এবং গ্রহণযোগ্যতা পাবার যোগ্য না। অবশ্য এ কাজটা করার ক্ষেত্রে সবার দক্ষতা একইরকম হবে না। এই পদ্ধতির অনুপম, অনুকরণীয় আদর্শ হলেন আমাদের প্রিয় ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

একবার যখন এ পদ্ধতিটা বুঝতে পারবেন তখন এর বিপরীত পথটাও চিনতে পারবেন। যেটা হলো অ্যাপোলোজেটিকস বা কৈফিয়তবাদী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মডার্নিস্ট ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধগুলোকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর কুরআন-সুন্নাহ আর আলিমদের রচনাবলি থেকে বেছে বেছে এমন কিছু অংশ নেয়া হয় যেগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে মডার্নিস্ট ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড় করানো যায়।

ইন শা আল্লাহ এই দুই পদ্ধতিকে পাশাপাশি রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন কৈফিয়তবাদী পদ্ধতি কতটা দুর্বল এবং অকার্যকর।

আল্লাহ আমাদের আন্তরিকভাবে সত্যসন্ধানী হবার তাউফিক দান করুন। আমীন।

মুসলিম সংশয়বাদী হবার অর্থ কী?

একজন পশ্চিমা সংশয়বাদী কী করে?

সে প্রশ্ন করে। যা কিছু তার নিজস্ব ধ্যানধারণার সাথে খাপ খায় না তার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। আপত্তি করে। সে বিশ্বাস করে তার মন, বিবেক আর বুদ্ধি সত্যমিথ্যা এবং ভালো-মন্দ বিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি।

বলাবাহুল্য, এ ধারণা ভুল।

একজন মুসলিম সংশয়বাদী কী করে?

সে প্রশ্ন করে। সে নিজেকে প্রশ্ন করে। নিজের কাজ, চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতির যা কিছু ইসলামের সাথে খাপ খায় না, সেটার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। আপত্তি করে। কারণ, সে জানে তার মন সীমিত। তার বুদ্ধিমত্তা সীমিত। তাই এগুলো কখনো সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না। সত্যের পরম, চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে কেবল ইসলামই।

মানুষ আজ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা আর মতবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। যত্ন করে লালন করে, সেগুলোর জন্য লড়াই করে। এগুলোই হলো সত্যিকারের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র–উইপেনস অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশান। এ ধরনের 'সত্য'-এ বিশ্বাসী হবার চেয়ে সংশয়বাদী হওয়া হাজার গুণে ভালো।

একজন মুসলিম সংশয়বাদীর জবানবন্দী

সেদিন এক মুসলিম কিশোর আমাকে প্রশ্ন করল–

সালাতের উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহর ওপর কেন বিশ্বাস করতে হবে?

ভালো ভালো মানুষের জীবনে কেন খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটে?

এ ধরনের প্রশ্ন অনেক মুসলিমের মধ্যে আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো তাদের মধ্যে বিশ্বাসের সংকট তৈরি করে। এ ধরনের প্রশ্নগুলোর কারণে অনেকে ইসলাম ত্যাগও করে। সমাজে ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা কমার কারণে এই প্রবণতা আরও গতিশীল হয়েছে।

প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর কোথায়?

এই প্রশ্নগুলোর মোকাবিলা কীভাবে করা উচিত? কীভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করব?

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা অ্যামেরিকায়। কিশোর বয়স কেটেছে নব্বইয়ের দশকের অ্যামেরিকাতে। টুকটাক কিছু প্রশ্ন আমার মাথাতেও যে তখন আসেনি তা না, কিন্তু আজকের মুসলিম তরুণদের যেসব প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার তুলনায় ওগুলোকে শিশুতোষ বলা যায়। সমকামী অধিকার, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, স্রষ্টার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, নারী অধিকার, শালীনতা ও যৌন সংযমের মূল্য, বিবর্তনবাদ, পরিবারের গুরুত্বসহ অনেক বিষয়ে আজকের মুসলিম তরুণদের সংশয়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কোনোকিছুই যেন প্রশ্ন, সন্দেহ আর শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যানের উর্ধ্বে না।

সারকথা হলো, আজ মানুষ মনে করে ধর্মের কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। সন্দেহগ্রস্ত জনসাধারণের মনে এই গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার উপায় হলো সরাসরি এ প্রশ্নগুলোর মোকাবিলা করা।

সংশয়বাদ

অ্যাকাডেমিক কিংবা পেশাদার জগতে জটিল এবং বিতর্কিত প্রশ্ন মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো প্রশ্নের পেছনে থাকা পূর্বধারণা এবং অনুমানগুলোকে চিহ্নিত করা। মানুষ কিছু পূর্বধারণা আর পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করে। সেই ধারণা এবং অনুমানগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। একবার তা করতে পারলে প্রশ্নের ভিত নাড়িয়ে দেয়া সহজ। প্রশ্ন তখন নিজেই সংকটে পড়ে যায়। আর তখন নিজের মতো করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়।

প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়া এবং সংকট তৈরির এ প্রবণতাকে সচরাচর যুক্ত করা হয় সংশয়বাদের সাথে। 'সংশয়বাদী' শব্দটা যে অর্থে আমি ব্যবহার করছি সেটা অনুযায়ী, কোনো চিন্তাব্যবস্থার ভালো-মন্দ যাচাইয়ের আগে সংশয়বাদী ব্যক্তির কাজ হলো সেটার ব্যবচ্ছেদ এবং ক্রিটিক করা[১০১]।

সাধারণত সংশয়বাদী প্রশ্নের নিশানা বানানো হয় ধর্মকে :

স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে এটা কেন বিশ্বাস করতে হবে?

কুরআন আল্লাহর কথা, এটা কেন মানতে হবে?

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস কেন করতে হবে?

মূলত এসব সংশয়বাদী প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধীদের মধ্যে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এ প্রশ্নগুলো আজ পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে গেছে। অনেক বিশ্বাসীও আজকাল এসব প্রশ্ন করে। যখন উত্তর খুঁজে পায় না, তখন ধর্ম ত্যাগ করে অথবা প্রশ্নগুলো উপেক্ষা করে যায়।

কিন্তু আমি মনে করি, আরেকটা পথ আছে।

লিবারেল-সেক্যুলার ডাবলস্ট্যান্ডার্ডের বিরুদ্ধে মুসলিম সংশয়বাদ

আমার অভিজ্ঞতা বলে, ধর্মের ব্যাপারে যারা সংশয়বাদী তাদের মধ্যে ডাবলস্ট্যান্ডার্ড আছে। সব ধরনের বিশ্বাসকে তারা একইভাবে আক্রমণ করে না। তাদের সবচেয়ে তীব্র সমালোচনাগুলো বরাদ্দ থাকে ধর্মের জন্য, বিশেষ করে ইসলামের জন্যে। কিন্তু ধর্মীয় না, এমন অনেক বিশ্বাসকে তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়।

---

[১০১] উল্লেখ্য, আমি এখানে ফিলোসফিকাল স্কেপটিকদের কথা বলছি না, যারা কোনো কিছু আসলে জানা সম্ভব কি না, সেটা নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

বিল মা'রের কথা ধরুন।[১০২] সে একজন স্ব-ঘোষিত লিবারেল। ইসলামের সমালোচনার সময় তার মধ্যে বিদ্বেষের কোনো কমতি দেখা যায় না। কিন্তু লিবারেলিসমের মূল্যায়ন করার সময় সে একই ধরনের ক্রিটিকাল, সংশয়বাদী মনোভাব গ্রহণ করে না। লিবারেল দর্শন নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে, সমালোচনা আছে। এগুলো নিয়ে সে কখনো আলোচনা করে না। আধুনিক লিবারেলিসম বিশ্বজুড়ে অবিশ্বাস্য মাত্রার সহিংসতা, ধ্বংস আর মৃত্যুর কারণ। এগুলোও তার আলোচনায় কখনো উঠে আসে না। মা'র নিজেকে উপস্থাপন করে একজন বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ বিশ্লেষক হিসেবে। যৌক্তিক চিন্তার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে সত্যকে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু আসলে সে একজন প্রোপাগ্যান্ডিস্ট। বাইবেল হাতে চিৎকার করা যেসব কট্টর খ্রিষ্টানের সমালোচনা মা'র করে, সে নিজেও তাদের মতোই বস্তুনিষ্ঠতা এবং যৌক্তিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। একমাত্র পার্থক্য হলো ক্রিশ্চিয়ানিটির বদলে মা'র লিবারেলিসমের দীক্ষা প্রচার করে।

একজন মুসলিম সংশয়বাদী এ ধরনের ভণ্ডদের অস্ত্র তাদের ওপরই ব্যবহার করে।

লিবারেলিসম, জাতি-রাষ্ট্রের প্যারাডাইম, বিজ্ঞানবাদ, মানবতাবাদ, প্রগতিবাদের মতো মডার্নিস্ট বিশ্বাস আর মতবাদগুলোকে আজ বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু একজন মুসলিম কি এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না? এগুলোর ব্যাপারে সংশয়বাদী হতে পারে না?

দান উল্টে দেয়া

ইসলামকে নিয়ে কিছু 'বিতর্কিত' এবং 'কঠিন' প্রশ্ন দেখা যাক–

- আল্লাহ, ফেরেশতা কিংবা আখিরাতের অস্তিত্বের কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে?
- ইসলামে নারীদের পর্দা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কিন্তু পুরুষদের জন্য করা হয়নি কেন?
- আল্লাহ যদি পরম করুণাময় হন তাহলে পৃথিবীতে কেন মন্দ জিনিস ঘটে?
- আমাদের কি নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে?
- ইসলামী আইনে সমকামিতা কেন অবৈধ?
- মানুষের আদি উৎসের ব্যাপারে বিবর্তনবাদকে কেন অনেক মুসলিম মেনে নেয় না?

---

[১০২] বিল মা'র (Bill Maher)–বিখ্যাত মার্কিন কমেডিয়ান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং টকশো উপস্থাপক।

এসব প্রশ্নের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেকেই বুঝি না। এই প্রশ্নগুলো শূন্য থেকে আসেনি। আজ থেকে ত্রিশ, পঞ্চাশ কিংবা পাঁচ শ বছর আগে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে মুসলিমরা সমস্যায় ভুগত না। তাদের মনে এসব প্রশ্নের উদয়ও হতো না। এ প্রশ্নগুলো পনেরো শ থেকে একবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অংশ। এগুলোর পেছনে আছে গভীরে প্রোথিত পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন ধ্যানধারণা। আমাদের কাছে এসব প্রশ্ন 'কঠিন' মনে হয় কারণ প্রশ্নের পেছনের ধারণাগুলোকে আমরা দেখি না। এ ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রমাণিত সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছি।

মুসলিম সংশয়বাদীর কাজ হলো মাটি খুঁড়ে এই পূর্বধারণাগুলোকে বের করে আনা। সেগুলোকে প্রশ্ন করা, ব্যবচ্ছেদ করা। এসব প্রশ্নের হিসেব মেলানোর বদলে মুসলিম সংশয়বাদী চায় ভেঙে টুকরো টুকরো করে এগুলোকে অর্থহীন করে দিতে। এসব প্রশ্ন যেহেতু অনেক মুসলিমের ঈমানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এ ধরনের সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

প্রয়োগ

একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেখা যাক।

আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের কথাই ধরুন। এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আধুনিক সময়ের কিছু মুসলিম বক্তা বলবে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে কোনো অবজেক্টিভ প্রমাণ নেই।[১০০] দিনশেষে ব্যাপারটা বিশ্বাসের। এখানে লিপ অফ ফেইথ আছে। বিশ্বাসের একটা ব্যাপার আছে।

কিন্তু মুসলিম সংশয়বাদীর এ প্রশ্নের মোকাবিলা করার ধরনটা আলাদা। প্রথম কাজ হবে 'অবজেক্টিভ' শব্দটাকে খুঁটিয়ে দেখা। অবজেক্টিভ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? অবজেক্টিভিটির যে ধারণা আজ গ্রহণ করা হয় সেটার পেছনে বেশ জটিল এবং ইন্টেরেস্টিং ইতিহাস আছে। কাজেই অবজেক্টিভিটির প্রচলিত সংজ্ঞাকে বিনা প্রশ্নে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রমাণিত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

মুসলিম সংশয়বাদী তারপর প্রমাণের ওই মাপকাঠিগুলো নিয়ে চিন্তা করবে স্রষ্টায়

---

[১০০] অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হলো–আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা থেকে মুক্ত। যা সর্বজনীন ও স্বতন্ত্রভাবে সত্য। যেমন, অনেকে বলতে পারে, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এটা স্বতন্ত্রভাবে সত্য। এটা প্রমাণ করে দেখানো সম্ভব। এখানে ব্যক্তিগত মতামত জানার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বের এমন কোনো স্বতন্ত্র, স্বাধীন প্রমাণ নেই। –অনুবাদক

বিশ্বাস নাকচ করার জন্য যেগুলো আজ ব্যাপকভাবে গৃহীত—যেমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। এই মাপকাঠিগুলোর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় কি না, সেটা সে পর্যালোচনা করবে। যেমন– বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকার কারণে আমরা যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করি, তাহলে আমরা কি সময়ের ধারা (passage of time), মানবীয় চেতনা (human consciousness), আর বিমূর্ত বিভিন্ন গাণিতিক বস্তুকে (abstract mathematical entities) অস্বীকার করব? যেহেতু এগুলোরও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই? কিংবা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার বাস্তবতা নেই?

কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকার কারণে এসব জিনিসকে অস্বীকার করার মতো চরম অবস্থান অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করবে না। তার মানে হলো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাপকাঠি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য না, এটাকে আসলে খুব সীমিত পরিসরে কাজে লাগানো যায়। অতএব, এ ধরনের মাপকাঠির ভিত্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে টানা উপসংহার গ্রহণযোগ্য না।

বিজ্ঞানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের মতো ব্যাপকভাবে গৃহীত এবং সযত্নে লালিত বিশ্বাসগুলোর ব্যবচ্ছেদ করতে একজন মুসলিম সংশয়বাদী দ্বিধাবোধ করে না। আর এভাবে প্রশ্নের পেছনে থাকা পূর্বধারণা আর পূর্বানুমানগুলোকে সে সামনে নিয়ে আসে।

উপসংহার

নিঃসন্দেহে সংশয়বাদ একটা নেতিবাচক এবং ব্যবচ্ছেদমূলক প্রক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য যুক্তির আঘাতে আধুনিক যুগের মূর্তিগুলো ভাঙা। যাতে মানুষ সত্যের আলো দেখতে পায়। এই অর্থে সবচেয়ে বড় মুসলিম 'সংশয়বাদীদের' একজন ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে মুশরিকদের বিশ্বাসের অসাড়তা তুলে ধরেছিলেন। নক্ষত্রপূজারি মুশরিকের বিশ্বাসের অসামঞ্জস্যতা এবং অর্থহীনতা তুলে ধরার জন্য তিনি তাদের কথোপকথনের ধাঁচ কিছুটা অনুকরণ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন–

> *আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাতের আঁধার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখতে পেল, (তখন) বলল, এটাই হচ্ছে আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো, সে বলল, যা অস্তমিত হয়ে যায় তার প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই। অতঃপর সে যখন চন্দ্রকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল তখন বলল, এটা হচ্ছে আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বলল, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সঠিক পথের দিশা না দেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে অতি উজ্জ্বল হয়ে*

উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটাই হচ্ছে আমার প্রতিপালক, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড়। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বলল, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা যেগুলোকে (আল্লাহর) অংশীদার স্থির করো সেগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আর তার কওম তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা কি বাদানুবাদ করছ আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক করো, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?' তোমরা যা শরীক করেছ কীভাবে আমি তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা শরীক করেছ আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের ওপর কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব কোন দল নিরাপত্তার বেশি হকদার, যদি তোমরা জানো?' যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর এ হচ্ছে আমার দলীল, আমি তা ইবরাহীমকে তার কওমের ওপর দান করেছি। আমি যাকে চাই, তাকে মর্যাদায় উঁচু করি। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। [তরজমা, সূরা আল-আন'আম, ৭৫-৮৩]

মুশরিকদের বিশ্বাসের অসংলগ্নতা প্রমাণের জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নক্ষত্র, চাঁদ এবং সূর্যের ব্যাপারে তাদের কথার বলার ধাঁচ অনুকরণ করেছিলেন। মুসলিম ইতিহাসে এমন অনেক মুসলিম সংশয়বাদী ছিলেন, যারা বিপজ্জনক নানা দর্শনের পর্যালোচনা, সমালোচনা, ব্যবচ্ছেদ এবং ভিত ধ্বংস করার জন্য নানান যৌক্তিক কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। হারিয়ে যাওয়া এই শিল্পকে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বিশেষ করে আমরা যখন এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে আছি, যা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রেটোরিকালি প্রশ্ন করেছিলেন—

আমরা কি হকের ওপর নই?

নিঃসন্দেহে আমরাই হকের ওপর আছি। সময় এসেছে সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করার।

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর জন্ম হিউস্টন, টেক্সাসে। পড়াশুনা করেছেন হার্ভার্ডে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ফিযিক্স আর গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে পড়েছেন দর্শন নিয়ে। এছাড়া টাফটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন দর্শনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় নোবেল বিজয়ী বিভিন্ন পদার্থবিদ ও দার্শনিকদের অধীনে পড়ার সুযোগ হয়েছে তার। এছাড়া আলিমগণের তত্ত্বাবধানে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে শিখছেন।

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু আলাসনা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। এ ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ইসলাম নিয়ে আধুনিক সময়ের বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের মোকাবেলা করতে মুসলিমদের শেখানো।

পশ্চিমা দার্শনিক চিন্তা, ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য এবং মুসলিম ও মডার্নিটির সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লেখালেখি ও আলোচনা করে থাকেন। ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাসজিদ এবং মাদ্রাসায় বক্তব্য রেখেছেন।

একজন পশ্চিমা সংশয়বাদী কী করে?

সে প্রশ্ন করে। যা কিছু নিজস্ব ধ্যানধারণার সাথে খাপ খায় না তার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। আপত্তি করে। সে বিশ্বাস করে তার মন, বিবেক আর বুদ্ধিই হলো সত্যমিথ্যা এবং ভালোমন্দ বিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি। বলাবাহুল্য, এ ধারণা ভুল। একজন মুসলিম সংশয়বাদী কী করে?

সে প্রশ্ন করে। সে নিজেকে প্রশ্ন করে। নিজের কাজ, অনুভূতি এবং চিন্তার যা কিছু ইসলামের সাথে খাপ খায় না, সেটার বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। আপত্তি করে। কারণ সে জানে তার মন সীমিত। তার বুদ্ধিমত্তা সীমিত। এগুলো কখনো সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না। সত্যের পরম, চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে কেবল ইসলামই।

মানুষ আজ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা আর মতবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। যত্ন করে লালন করে, সেগুলোর জন্য লড়াই করে। এগুলোই হলো সত্যিকারের উইপেনস অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশান। এ ধরণের 'সত্য'-এ বিশ্বাসী হবার চেয়ে সংশয়বাদী হওয়া হাজার গুণে ভালো।